ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ

আলোচিত ও অনালোচিত কারণসমূহ

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর
পি-এইচ. ডি. (রিয়াদ), এম. এ. (রিয়াদ), এম.এম. (ঢাকা)
সহযোগী অধ্যাপক, আল-হাদীস বিভাগ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ

الإرهاب باسم الإسلام

تأليف د. خوندكار أبو نصر محمد عبد الله جهانغير

ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ

আলোচিত ও অনালোচিত কারণসমূহ

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

প্রকাশক
উসামা খোন্দকার
আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
জামান সুপার মার্কেট (৩য় তলা)
বি. বি. রোড. ঝিনাইদহ-৭৩০০
ফোন ও ফ্যাক্স: ০৪৫১-৬৩৫৭৮; মোবাইল: ০১৭১১১৫২৯৫৪

প্রপ্তিস্থান:
১. দারুশ শরীয়াহ খানকায়ে ফুরফুরা, পাকশী, ইশ্বরদী, পাবনা
২. ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা, ২/২ দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
৩. আল-ফারুক একাডেমী, ধোপাঘাটা-গোবিন্দপুর, ঝিনাইদহ-৭৩০০

প্রথম মুদ্রণ: আগস্ট ২০০৬ ঈসায়ী

পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ: ফেব্রুয়ারী ২০০৯ ঈসায়ী

হাদিয়া
২১০ টাকা মাত্র।

Islamer Name Jongibad (Miltancy in the name of Islam) by Dr. Khandaker Abdullah Jahangir. Published by As-Sunnah Pablications, Jaman Supur Market, B. B. Road, Jhenidah-7300. 1st print: August 2006. 2nd edition: February 2009. Price TK 210.00 only.

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফুরফুরার পীর আমীরুল ইত্তিহাদ
মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মাদ আব্দুল কাহ্হার
সিদ্দীকী আল-কুরাইশী সাহেবের

বাণী

নাহ্মাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম, আম্মাবা'দ,

শান্তির ধর্ম ইসলাম। ইসলামের শান্তি শুধু মুসলমানদের জন্যই নয়। বরং জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য এবং সকল সৃষ্টির জন্য। একটি বিড়ালকে অভুক্ত বেঁধে রাখার জন্য কঠিনতম নিন্দা জানিয়েছেন যে মহানবী ﷺ, তাঁর উম্মতের মধ্যে কেউ ইসলামের নামে মানুষ খুন করতে পারে একথা কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু তারপরও অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে শুনি, কিছু মানুষ নাকি এমন করছে। এরপর হৃদয়ের সেই বেদনা আরো বৃদ্ধি পায়, যখন দেখি গুটি কয়েক বিভ্রান্ত বিপথগামী মানুষের কারণে ঢালাওভাবে ধার্মিক ও আলিম সমাজকে দায়ী করা হচ্ছে। স্কুল-কলেজের অগণিত ছাত্রের চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের লিপ্ত হওয়ার কারণে কেউ ঢালাওভাবে স্কুল-কলেজ বা শিক্ষাব্যবস্থাকে দায়ী করেন না। সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ইত্যাদির নামে খুন-খারাবি ও সন্ত্রাসী করলে কেউ সকল সমাজতন্ত্রী, গণতন্ত্রী বা মানবাধিকারবাদীকে দায়ী করেন না। অথচ দুচার জন বিপথগামী টুপি মাথায় দিয়ে সন্ত্রাস করলে সকল টুপিওয়ালাকে দায়ী করা হয়।

ইসলাম সম্পর্কে এ দ্বিমুখি বিভ্রান্তির বিষয়ে একটি সময়োপযোগী পুস্তিকা রচনা করেছে আমার স্নেহাস্পদ জামাতা খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর। এতে একদিকে যেমন ইসলামের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মূল কারণগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে, তেমনি এ বিষয়ক বিভ্রান্তি অপনোদনের চেষ্টা করা হয়েছে। বইটির বহুল প্রচার ও প্রসারের জন্য দোয়া করছি। দোয়া করি আল্লাহ লেখকের এ প্রচেষ্টা কবুল করে নিন এবং এ বইকে তাঁর ও আমাদের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিন।

আহ্কারুল এবাদ,

আবুল আনসার সিদ্দীকী
(পীর সাহেব, ফুরফুরা)

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল-হামদু লিল্লাহ। ওয়া সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ। ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন।

আমাদের সমাজের সকল মানুষ এবং ইসলাম সম্পর্কে যাদের সামান্য জ্ঞানও আছে তারা সকলেই জানেন যে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ গোত্র নির্বিশেষ সমাজের সকল মানুষের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠা ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের অন্যতম প্রেরণা। তাত্ত্বিক, প্রায়োগিক ও ঐতিহাসিকভাবে তা সর্বজনবিদিত। বাংলাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর সকল মানুষই ধর্মীয়ভাবে শান্তিপ্রিয়। সবাই আমরা শান্তি চাই। এখন সমস্যা হলো, তাহলে ইসলামের নামে বোমাবাজি, অশান্তি, নিরিহ নিরপরাধ মানুষ হত্যা, আত্মহত্যা ইত্যাদি কেন ঘটছে? এ সকল ঘটনার কারণ জানা শুধু কৌতুহল নিবারণের বিষয় নয়, বরং সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায়। সন্ত্রাস একটি ভয়ঙ্কর সামাজিক ব্যাধি। এর নিরাময়ের জন্য এর সঠিক কারণ নির্ণয় করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক কারণ নির্ণয় এই ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ ও নিরাময়ের পথ সুগম করবে। পক্ষান্তরে এর কারণ নির্ণয়ে বিভ্রান্তি সমস্যাকে আরো ভয়ঙ্কর করে তুলতে পারে।

যে কোনো বৃহৎ সমাজে দু-চারটি বিভ্রান্ত বা বিপথগামী দল বা ব্যক্তি থাকতে পারে। কোনো রাষ্ট্র বা সমাজ থেকেই এদেরকে একেবারে নির্মূল করা যায় না। তবে এইরূপ বিপথগামীরা যেন কোনোভাবেই সমাজের মধ্যে তাদের বিভ্রান্তি ছড়াতে না পারে এবং সমাজের জন্য দুষ্টক্ষতে পরিণত না হয় সে জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। বাংলাদেশের মত সুশৃঙ্খল সমাজে জঙ্গিবাদের উত্থান অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বিষয়। পাকিস্তান বা অন্য অনেক দেশে শিয়া-সুন্নি, ওহাবী-রেজবী ইত্যাদি ধর্মীয় দল-উপদলের মধ্যে সহিংসতা অনেক আগে থেকেই বিদ্যমান। পক্ষান্তরে বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক 'ভায়োলেন্স' বা সহিংসতা কখনোই ছিল না। আমাদের দেশে এরূপ সহিংসতার মধ্যে হাজার হাজার মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারা কোনো ক্রমেই ছোট করে দেখার মত বিষয় নয়। এর সঠিক কারণ নির্ণয় ও প্রতিকারে সচেষ্ট হওয়া অত্যন্ত জরুরী।

এ বিষয়ে আমার লেখা একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল 'ইসলামী আইন ও বিচার' পত্রিকায়। বেশ কয়েকজন প্রাজ্ঞ আলিম ও ইসলামী চিন্তাবিদ প্রবন্ধটি পুস্তক আকারে প্রকাশ করতে উৎসাহ দেন। তাঁদের প্রস্তাবের ভিত্তিতেই প্রবন্ধটির সাথে কিছু সংযোজন বিয়োজন করে তা পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করলাম।

মহান আল্লাহর দরবারে সকাতরে প্রার্থনা করি, তিনি দয়া করে এই নগন্য কর্মটুকু কবুল করে নিন এবং একে আমার, আমার পিতামাতা, স্ত্রী- সন্তান, আত্মীয়স্বজন ও পাঠকদের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিন। আমীন!

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

২য় সংস্করণের ভূমিকা

প্রশংসা মহান আল্লাহর নিমিত্ত। সালাত ও সালাম তাঁর মহান রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর এবং তাঁর পরিজন, সহচর ও অনুসারীদের উপর।

২০০৬ সালে "ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ" পুস্তিকাটি ছাপার পর এ বিষয়ে আরো কয়েকটি প্রবন্ধ আমি লিখেছিলাম এবং এগুলির বিষয়বস্তু একত্রিত করে একটি পুস্তক রচনার জন্য কেউ কেউ অনুরোধ করেছিলেন।

গত নভেম্বর-ডিসেম্বরে হজ্জ উপলক্ষ্যে হারামাইন শরীফাইনে গমনের তাওফীক হয়েছিল। ইসলামী জাগরণের মধ্যে উগ্রতা ও বিচ্ছিন্নতার যে অশুভ ছায়া সে বিষয়ে কিছু লিখার বিষয়ে বারংবার মনে আবেগ তৈরি হয়। বারংবার আল্লাহর দরবারে আবেদন করেছিলাম, এ বিষয়ে তাঁর পছন্দনীয় কিছু কথা লিখার তাওফীক চেয়ে। দেশে ফিরে দেখলাম "ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ" পুস্তি কাটির কপিগুলি শেষ হয়ে গিয়েছে। প্রথমে ভেবেছিলাম পুস্তিকাটি পুনর্মূদ্রণ করব। পরে সিদ্ধান্ত নিলাম পুনর্লিখনের। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধের তথ্য সংযোজন করে এবং হারামাইন শরীফাইনে যে বিষয়গুলি লেখার আবেগ অনুভব করেছিলাম সেগুলির মধ্য থেকে বিষয়সংশ্লিষ্ট কিছু কথা সংযোজন করে বইটি নতুনভাবে সাজিয়েছি।

বইটি পুনর্লিখন বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছেন ফুরফুরার পীর আলহাজ্জ মাওলানা আবূ বকর আব্দুল হাই মিশকাত সিদ্দীকী আল-কুরাইশী, হাফিযাহুল্লাহ। বিশেষত, দীন প্রতিষ্ঠা ও দীনী দাওয়াতের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সুন্নাত বিরোধী চিন্তা ও কর্ম বিভিন্নভাবে বিশ্বাস ও কর্মের বিদ'আত সৃষ্টি করছে সেগুলি সম্পর্কে সুন্নাতভিত্তিক পর্যালোচনা করতে তিনি বারংবার আমাকে অনুরোধ করেছেন। মুহতারাম মুফতী সাঈদ আহমদ মুজাদ্দিদী, মুহতারাম মুহাদ্দিস কাজী ইবরাহীম, বন্ধুবর প্রফেসর ড. আবু সিনা, ড. মু. অলী উল্যাহ, আ. স. ম. শুআইব আহমদ, মো. নাজিমুদ্দিন, মুহা. আবেদ বিন আজিজ ও অন্যান্য অনেকেই মূল্যবান তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ সকলকেই সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করুন।

বইটির বিষয়বস্তু খুবই সংবেদনশীল। আমার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, বুঝের ভুল, ভাষা ব্যবহারের অযোগ্যতা ইত্যাদি কারণে অনেক ভুলভ্রান্তি রয়ে গেল। কোনো সহৃদয় পাঠক যদি আমার ভুল ও বিচ্যুতি ধরে দেন তবে তা হবে আমার এবং পাঠকদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।

আল্লাহ দয়া করে এ নগন্য প্রচেষ্টা কবুল করে নিন। আমীন!

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

গ্রন্থকার রচিত কয়েকটি বই

১. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা
২. এহইয়াউস সুনান: সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন
৩. হাদীসের নামে জালিয়াতি: প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা
৪. রাহে বেলায়াত: রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যিক্‌র-ওযীফা
৫. মুসলমানী নেসাব: আরকানে ইসলাম ও ওযীফায়ে রাসূল (ﷺ)
৬. বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত: গুরুত্ব ও প্রয়োগ
৭. সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর
৮. মুনাজাত ও নামায
৯. সহীহ মাসনূন ওযীফা
১০. আল্লাহর পথে দাওয়াত
১১. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহ-সজ্জা
১২. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শবে বরাত: ফযীলত ও আমল
১৩. بُحُوثٌ فِي عُلُومِ الْحَدِيْث (বুহূসুন ফী উলুমিল হাদীস)
14. A Woman From Desert
১৫. খুতবাতুল ইসলাম: জুমুআর খুতবা ও সমকালীন প্রসঙ্গ
১৬. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পোশাক
১৭. মুসনাদ আহমদ (ইমাম আহমদ রচিত): বঙ্গানুবাদ (আংশিক)
১৮. ইযহারুল হক্ক (আল্লামা শাইখ রাহমাতুল্লাহ কিরানবী রচিত): বঙ্গানুবাদ
১৯. ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার (মুফতী আমীমুল ইহসান রচিত): বঙ্গানুবাদ
২০. ইমাম আবূ হানীফা (রাহ)-এর আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা
২১. Jihad of the Holy Bible and Jihad of Muhammad ﷺ
২২. বাইবেল থেকে কুরআন
২৩. কী নতুন নিয়ে এলেন মুহাম্মাদ (ﷺ)
২৪. ফুরফুরার পীর আবূ জাফর সিদ্দিকী রচিত জাল হাদীস সংকলন: আল-মাউযূআত
২৫. বাংলাদেশে ইসলামী জাগরণ: পীর-মাশাইখ, শিক্ষা-বিস্তার, দাওয়াত ও রাজনীতি

সংগ্রহ বা পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন:

মো. বাহাউদ্দীন, ম্যানেজার, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, জামান সুপার মার্কেট (৩য় তলা), বি. বি. রোড (পোস্ট অফিসের মোড়). ঝিনাইদহ-৭৩০০। মোবাইল নং ০১৭১১-১৫২৯৫৪, ০১৯২২-১৩৭৯২১।

সূচীপত্র

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

প্রথম পরিচ্ছেদ
পরিচিতি ও আলোচিত কারণসমূহ

১. ১. পরিচিতি ও প্রকরণ

১. ১. ১. জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস

জঙ্গি ও জঙ্গিবাদ শব্দদ্বয় ইংরেজি (militant, militancy) শব্দদ্বয়ের অনুবাদ। ইদানিং এগুলি আমাদের মধ্যে অতি পরিচিত ও অতিব্যবহৃত। শব্দগুলি কিছু দিন আগেও এত প্রচলিত ছিল না। আর আভিধানিক বা ব্যবহারিকভাবে এগুলি নিন্দনীয় বা খারাপ অর্থেও ব্যবহৃত হতো না। শাব্দিক বা রূপক ভাবে যোদ্ধা, সৈনিক বা যুদ্ধে ব্যবহৃত বস্তু বুঝাতে এ শব্দগুলি ব্যবহৃত হতো। বৃটিশ ইন্ডিয়ার কমান্ডার ইন চিফকে 'জঙ্গিলাট' বলা হতো।[১]

শক্তিমত্ত বা উগ্র বুঝাতেও এ শব্দ ব্যবহার করা হয়। (Oxford Advanced Learner's Dictionary)-তে বলা হয়েছে: militant. adj. favouring the use of force or strong pressure to achieve one's aim. ...militant: n. militant person, esp. in politics. "মিলিট্যান্ট (জঙ্গি): যে ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শক্তি বা জোরালো প্রভাব ব্যবহার করা সমর্থন করে।...."[২]

Merriam-Wepster's Collegiate Dictionary--তে বলা হয়েছে: militant 1: engaged in warfare or combat : fighting. 2: aggressively active (as in a cause). অর্থাৎ: মিলিট্যান্ট (জঙ্গি): যুদ্ধ বা সম্মুখসমরে লিপ্ত ব্যক্তি, যুদ্ধরত। উগ্রভাবে সক্রিয়।"

দ্বিতীয় অর্থটিকে আরো একটু ব্যাখ্যা করে মাইক্রোসফট এনকার্টা অভিধানে মিলিট্যান্ট বা জঙ্গি শব্দের অর্থে বলা হয়েছে: (aggressive: extremely active in the defense or support of a cause, often to the point of extremism): "আগ্রাসী, কোনো বিষয়ের পক্ষে বা সমর্থনে চরমভাবে সক্রিয়, যা প্রায়শ চরমপন্থা পর্যন্ত পৌঁছায়।"

এ সকল অর্থ কোনোটিই সরাসরি বে-আইনী অপরাধ বুঝায় না। এ সকল অর্থে আমাদের দেশের সকল রাজনৈতিক, আদর্শিক, পেশাজীবি ও সামাজিক দলই "মিলিট্যান্ট" বা "জঙ্গি"। কারণ সকলেই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শক্তি বা 'প্রেসার' প্রয়োগ পছন্দ করেন এবং সকলেই তাদের নিজেদের আদর্শ ও স্বার্থ রক্ষায় বা প্রতিষ্ঠায় "উগ্রভাবে সক্রিয়"।

কিন্তু আমরা বর্তমানে 'জঙ্গি' বলতে বুঝি বে-আইনী সহিংসতা ও খুনখারাপি। এ অর্থে প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত পরিভাষা সন্ত্রাস (terrorism)। কিন্তু আমরা বাংলায় পত্র-পত্রিকা, বক্তৃতা-বিবৃতি ও লেখালেখি থেকে বুঝি যে, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যারা সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র বা সর্বহারার রাজত্ব প্রতিষ্ঠার নামে উগ্রতা, অস্ত্রধারণ, সহিংসতা বা খুনখারাপিতে লিপ্ত হন তাদেরকে আমরা "চরমপন্থী" (extremist) বলি। আর যারা ইসলামের নামে বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে উগ্রতা, অস্ত্রধারণ, সহিংসতা বা খুনখারাপিতে লিপ্ত তাদেরকে বলি "জঙ্গি"। আর যারা প্রচলিত সাধারণ রাজনৈতিক দলের নামে বা কোনো দল, মতবাদ বা আদর্শের নাম না নিয়ে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য উগ্রতা, অস্ত্রধারণ, সহিংসতা বা খুনখারাপিতে লিপ্ত হয় তাদেরকে সন্ত্রাসী বলি।

এরূপ বিভাজন বা পার্থক্যের কোনো ভাষাগত বা তথ্যগত ভিত্তি আছে বলে জানা যায় না। বরং ইংরেজি ব্যবহার থেকে বুঝা যায় যে, militant/ militancy জঙ্গি বা জঙ্গিবাদ শব্দ সরাসরি 'বে-আইনী কর্ম' বা অপরাধ বুঝায় না। বরং বেআইনী বা আইন-সম্মত যে কোনো প্রকারের উগ্রতা বুঝাতে (militant, militancy): জঙ্গি ও জঙ্গিবাদ শব্দদ্বয় ব্যবহার করা হয়। চরমপন্থা ও চরমপন্থী (extremism/extremist) শব্দদ্বয়ও সরাসরি অপরাধ বা বে আইনী কর্মকাণ্ড বুঝায় না। পক্ষান্তরে সন্ত্রাস (terrorism) শব্দটিই সরাসরি অপরাধ ও বে-আইনী কর্মকাণ্ড বুঝায়।

এভাবে আমরা দেখছি যে, "জঙ্গিবাদ" শব্দটি কোনোরূপ ভাষাগত ভিত্তি ছাড়াই 'ইসলামের নামে সহিংসতা' অর্থে ব্যবহার হচ্ছে। অথচ মূল ভাষাগত অর্থে ইসলামের নামে, অন্য কোনো ধর্মের নামে, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে, গণতন্ত্রের নামে, সমাজতন্ত্রের নামে, অন্য যে কোনো মতবাদ, আদর্শ বা অধিকারের নামে উগ্রতার আশ্রয় গ্রহণকারী মানুষকে জঙ্গি বলা চলে এবং তার মতামতকে জঙ্গিবাদ বলা চলে। ইংরেজি ব্যবহার এটিই প্রমাণ করে।

বস্তুত জঙ্গিবাদ বলতে আমরা যা বুঝাচ্ছি ও বুঝছি সে অর্থটি প্রকাশের জন্য সঠিক শব্দ হলো সন্ত্রাস। সন্ত্রাস-এর সাধারণ পরিচয় দিয়ে সন্ত্রাস বিষয়ক আলোচনার শুরুতে এনসাইক্লোপিডীয়া ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে: terrorism: the systematic use of violence to create a general climate of fear in a population and thereby to bring about a particular political objective: "সন্ত্রাস: নির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমন্বিতভাবে সহিংসতার ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা।"

মার্কিন সরকারের ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফ. বি. আই) terrorism বা সন্ত্রাসের সংজ্ঞায় বলেছে: "the unlawful use of force and violence against persons or property to intimidate or coerce a government, the civilian population, or any segment thereof, in furtherance of political or social objectives: কোনো সরকার বা সাধারণ নাগরিকদেরকে ভয় দেখিয়ে রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ব্যক্তি বা সম্পদের বিরুদ্ধে ক্ষমতা বা সহিংসতার বেআইনি ব্যবহার করা ।"

এ সংজ্ঞায় কর্মের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। শক্তি, ক্ষমতা বা সহিংসতার ব্যবহার যদি বে-আইনী হয় তবে তা 'সন্ত্রাস' বলে গণ্য হবে। আর যদি তা 'আইন-সম্মত' হয় তবে তা 'সন্ত্রাস' বলে গণ্য হবে না। এখানে সমস্যা আইন ও বে-আইন নির্ণয় নিয়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশ ইরাকে 'রাজনৈতিক পরিবর্তন', 'স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি আনয়ন', 'মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা' ইত্যাদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সরকার ও জনগণের বিরুদ্ধে 'শক্তি ও সহিংসতা' ব্যবহার করেছে এবং করছে। এ ব্যবহারকে তারা 'আইনসম্মত' ও তাদের মৌলিক অধিকার ও দায়িত্ব বলে মনে করছেন। কাজেই তারা একে সন্ত্রাস বলে মানতে রাজি নন, যদিও বিশ্বের অনেক মানুষই একে সন্ত্রাস বলেই মনে করছেন।

পক্ষান্তরে ইরাকের প্রতিরোধ যোদ্ধাগণ "বিদেশী দখলদাত্বি" মুক্ত হতে মার্কিন সেনাবাহিনী ও তাদের স্থানীয় সহযোগীদের বিরুদ্ধে "শক্তি ও সহিংসতা" ব্যবহার করছেন এবং আফগানস্থানে তালিবানগণ রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে আফগান সরকারের সেনাবাহিনী, কর্মকর্তা ও বিদেশী সৈন্যদের বিরুদ্ধে 'শক্তি ও সহিংসতা' ব্যবহার করছেন। তারা তাদের এ কর্মকে আইনসঙ্গত দায়িত্ব বলে মনে করেন, পক্ষান্তরে অন্যরা একে 'সন্ত্রাস' বলে গণ্য করছেন।

এভাবে আমরা দেখছি যে, সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীকে চিহ্নিত করা কঠিন এবং এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ প্রায় অসম্ভব। এজন্য অন্য অনেক সমাজবিজ্ঞানী কর্মের উপর নির্ভর না করে আক্রান্তের উপর নির্ভর করে সন্ত্রাসকে সংজ্ঞায়িত করতে চেষ্টা করেছেন। তাদের ভাষায়: "terrorism is premeditated, politically motivated violence perpetrated against noncombatant targets: রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে পূর্বপরিকল্পিতভাবে অযোদ্ধা লক্ষ্যের বিরুদ্ধে সহিংসতা সন্ত্রাস।"

মার্কিন সরকার এ সংজ্ঞা গ্রহণ করেছেন বলে এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ সংজ্ঞার দ্বারা সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসী চিহ্নিত করাও বিতর্কিত হতে বাধ্য। নিরস্ত্র ফিলিস্তিনী যুবকগণ যখন সশস্ত্র ইসরায়েলী সৈন্যদের প্রতি ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করেন অথবা ফিলিস্তিনী মুক্তিযোদ্ধাগণ যখন সশস্ত্র ইসরায়েলীয় সৈন্যদেরকে আক্রমন করেন, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাশ্চাত্য বিশ্ব তাকে সন্ত্রাস বলে আখ্যায়িত করে। অথচ 'অযোদ্ধা' নিরস্ত্র ফিলিস্তিনী শিশু ও নারীপুরুষদের প্রতি ইসরায়েলী সৈন্যদের গুলি ছোড়া, বোমা নিক্ষেপ ইত্যাদি কর্মকে তারা সন্ত্রাস বলে গণ্য করেন না। বরং আত্মরক্ষার স্বাভাবিক অধিকার বলে দাবি করেন।

ইরাকে প্রতিরোধ যোদ্ধা বা শিয়া-সুন্নি সংঘাতে লিপ্ত বিভিন্ন দল নিরস্ত্র অযোদ্ধা মানুষদের হত্যা করলে তাকে সকলেই সন্ত্রাস বলে গণ্য করেন। কিন্তু মার্কিন বাহিনী ফালুজা এবং অন্যান্য স্থানে অযোদ্ধা নিরস্ত্র মানুষদেরকে হত্যা করলে তাকে সন্ত্রাস বলে কখনোই স্বীকার করা হয় না।

এভাবে আমরা দেখছি যে, যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হোক না কেন, কোনো মানুষ বা মানবগোষ্ঠীকে 'সন্ত্রাসী' বলে চিহ্নিত করা খুবই কঠিন।

সর্বোপরি, যুগে যুগে সকল স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তি ও স্বাধীনতা আন্দোলনসহ বিভিন্ন জাতি, দল বা রাষ্ট্র এরূপ সহিংসতার ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের স্বাধীনতা, মুক্তি ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় করেছেন। আধুনিক ইতিহাসে আইরিশ রিপাবলিকান আর্মী, আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস, তামিল টাইগার, পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতাকামী দলসমূহ ও অন্যান্য অনেক দল ও সংগঠন তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সন্ত্রাসী কর্মাণ্ডের আশ্রয় নিয়েছে ও নিচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে সকল রাষ্ট্র, এমনকি জাতিসংঘও এরূপ অনেক 'সন্ত্রাসী' কর্মকাণ্ড সমর্থন করেছে এবং সন্ত্রাসী সংগঠনগুলিকে সাহায্য করেছে। যেমন হিটলালের দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ফরাসীদের 'সন্ত্রাসী' ও 'সহিংস' প্রতিরোধ আন্দোলন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকারের বিরুদ্ধে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের 'সহিংস' ও 'সন্ত্রাসী' প্রতিরোধ আন্দোলন।

আরো লক্ষণীয় যে, স্বাধীনতা আন্দোলন ও প্রতিরোধ যুদ্ধকে "সন্ত্রাস" বলে আখ্যায়িত করা স্বৈরাচার, দখলদার বা সাম্রাজ্যবাদীদের চিরচারিত নিয়ম। নেপালের মাওবাদীদেরকে সন্ত্রাসী তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। কিন্তু জনগণ তাদেরকেই পছন্দ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সর্বদা "সন্ত্রাসী" বলে আখ্যায়িত করেছে পাকিস্তান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। এ জন্য বলা হয়: "One man's terrorist is another man's freedom fighter".

যুদ্ধের ক্ষেত্রেও উভয় পক্ষ প্রতিপক্ষের সৈন্য ও নাগরিকদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারে সচেষ্ট থাকে। তবে সন্ত্রাসের সাথে যুদ্ধের মৌলিক পার্থক্য হলো, সাধারণ যুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধ উভয় ক্ষেত্রেই যোদ্ধারা মুলত যোদ্ধা বা যুদ্ধ বিষয়ক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে সচেষ্ট থাকে এবং সামরিক বিজয়ই লক্ষ্য থাকে। পক্ষান্তরে সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে সামরিক বিজয় উদ্দেশ্য থাকে না। এক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্যই হলো সামরিক অসামরিক নির্বিচারে সকল লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করে ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করা।

"Terrorism proper is thus the systematic use of violence to generate fear, and thereby to achieve political goals, when direct military victory is not possible. This has led some social scientists to refer to guerrilla warfare as the 'weapon of the weak' and terrorism as the 'weapon

of the weakest'." এজন্য মূলত সন্ত্রাস হলো যেখানে সামরিক বিজয় সম্ভব নয় সেখানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সুশৃঙ্খলিতভাবে সহিংসতার ব্যবহারের মাধ্যমে ভীতি সঞ্চার করা। এজন্য কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী বলেছেন যে, গেরিলা যুদ্ধ দুর্বলের অস্ত্র এবং সন্ত্রাস দুর্বলতমের অস্ত্র।[৩]

১. ১. ২. সন্ত্রাসের প্রকারভেদ

terrorism বা সন্ত্রাসকে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিন্যাস করার চেষ্টা করা হয়েছে। অনেকে সন্ত্রাসকে তিনভাগে ভাগ করেছেন:

(1) Revolutionary Terrorism
(2) Subrevolutionary Terrorism
(3) Establishment Terrorism

প্রথম প্রকার (Revolutionary Terrorism) বা বৈপ্লবিক সন্ত্রাস অর্থ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটিয়ে সেখানে অন্য একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ইটালীর রেড ব্রিগেড, জার্মানীর রেড আর্মি (বাদের মেইনহফ), বাস্ক বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপ (ইটিএ), পেরুর শাইনিং পাথ ইত্যাদি অগণিত উদাহরণ রয়েছে এ জাতীয় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার পূর্ণ বিলুপ্তি না ঘটিয়ে সহিংসতার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমাসীনদের সরিয়ে আংশিক পরিবর্তনের জন্য যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয় তাকে (Subrevolutionary Terrorism) বিপ্লবেতর সন্ত্রাস বলা হয়। অনেকে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকারের বিরুদ্ধে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের কর্মকাণ্ডকে এর উদাহরণ হিসেবে পেশ করেন। আয়ারল্যান্ডের আই. আর. এ.-কেও এ পর্যায়ে ফেলা যায়।

রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বা রাষ্ট্র পরিচালিত সন্ত্রাসকে (Establishment terrorism) প্রাতিষ্ঠানিক সন্ত্রাস বা (state or state-sponsored terrorism) রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বলা হয়। অনেক সময় সরকার বা সরকারের কোনো সংস্থা তারই নাগরিকদের, অথবা সরকারের মধ্যকার কিছু মানুষদের বিরুদ্ধে অথবা অন্য দেশের সরকার বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। এ জাতীয় সন্ত্রাস খুবই ব্যাপক, কিন্তু চিহ্নিত করা কঠিন। কারণ কোনো রাষ্ট্রই সাধারণত নিজের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বা এ ধরনের কর্মকাণ্ডে তার সমর্থন প্রকাশ করে না বা স্বীকার করে না। শীতল যুদ্ধের সময়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও তার সমর্থক দেশগুলি বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বা সহযোগিতা করেছে। অনুরূপভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এঙ্গোলার (UNITA) বিদ্রোহীদের সমর্থন ও তাদের সাথে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণসহ সারা বিশ্বে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বা সহযোগিতা করেছে এবং করছে।

১. ২. ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ

এভাবে আমরা দেখছি যে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ছাড়া সাধারণভাবে সন্ত্রাস মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এক প্রকারের যুদ্ধ। তবে যুদ্ধের সাথে এর পার্থক্য এ যে, যুদ্ধ রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের দাবিদার কর্তৃক পরিচালিত হয়, ফলে সেক্ষেত্রে ক্ষমতা ব্যবহারের বৈধতা বা আইনসিদ্ধতার দাবি করা হয়। এতে সাধারণত যোদ্ধাদেরকে লক্ষ্যবস্তু করা হয় এবং এর উদ্দেশ্য হয় সামরিক বিজয়। পক্ষান্তরে সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা দল রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী নয়। তবে তারা রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে চায়। এ জন্য তারা যোদ্ধা-অযোদ্ধা সবাইকে নির্বিচারে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতি করতে থাকে। যেন এক পর্যায়ে ভীত হয়ে সংশ্লিষ্ট সরকার ও জনগণ অভিষ্ট 'রাজনৈতিক পরিবর্তন' করতে রাজি হয়। সাধারণভাবে যারা সম্মুখ বা গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের উপর সামরিক বিজয় লাভ করতে পারবে না বলে মনে করেন তারাই এরূপ সন্ত্রাসের আশ্রয় নেন।

এখন প্রশ্ন হলো, এরূপ সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের সাথে "ইসলাম"-এর সম্পর্ক কতটুকু? বর্তমানে আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যমে "ইসলাম"-কে সন্ত্রাসের জনক বলে চিত্রিত করা হচ্ছে। অথচ ইতিহাস ও বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সন্ত্রাস বলতে যা বুঝানো হয় তার শুরু হলো ইহূদী উগ্রবাদীদের দ্বারা। প্রাচীন যুগ থেকে ইহূদী উগ্রবাদী ধার্মিকগণ 'ধর্মীয় আদর্শ' ও 'ধর্মীয় রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার জন্য সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়েছেন। মানব ইতিহাসে প্রাচীন যুগের প্রথম প্রসিদ্ধ সন্ত্রাসী কর্ম ছিল উগ্রপন্থী ইহূদী যীলটদের (Zealots) সন্ত্রাস। খৃস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী ও তার পরবর্তী সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে বসবাসরত উগ্রবাদী এ সকল ইহূদীরা নিজেদের ধর্মীয় ও সামাজিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আপোসহীন ছিল। যে সকল ইহূদী রোমান রাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা করত বা সহঅবস্থানের চিন্তা করত এরা তাদেরকে গুপ্ত হত্যা করত। এজন্য এরা সিকারী (the Sicarii: dagger men) বা ছুরি-মানব নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এরা প্রয়োজনে আত্মহত্যা করত কিন্তু প্রতিপক্ষের হাতে ধরা দিত না। এদের হত্যাকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য ছিল জনগণ ও প্রশাসনকে সন্ত্রস্ত করা। এজন্য তাদের টার্গেটকে প্রকাশ্য দিবালোকে বাজার, উপাসনালয়, উৎসবকেন্দ্র বা অনুরূপ জনসমাবেশের মধ্যে আক্রমন করে হত্যা করত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এ সকল হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে জনগণকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা এবং রোমান প্রশাসন ও তাদের 'দালালদেরকে' তাদের কর্মকাণ্ডের সংবাদ জানানোর ব্যবস্থা করা।[৪]

মধ্যযুগে খৃস্টানদের মধ্যে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে সন্ত্রাসের অগণিত ঘটনা আমরা দেখতে পাই। বিশেষত ধর্মীয় সংস্কার, পাল্টা-সংস্কার (the Reformation and the Counter-Reformation)-এর যুগে ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্টদের মধ্যে অগণিত যুদ্ধ ছাড়াও যুদ্ধ বহির্ভুত সন্ত্রাসের অনেক ঘটনা দেখা যায়।[৫]

পক্ষান্তরে ইসলামের ইতিহাসে আমরা যুদ্ধ দেখতে পেলেও সন্ত্রাস খুবই কম দেখতে পাই। ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন প্রকারের যুদ্ধ হয়েছে। যেমন মুসলিম রাষ্টের সাথে অমুসলিম রাষ্ট্রের, মুসলিম রাষ্টের সাথে মুসলিম রাষ্ট্রের, মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে বিদ্রোহীদের যুদ্ধ ইত্যাদি। কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম সমাজে মুসলমানদের মধ্যে, অথবা অমুসলিমদের মধ্যে সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা বা অন্য কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের উদাহরণ খুবই কম। ইসলামের ইতিহাসের প্রচীন দু-একটি ঘটনার কথা আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করব। তার আগে আমরা বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করি।

বর্তমানে কিছু মুসলিম বিভিন্ন দেশে অযোদ্ধা ও নিরীহ মানুষ হত্যা করছে বা সন্ত্রাসের আশ্রয় নিচ্ছে বলে শোনা যায়। এগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রমাণিত নয়। সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী ঘটনা আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধ্বংস। বিন লাদেন বা তার বাহিনী তা করেছে বলে দাবি করে যুক্তরাষ্ট্র এ দাবির ভিত্তিতে আফগানিস্তানের ও ইরাকের লক্ষ লক্ষ নিরীহ নিরস্ত্র অযোদ্ধা নারী-পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনোভাবেই বিষয়টি প্রমাণ করতে পারেনি। উপরন্তু এ অভিযোগে আটক ব্যক্তিদের গুয়ান্তামো বে-তে সকল মানবাধিকার ও ন্যায় বিচারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে বর্বর অত্যাচারের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি গ্রহণের চেষ্টা করা হচ্ছে। বাহ্যত এদের বিরুদ্ধে মার্কিন জনগণ ও বিচারকদের সামনে পেশ করার মত গ্রহণযোগ্য কোনো প্রমাণ নেই বলেই এরূপ করা হচ্ছে।

যে কোনো এনসাইক্লোপীডিয়া বা তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থে সন্ত্রাসের ইতিহাস পাঠ করুন। দেখবেন সন্ত্রাসের উৎপত্তি ও বিকাশে মুসলমানদের অবদান খুবই কম। আমরা দেখেছি যে, সন্ত্রাসের উৎপত্তি ইহূদী যীলটদের (Zealots) হাতে। আধুনিক ইতিহাসে ভারতে, ইউরোপে ও অন্যান্য দেশে অগণিত সন্ত্রাসী দল ও সন্ত্রাসী ঘটনা পাবেন। এদের প্রায় সকলেই ইহূদী, খৃস্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। ভারতে, আমেরিকায় বা অন্যত্র কোনো সন্ত্রাসী ঘটনা হলেই প্রথমে মুসলিমদেরকে দায়ী করা হয় এবং প্রচার মাধ্যমে তা ফলাও করা হয়। পরবর্তী তদন্তে অনেক সময় এদের সম্পৃক্ততা প্রমাণ করা যায় না, অথবা প্রমাণিত হয় যে, অন্যরা তা করেছে। কিন্তু সাধারণত প্রচার মাধ্যমে তা ফলাও করা হয় না। এরপরও যদি মুসলিমদের নামে কথিত সন্ত্রাসী ঘটনাগুলিকে সত্য বলে মেনে নেওয়া হয় তবে তা বিশ্বের সকল সন্ত্রাসী ঘটনার কত পারসেন্ট? ১ বা ২ পারসেন্টও নয়।

এভাবে আমরা দেখছি যে, 'ইসলামী জঙ্গিবাদ', 'ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও হত্যা'র বিষয়ে যা কিছু বলা হয় তার অধিকাংশই ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার। এরূপ মিথ্যা প্রচারণার পাশাপাশি আমরা দেখছি যে, প্রকৃতই কিছু মুসলিম ইসলামের নামে, ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে বা অন্যায়ের প্রতিবাদের নামে হত্যা বা ধ্বংসাত্মক কর্মে লিপ্ত হচ্ছে। সত্য ও মিথ্যা এ সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে অনেক আলোচনা-পর্যালোচনাও আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা দেখছি যে, সারা বিশ্বে অমুসলিম ও মুসলিম গবেষক-বুদ্ধিজীবীগণ জঙ্গিবাদের যে সকল কারণ উল্লেখ করছেন সেগুলির অন্যতম: (১) ইসলাম, (২) ইসলামী শিক্ষা, (৩) ওহাবী মতবাদ ও (৪) পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র।

১. ৩. আলোচিত প্রথম কারণ: ইসলাম

অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত জঙ্গিবাদের জন্য ইসলাম ধর্মকে দায়ী করেন। এদের মধ্যে কেউ মনে করেন, ইসলামে অনেক ভাল কথা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং ইসলামী সভ্যতার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার সহ-অবস্থান সম্ভব। তবে ইসলামের মধ্যে ভাল বিষয়ের সাথে জিহাদ, ধর্মত্যাগ, বিধর্মীদের সাথে যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ক কিছু উগ্র ও অসহিষ্ণু বিষয়ও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যেগুলি মানবাধিকার বা সভ্যতার সহঅবস্থান বা বিকাশের বিপক্ষে। এ সকল শিক্ষা থেকেই জঙ্গিবাদের জন্ম। এজন্য জঙ্গিবাদ দমনের জন্য ইসলামের 'ভাল শিক্ষাগুলির' প্রসংশা করতে হবে ও সেগুলির বিকাশ ঘটাতে হবে। পাশাপাশি উগ্র বা 'খারাপ' শিক্ষার বিস্তার রোধ করতে হবে। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে। এ থেকে 'উগ্রতা'-র উৎসাহ দিতে পারে এরূপ শিক্ষা বাদ দিতে হবে। এভাবে মুসলিম সমাজগুলিতে 'মডারেট' মুসলিমদের উত্থান ঘটাতে পারলেই জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

অন্য অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে করেন বা দাবি করেন যে, ইসলামের মূল শিক্ষাই "জঙ্গি"। তাদের মতে, ইসলাম তার অনুসারীদের অসহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয়। ইসলামে জিহাদের নামে অমুসলিমদেরকে হত্যা করার উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে। আর এর ফলেই মুসলিমদের মধ্যে জঙ্গিবাদের উত্থান। তাদের মতে ইসলামী সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বন্ধ করার একমাত্র উপায় ইসলাম ধর্মকে নির্মুল অথবা নিয়ন্ত্রণ করা। এরা দাবি করেন যে, ইসলামী সভ্যতার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত আবশ্যম্ভাবী। একে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। বিশ্বব্যাপী জঙ্গিবাদের উত্থান 'সভ্যতার সংঘাত' তত্ত্বের সঠিকত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

ইহূদী-খৃস্টান ধর্মগুরু ও ধর্মীয় উগ্রবাদীরাই শুধু নয়, পাশ্চাত্যের অনেক "ধর্মনিরপেক্ষ" রাষ্ট্রনেতা বা রাজনৈতিক নেতাও বিশ্বাস করেন যে, ইসলাম ও সন্ত্রাস সমার্থক এবং ইসলামকে প্রতিরোধ করাই সন্ত্রাসকে প্রতিরোধ করা। অনেকে চক্ষু লজ্জায় বা 'ডিপ্লোম্যাটিক-রাজনৈতিক' প্রয়োজনে তা সরাসরি বলেন না। তারা বলেন না যে 'ইসলামের বিরুদ্ধে' যুদ্ধ করতে হবে, বরং বলেন, 'ইসলামী জঙ্গিবাদের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু অনেকেই মনের কথাটি বলে ফেলেন, তাঁরা 'ইসলামী জঙ্গিবাদের' বিরুদ্ধে নয়, বরং 'ইসলামের' বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে ডেনমার্কের রানী এক বিবৃতিতে বলেন:

We are being challenged by Islam these years- globally as well as locally. It is a challenge we have to take seriously... We have to show our opposition to Islam and we have to, at times, run the risk of having unflattering labels placed on us because there are some things for which we should display no tolerance.

"বর্তমান বছরগুলিতে আমরা আন্তর্জাতিকভাবে এবং স্থানীয়ভাবে ইসলামের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছি। এ চ্যালেঞ্জকে আমাদের

কঠিনভাবে গ্রহণ করতে হবে। ইসলামের প্রতি আমাদের বিরোধিতা আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে হবে। প্রয়োজনে এজন্য আমাদেরকে অপ্রশংসনীয় বদনাম গ্রহণের ঝুঁকিও গ্রহণ করতে হবে। (ইসলামের প্রতি বিরোধিতা বা বিদ্বেষ প্রকাশের কারণে সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী, বর্ণবাদী ইত্যাদি খারাপ বিশেষণে ভূষিত হওয়ার ঝুঁকিও মেনে নিতে হবে।) কারণ কিছু কিছু বিষয় আছে যে বিষয়ে আমাদের কোনো নমনীয়তা বা সহনশীলতা প্রদর্শন করা উচিত নয়। (ইসলাম অনুরূপ বিষয় যার প্রতি কোনোরূপ সহশীলতা প্রদর্শন করা যাবে না, যদিও তাতে আমাদেরকে উগ্র, মৌলবাদী বা অনুরূপ কিছু বলা হয়।)"![৬]

এরা মনে করেন, মানব সভ্যতার সংরক্ষণের জন্য জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায়, শক্তির মাধ্যমে বিশ্বের সকল মুসলমানকে হত্যা করা, বন্দী করা, জোরপূর্বক খৃস্টান বানানো ও মুসলিম দেশগুলিকে সামরিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। বিশেষত, ইসলামী শিক্ষার বিস্তার রোধ করা।

বর্তমানে আমরা পত্রপত্রিকায় প্রতিনিয়তই দেখতে পাই যে, ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক 'ধর্মনিরপেক্ষ' (?) রাজনীতিবিদ তাদের দেশগুলিতে মসজিদ তৈরি নিষিদ্ধ করতে, মুসলিমদের নাগরিকত্ব প্রদান বন্ধ করতে বা বহিষ্কার করতে সরকারের নিকট প্রকাশ্যে দাবি দাওয়া তুলছেন। উপরন্তু এ সকল দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে তারা নির্বাচনে ভাল ভোটও লাভ করছেন। এছাড়া এরূপ অনেক পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ (?) রাজনৈতিক নেতা দাবি করছেন যে, ইউরোপে বা আমেরিকায় যদি কোনো সন্ত্রাসী হামলা হয় তবে নিশ্চিত ধরে নিতে হবে যে, মুসলিম সন্ত্রাসীরাই তা করেছে এবং এর জবাবে ক্ষেপনাস্ত্রের মাধ্যমে মক্কা-মদীনা ধ্বংস করে দিতে হবে।

আমেরিকার প্রসিদ্ধ ও প্রভাশালী চিন্তাবিদ ও লেখিকা অ্যান কালটার (Ann Coulter) সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনের জন্য সকল মুসলিম দেশ দখল করে মুসলিমদেরকে জোরপূর্বক খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করার দাবি জানিয়ে লিখেন: "we should invade their countries, kill their leaders and convert them to Christianity." "আমাদের উচিত তাদের দেশগুলি আক্রমন করা, তাদের নেতাদেরকে হত্যা করা এবং ধর্মান্তরিত করে তাদেরকে খৃস্টান বানানো।"[৭]

এ সকল গবেষক-পণ্ডিতকে হয়ত মুসলিমগণ 'ইসলাম-বিদ্বেষী' বলে মনে করতে পারেন, তবে এদের অনেকের ক্ষেত্রেই এরূপ মতপ্রকাশের জন্য বিদ্বেষের চেয়ে অজ্ঞতাই বড় কারণ। এরা দেখছেন যে, কোনো কোনো মুসলিম নির্বিচারে নিরপরাধ মানুষ হত্যা করছে এবং এজন্য তারা ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কুরআনের উদ্ধৃতি পেশ করছে। কাজেই তাঁরা ধারণা করেন যে, কুরআন এরূপই শিক্ষা দিয়ে থাকে। এদের অনেকেই ইসলামের জিহাদ বিষয়ক কিছু নির্দেশ হয়ত পাঠ করেছেন, কিন্তু জিহাদের প্রকৃত অর্থ, শর্ত বা বিধানাবলি জানেন নি। এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিম ধর্ম-প্রচারক বা ধর্মগুরুদের প্রচারণামূলক বইপুস্তক কই পাঠ করেছেন, ইসলামী জ্ঞানের সূত্রগুলি থেকে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করেন নি।

বিশেষত ইসলাম বিদ্বেষী অপপ্রচারের জোয়ারের মধ্যে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ বা যাচাই করা অনেকের জন্যই খুব কঠিন কর্ম। এজন্য প্রচলিত প্রচারের ভিত্তিতে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, জঙ্গিবাদের জন্য ইসলামই দায়ী এবং ইসলামকে নিয়ন্ত্রণ করাই এ সমস্যা দূরীকরণের একমাত্র উপায়।

মুসলমানের সন্ত্রাসের জন্য তার ধর্ম ইসলামকে অভিযুক্ত করার ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। বিশ্বের সর্বত্র ও সকল জাতির মধ্যেই সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটছে। অন্য কোনো ধর্মের সন্ত্রাসীর সন্ত্রাসের জন্য তার ধর্মকে কখনোই দায়ী করা হয় না। কিন্তু মুসলিমের সন্ত্রাসের জন্য ইসলামকে ঢালাওভাবে দায়ী করা হয়।

আসাম, মনিপুর, মিজোরাম, বিহার, শ্রীলঙ্কা, আয়ারল্যান্ড, স্পেন, ফ্রান্স বা অন্য কোনো স্থানের হিন্দু, খৃস্টান, বৌদ্ধ, ক্যাথলিক, প্রটেসট্যান্ট বা অন্য ধর্মের সন্ত্রাসীদের বিষয়ে তাদের ধর্ম উল্লেখ করা হয় না বা ধর্মকে দায়ী করা হয় না। তাদের দেশ বা জাতির পরিচয় দিয়ে বলা হয় আইরিশ, তামিল, মনিপুরী, আসামীয়, বাস্ক, ইটালীয়, স্পেনীয় বা জার্মান সন্ত্রাসী। কিন্তু কোথাও কোনো মুসলিম এরূপ করলে তার ধর্মকে দায়ী করা হয়। বলা হয়, ফিলিপাইন, ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান বা কাশ্মীরের ইসলামী বা মুসলিম সন্ত্রাসী...। অথচ সকল ক্ষেত্রেই সন্ত্রাসের কারণ ও দাবী একই। সকলেই তাদের ধারণা অনুসারে অধিকার রক্ষার সাধারণ পথে ব্যর্থ হয়ে সন্ত্রাসের পথ ধরে এবং সকলেই সন্ত্রাসের বৈধতা ও অনুপ্রেরণার জন্য নিজেদের ধর্মের বাণী ও শিক্ষা ব্যবহার করে।

শুধু ধর্মাবলম্বীদের সন্ত্রাসই নয়, একান্তই ধর্মের নামে ও ধর্মের জন্য হত্যা, গণহত্যা ও সন্ত্রাসের অগণিত ঘটনা রয়েছে, যেগুলিতে কখনোই ধর্মকে দায়ী করা হয় না, বরং সন্ত্রাসে লিপ্ত মানুষদেরকে দায়ী করা হয়। সামান্য একটি তালিকা দেখুন:

(১) ধর্মের নামে ও একান্তই ধর্মীয় প্রেরণায় ইউরোপের খৃস্টানগণ বিগত প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে চার্চের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় ও তত্ত্বাবধানে এবং কখনো কখনো খৃস্টান শাসকদের নির্দেশে বিভিন্নভাবে নিরস্ত্র সাধারণ ইহূদীদেরকে নির্যাতন ও হত্যা করেছেন। এর মধ্যে অনেক "গণহত্যা"র ঘটনা রয়েছে যেগুলিতে একসাথে হাজার হাজার ইহূদীকে হত্যা করা হয়। সর্বশেষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৩৯-১৯৪৫) হলোকস্ট (holocaust)-এ প্রায় ৬ মিলিয়ন ইহূদী নারী, পুরুষ ও শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

(২) একান্ত ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইউরোপের খৃস্টানগণ স্পেনে ও ক্রুসেড যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে হাজার হাজার অযোদ্ধা নিরস্ত্র মুসলিম নারী, পুরুষ ও শিশুকে চরম বর্বরতার সাথে হত্যা করেছে। এর মধ্যে অনেক গণহত্যার

ঘটনা রয়েছে। সর্বশেষ ঘটনা বসনিয়ায় (Bosnia and Herzegovina) সার্ব খৃস্টানগণ কর্তৃক মুসলিম হত্যাযজ্ঞ। এ হত্যাযজ্ঞের অনেক ঘটনার মধ্যে অন্যতম স্রেব্রেনিসায় (Srebrenica) গণহত্যা। একান্তই ধর্মীয় প্রেরণায় এবং ধর্মীয় বিদ্বেষ ও জাতিগত প্রতিহিংসার ভিত্তিতে জাতিসজ্ঞ ঘোষিত নিরাপদ আশ্রয়ে জাতিসজ্ঞের শান্তিরক্ষী বাহিনীর নাকের ডগায় ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে সার্ব খৃস্টানগণ স্রেব্রেনিসায় ৮,০০০ নিরস্ত্র অযোদ্ধা মুসলিম যুবক, কিশোর ও শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করে। সর্বোপরি এ গণহত্যার বিষয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রাথমিক ঠাণ্ডা প্রতিক্রিয়ার কারণ বোধহয় একমাত্র এ-ই যে, ঘাতকগণ ছিল খৃস্টান আর নিহতরা ছিল মুসলমান। এ বিষয়ে এনকার্টার (The Bosnian War Crimes Investigations) রিপোর্টে বলা হয়েছে:

Although the ICTY's inquiry focuses on war crimes committed by the warring parties within Bosnia, it has also raised serious questions among human rights observers about the role of the United States and other Western powers. Specifically, did U.S. intelligence agencies have advance knowledge of the Bosnian Serb attack on Srebrenica and fail to warn the United Nations (UN) forces guarding the city? Why were the U.S. and other Western intelligence agencies slow in releasing evidence of Bosnian Serb war crimes during the nearly four-year-long conflict? And why have Western officials in charge of enforcing the peace accord failed to arrest the two men indicted by the ICTY for masterminding the Bosnian Serb campaign of *ethnic cleansing*—the organized program of mass murder, rape, and destruction of homes and places of worship?

"যদিও আই.সি.টি.ওয়াই (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia)-এর তদন্ত মূলত বসনিয়ার যুদ্ধরত পক্ষগুলির যুদ্ধপরাধ উদ্ঘাটনের জন্য, তা সত্ত্বেও এ ট্রাইবুনাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য শক্তির ভূমিকা সম্পর্কে মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদের মধ্যে গুরুতর কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। বিশেষত, স্রেব্রেনিসায় সার্বদের আক্রমন সম্পর্কে অগ্রিম কোনো তথ্য কি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলির কাছে ছিল? তা সত্ত্বেও কি তারা এ শহর রক্ষায় নিয়োজিত জাতিসজ্ঞ বাহিনীকে সে তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছিল? প্রায় চার বছর দীর্ঘ সংঘাতের সময়ে বোসনিয়ায় সার্বদের যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক তথ্যপ্রমাণাদি প্রকাশ করতে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলি এমন ধীরতা অবলম্বন করল কেন? যে সকল পশ্চিমা কর্মকর্তা শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের দায়িত্বে ছিলেন তারা এ গণহত্যা, গণধর্ষণ ও বাড়িঘর ও উপাসনালসমূহের ধ্বংসযজ্ঞের মূল পরিকল্পনাকারী নায়ক হিসেবে আইসিটিওয়াই যে দু ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেছিল তাদেরকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হলেন কেন?"

(৩) ২০০২ সালে গুজরাট ও কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং পুলিশের প্রত্যক্ষ সহায়তা জঙ্গি হিন্দুরা প্রায় দুই হাজার মুসলিম নারী, পুরুষ ও শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করে, হাজার হাজার মুসলিম নারীকে ধর্ষণ করা হয় ও হাজার হাজার মুসলিম নাগরিকদের বাড়িঘর ও সম্পদ লুট করা হয়।

(৪) ধর্মভিত্তিক সন্ত্রাসের অন্যতম ঘটনা আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির (IRA) সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। বৃটিশদের সাথে আইরিশদের শত্রুতা ও বিরোধিতার মূল উৎস ধর্ম। বৃটিশগণ প্রটেস্ট্যান্ট ও আইরিশগণ ক্যাথলিক। ইউরোপের ইতিহাসে প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যকার ভয়ঙ্কর যুদ্ধগুলি ছাড়াও অনেক গণহত্যার ঘটনা সুপরিচিত। তারই অংশ হিসেবে এ দু দেশের মানুষের মধ্যে শতশত বছরের পুঞ্জিভুত বিদ্বেষের একটি প্রকাশ বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা লাভের জন্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া। লক্ষণীয় যে, উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের প্রটেস্ট্যান্টগণ সর্বদা বৃটিশ শাসনের পক্ষে থেকেছে আর আই. আর. এর সন্ত্রাস পরিচালিত হয়েছে অনেক সময় এ সকল আইরিশ প্রটেস্ট্যান্টদের বিরুদ্ধে। বিশেষত ১৯৭০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত আইআরএর গুপ্তহত্যা, বোমা হামলা, গাড়ি বোমা, বাণিজ্যিক কেন্দ্রে বোমা বিস্ফোরণ ইত্যাদি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে শতশত বেসামরিক নিরস্ত্র নারী, পুরুষ ও শিশু নিহত হয়েছেন এবং অগণিত মানুষ আহত হয়েছেন।

(৫) ধর্মভিত্তিক ও ধর্মীয় সন্ত্রাসের অন্যতম উদাহরণ যায়নবাদী (Zionist) ইহূদীদের সন্ত্রাস। ফিলিস্তিনে ইহূদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য এরা অগণিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে। ধর্মের নামে ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সন্ত্রাস করে তারা অগণিত নিরস্ত্র মানুষ হত্য কারেছে এবং গণহত্যায় লিপ্ত হয়েছে। এ সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল মেনাহেম বেগিনের নেতৃত্বে কিং ডেভিড হোটেল উড়িয়ে দেওয়া ও দির ইয়াসিন নামক গ্রামের নিরস্ত্র নিরীহ মানুষদের গণহত্যা।

মেনাহেম বেগিনের নেতৃত্বে ২২ জুলাই ১৯৪৬ সালে জেরুজালেমের কিং ডেভিড হোটেলে বোমা হামলা চালিয়ে ইরগুন যাভি লিয়াম (the Irgun Zvai Le'umi: National Military Organization) নামক ইহূদী সন্ত্রাসী জঙ্গি সংগঠন নিরস্ত্র শিশু ও মহিলা সহ আরব, বৃটিশ ও ইহূদী শতাধিক নিরস্ত্র অযোদ্ধা মানুষকে হত্যা করে এবং আরো অনেক মানুষ আহত হয়। এনকার্টা এনসাইক্লোপীডিয়ার এ ঘটনাকে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ-জমকালো সন্ত্রাসী ঘটনা (The most spectacular terrorist incident) এবং বিংশ শতাব্দীর ভয়ঙ্করতম সন্ত্রাসী ঘটনা (the most deadly terrorist incidents of the 20th century) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ সন্ত্রাসী মেনাহেম বেগিন পরবর্তীকালে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে এবং তাকে শান্তি তে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছে।

দির ইয়াসিনের বর্বর হত্যাকাণ্ডের নিন্দাজ্ঞাপন করে আলবার্ট আইনস্টাইন এবং ১৮ জন বিশিষ্ট ইহূদী নিউইয়র্ক টাইমসে চিঠি লিখেন ৪ ডিসেম্বর ১৯৪৮। এ চিঠিতে তারা বলেন: "আরব গ্রাম দির ইয়াসিন-এ তাদের (মেনাহেম বেগিন ও তার দলের) আচরন এ পার্টির নির্মমতার এক হৃদয় বিদারক দৃষ্টান্ত। প্রধান সড়ক থেকে দূরে ইহূদী ভূমি বেষ্টিত এই গ্রামবাসী কোন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় নি বরং আরর গোষ্ঠীরা যারা এই গ্রামকে তাদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল তাদের তারা তাড়িয়ে দিয়েছে। সন্ত্রাসী দল ৯ এপ্রিল এই শান্তিকামী গ্রামবাসীর উপর আক্রমন করে। এরা কোনোভাবেই যুদ্ধের প্রয়োজনে কোনো সামরিক লক্ষ্য ছিল না। এই

হামলায় গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী (২৪০ জন) নিহত হন, এবং জেরুজালেমের রাস্তায় বন্দী হিসেবে হটিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের কয়েকজনকে বাঁচিয়ে রাখা হয়। ... সন্ত্রাসীরা এই বর্বরোচিত ঘটনার জন্য লজ্জিত হওয়া তো দূরের কথা, এই ন্যাক্কারজনক ঘটনায় তারা গর্ববোধ করে ও এটি ব্যাপকভাবে প্রচার করে এবং দেশে উপস্থিত সকল বিদেশী সংবাদ সংস্থাকে দির ইয়াসিন-এ তাদের কৃত ধ্বংসযজ্ঞ ও লাশের স্তুপ দেখার আমন্ত্রণ জানায়।"[৮]

এরূপ ধর্মভিত্তিক সন্ত্রাসের অগণিত উদাহরণ আমরা সমকালীন ইতিহাসে দেখতে পাই। এ সকল ঘটনাকে সন্ত্রাসী ও ন্যাক্কারজনক ঘটনা বলে অনেকে স্বীকার করেছেন ও করছেন। কিন্তু কখনোই এ সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য সন্ত্রাসীদের ধর্মকে দায়ী করা হয় নি। যদিও এ সকল সন্ত্রাসী কর্ম একান্তই ধর্মীয় প্রেরণায়, ধর্মীয় বিদ্বেষে বা ধর্মগ্রন্থের বাণীকে ভিত্তি করে করা হয়েছে, তবুও কখনোই তাদের বিষয়ে খৃস্টান সন্ত্রাসী, ক্যাথলিক সন্ত্রাসী, প্রটেস্ট্যান্ট সন্ত্রাসী, অর্থোডক্স সন্ত্রাসী, হিন্দু সন্ত্রাসী, ইহূদী সন্ত্রাসী বা অনুরূপ কিছু বলা হয় না। বরং তাদের জাতি, গোষ্ঠী বা অন্যান্য পরিচয়কে তুলে ধরা হয়। সর্বোপরি কখনোই তাদের সন্ত্রাসী বা মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য তাদের ধর্মকে দায়ী করা হয় না।

সন্ত্রাস উদযাপনও করা হচ্ছে। ১৯৪৬ সালে কিং ডেভিড হোটেলের এ সন্ত্রাসী ঘটনার ৬০ বর্ষপূর্তি ইস্রাইলে ঘটা করে উদযাপন করা হয়। ২০০৬ এর জুলাই মাসে ইস্রায়েল রাষ্ট্র প্রশাসন ও জনগণ এ সন্ত্রাসী ঘটনার ৬০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে "জয়ন্তী" উৎসব পালন করে। এ বিষয়ে ভারতের জাতীয় দৈনিক 'দি হিন্দু'র ২৪/৭/২০০৬ তারিখের অনলাইন সংস্করণে "সন্ত্রাস উদযাপন: ইসরাইলী স্টাইল (Celebrating Terror, Israeli-style) প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।[৯]

অনেকেই এরূপ গণহত্যা ও সন্ত্রাস উদযাপনের নিন্দা করেছেন, কিন্তু কেউই এজন্য ইহূদী ধর্ম, ধর্মীয় শিক্ষা বা ধর্মগ্রন্থকে দায়ী করেন নি। কিন্তু ইহূদী রাষ্ট্রের বর্বর সন্ত্রাস ও গণহত্যার প্রতিবাদে অন্য কোনো উপায় না পেয়ে যখন কোনো ফিলিস্তিনী সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয় তখন তার সন্ত্রাসকে "ইসলামী সন্ত্রাস" ও তাকে "মুসলিম সন্ত্রাসী" বলে উল্লেখ করা হয়।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখছি যে, জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাস সকল ধর্মের, দেশের ও মতাদর্শের মানুষদের মধ্যে বিরাজমান। এ বিষয়ে মুসলিমদের "শেয়ার" নিতান্তই সীমিত। আর ইহূদী, আইরিশ, জার্মান, সার্ব, তামিল, আসামীয়, মনিপুরি, নেপালী, তিব্বতী, চীনা, আমেরিকান ও অন্যান্য সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাসের জন্য যেমন ইহূদী, খৃস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্ম দায়ী নয়, তেমনি মুসলিমদের সন্ত্রাসের জন্য কখনোই তার ধর্ম দায়ী নয়। কারো অপরাধের জন্য তার ধর্মকে দায়ী করা শুধু অপরাধই নয়, বরং তা অপরাধীর পক্ষে জনমত তৈরি করে এবং অপরাধ দমন বাধাগ্রস্ত করে। আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদে তা আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

১. ৪. আলোচিত দ্বিতীয় কারণ: ইসলামী শিক্ষা

বিশ্বের ধার্মিক বা অধার্মিক কোনো মুসলিমই উপর্যুক্ত মতামত সঠিক বলে মানতে পারেন না। বরং তারা একে বাস্তবতা বিবর্জিত এবং বিদ্বেষমূলক মত বলে বিশ্বাস করেন। তাঁরা অনুভব করেন যে, যদি ইসলাম ধর্মই জঙ্গিবাদের জন্য দায়ী হতো তবে আমরা সকল মুসলিমই আমাদের মধ্যে জঙ্গিবাদের আগ্রহ বা প্রেরণা অনুভব করতাম। মুসলিম পরিবারে বা সমাজে লালিত পালিত সকল ধার্মিক বা অধার্মিক মুসলিমই ইসলাম সম্পর্কে কমবেশি কিছু শিক্ষা পরিবার, প্রতিষ্ঠান বা সমাজ থেকে পেয়েছেন। কিন্তু কখনোই তারা অমুসলিম বা অন্যান্য মতাবলম্বীদের প্রতি অসহিষ্ণুতার শিক্ষা পান নি। সকল মুসলিম সমাজেই মুসলিমগণ অমুসলিমদের সাথে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সাথে বসবাস করে আসছেন। কাজেই জঙ্গিবাদের জন্য ইসলাম কখনো দায়ী হতে পারে না। সমস্যা থাকলে অন্য কোথাও রয়েছে, ইসলামের মধ্যে নয়। তাঁরা অস্বীকার করেন না যে, কিছু মুসলিম সন্ত্রাসের সাথে জাড়িত। তবে তারা কখনোই স্বীকার করেন না যে, তাদের ধর্ম তাদের সন্ত্রাসের জন্য দায়ী। বরং এ সকল সন্ত্রাসীর ব্যক্তিগত বিভ্রান্তি, মানসিক বিক্ষুব্ধতা, সামাজিক অনাচার বা অন্য কোনো কারণ এর পিছনে কার্যকর।

এদের অনেকেই মনে করেন যে, জঙ্গিবাদের উত্থানের জন্য মূলত দায়ী ইসলামী শিক্ষা বা মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার। জঙ্গিবাদের বিস্তারে মাদ্রাসা শিক্ষার এ দায়িত্বের প্রকৃতি নির্ণয়ে এ সকল পণ্ডিতের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আমরা আগেই দেখেছি যে, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অমুসলিম পাণ্ডিতগণও 'ইসলামী শিক্ষাকেই' মূলত জঙ্গিবাদের উত্থানের জন্য দায়ী করছেন। তবে 'দায়িত্বের' প্রকৃতি নির্ণয়ে তাদের মধ্যে এবং তাদের সাথে মুসলিম পণ্ডিতদের বিভিন্নতা রয়েছে। কেউ মনে করছেন যেহেতু ইসলামের মধ্যেই জঙ্গিবাদের শিক্ষা রয়েছে, সেহেতু ইসলামী ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষার প্রসার মানেই জঙ্গিবাদের প্রসার। যত বেশি কুরআন, হাদীস, ফিক্হ ইত্যাদি ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষা প্রসার লাভ করবে, ততই বেশি 'জিহাদী' মনোভাব, অন্য ধর্ম ও মতের প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাব ও মোল্লাতান্ত্রিক (theocratic) স্বৈরাচারী সরকার জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার মনোভাব প্রসার লাভ করবে। এজন্য ইসলামী শিক্ষা বা ইসলামের ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষার প্রসার রোধই জাঙ্গিবাদ দমনের প্রধান উপায়।

অন্য অনেকে মনে করেন যে, ইসলামের মধ্যে মূলত জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের কোনো স্থান নেই, তবে ইসলামী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান বা মাদ্রাসাগুলিতে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। অথবা এগুলির পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী ইসলামকে জঙ্গিবাদী রূপদানের সহায়ক। অথবা ইসলামী আবেগের অপব্যবহার করে এ সকল প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষকদেরকে সহজেই জঙ্গিতে রূপান্তরিত করা যায়। কেউ মনে করছেন, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান সঠিকভাবেই ইসলামের শিক্ষা প্রদান করছে, তবে সম্ভবত শিক্ষা ব্যবস্থা

ও প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে কিছু ত্রুটি রয়েছে, যে কারণে এগুলি জঙ্গিবাদের সাথে জড়িত হয়ে গিয়েছে। এদের মতে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারই জঙ্গিবাদ রোধের উপায়।

'ইসলামী জঙ্গিবাদের' জন্য 'ইসলাম'-কে দায়ী করলে যেমন মুসলিমগণ হতবাক, বিস্মিত, ব্যথিত বা উত্তেজিত হয়ে এরূপ মতকে বিদ্বেষমূলক বলে মনে করেন, ইসলামী শিক্ষা বা মাদ্রাসার সাথে জড়িত মানুষরাও এ দ্বিতীয় মতটির বিষয়ে একইরূপ বিস্ময়, ব্যথা বা উত্তেজনা অনুভব করেন।

তাঁরা অনুভব করেন যে, যদি ইসলামী শিক্ষা বা মাদ্রাসা শিক্ষাই জঙ্গিবাদের জন্য দায়ী হতো তবে আমরা মাদ্রাসার সকল ছাত্র শিক্ষক আমাদের মধ্যে জঙ্গিবাদের আগ্রহ বা প্রেরণা অনুভব করতাম। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কখনোই তা নয়। সন্ত্রাস, হত্যা ও ধ্বংসের প্রতি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা ও বিরোধিতা অনুভব করছেন এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসা আলিম, ইমাম ও পীর-মাশাইখ। বিগত প্রায় আড়াই শত বৎসর ধরে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা উপমহাদেশে চালু রয়েছে এবং মূলত একই পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী অনুসরণ করে চলেছে। এছাড়া অনুরূপ পদ্ধতির অগণিত মাদ্রাসা মালয়েশিয়া ও অন্যান্য মুসলিম দেশে রয়েছে। এগুলি থেকে বের হয়ে আসা অগণিত মানুষ সমাজের বিভিন্ন স্তরে কাজ করেছেন। ইতিহাসের কোনো পর্যায়েই তাঁরা সন্ত্রাসের জন্ম দেন নি। তাঁরা অস্বীকার করেন না যে, কিছু মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষক এ অপরাধের সাথে জাড়িত। তবে তারা কখনোই বিশ্বাস করেন না যে, তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা-ব্যবস্থা তাদের এ অপরাধের জন্য দায়ী। বরং তা তাদের ব্যক্তিগত বিভ্রান্তি।

এ সকল মাদ্রাসাশিক্ষিত মানুষ উপর্যুক্ত পাণ্ডিত-বুদ্ধিজীবীদেরকে 'ইসলামীশিক্ষা বিদ্বেষী' বা 'মাদ্রাসা বিদ্বেষী' বলে মনে করে থাকেন। তবে আমার কাছে মনে হয় 'ইসলামী জঙ্গিবাদের' জন্য 'ইসলাম ধর্ম'-কে দায়ী করা এবং 'ইসলামী শিক্ষা'-কে দায়ী করা উভয় মতের পিছনে অজ্ঞতা একটি বড় কারণ। পাশ্চাত্য অমুসলিম পণ্ডিতগণ যেমন কোনো কোনো মুসলিমকে সন্ত্রাসী কর্মে লিপ্ত দেখে সন্ত্রাসীর ধর্মকে দায়ী করছেন, তেমনি অনেকে কোনো কোনো মাদ্রাসা শিক্ষিতকে সন্ত্রাসে লিপ্ত দেখে সন্ত্রাসীর শিক্ষাকে দায়ী করছেন। এ সকল পণ্ডিতের অনেকেই মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা, পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচী ও মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে পরিচিত নন। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে তাঁরা জানতে পারেন যে, মাদ্রাসাগুলিতে জঙ্গিবাদীদের আখড়া এবং মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ জঙ্গি কার্যক্রমে লিপ্ত। এথেকে তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইসলামী শিক্ষা বা মাদ্রাসা শিক্ষাই মূলত জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিস্তারের জন্য দায়ী।

এ বিষয়ে আন্তরিক বক্তব্য দিয়ে একজন লিখেছেন: "It is a fact that some of the Madrasha students have got involved with what is called 'Islamic' militancy.... Though Madrasha education may not be held rresponsible for these most unwanted activities, yet there are some loopholes and it is time to think about bringing Madrasha education into the mainstream".

"এ কথা বাস্তব সত্য যে, কতিপয় মাদ্রাসা ছাত্র তথাকথিত 'ইসলামী জঙ্গিবাদে' সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। যদিও মাদ্রাসা শিক্ষা সম্ভবত এ সকল অতীব নিন্দনীয় কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী নয়, তবুও মাদ্রাসা শিক্ষায় কিছু ফাঁকফোকর রয়েছে এবং মাদ্রাসা শিক্ষাকে মূলধারায় নিয়ে আসার চিন্তা করার এখনই সময়।"[১০]

নিঃসন্দেহে লেখক "মাদ্রাসা-বিদ্বেষী" নন। তাঁর আন্তরিকতা প্রশংশনীয়। তিনি বলছেন, কতিপয় মাদ্রাসা ছাত্রের ইসলামী জঙ্গিবাদে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা "সম্ভবত" দায়ী না হলেও শিক্ষা ব্যবস্থার ফাঁকফোকর দায়ী। তিনি জানেন যে, "কতিপয়" মাদ্রাসা ছাত্রের পাশাপাশি "অনেক অনেক" স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রও "তথাকাথিত ইসলামী জঙ্গিবাদের" সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু লেখক এজন্য "সাধারণ শিক্ষা" "সম্ভবত" দায়ী না হলেও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার "ফাঁকফোকর"-কে দায়ী বলে অভিযোগ করছেন না। এর কারণ কী!

সম্ভবত এর কারণ হলো মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে তার অজ্ঞতা। তিনি সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় লেখাপড়া শিখেছেন। তিনি জানেন যে, সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় 'জঙ্গিবাদ' শিক্ষা দেওয়া হয় না। কাজেই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যারা জঙ্গিবাদে জড়িত হচ্ছে তাদের অপকর্মের জন্য তাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে বা শিক্ষাব্যবস্থার ফাঁকফোকরকে দায়ী করার কোনো প্রশ্ন তার মনে আসে নি। কিন্তু তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে জানেন না। "সম্ভবত" তিনি মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের বিষয়ে সুধারণা পোষণ করেন। এজন্য তিনি মনে করেন যে, "সম্ভবত" এদের অন্যায়ের জন্য এদের শিক্ষাব্যবস্থা দায়ী নয়। তবে তিনি অনুমানের উপরেই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন যে, এখানে কিছু ফাঁকফোকর রয়েছে।

আমরা বুঝতে পারি যে, কোনো অপরাধীর অপরাধের জন্য তার ধর্ম, শিক্ষা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরিবার ইত্যাদি সাধারণত দায়ী হয় না। তদুপরি আমি এখানে নিম্নের বিষয়গুলি বিবেচনা করতে পাঠককে অনুরোধ করছি।

(১) আমাদের সমাজের লক্ষ লক্ষ দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা, কর্মচারী, রাজনীতিবিদ, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক সকলেই আমাদের দেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিভিন্ন সুপরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত। এদের দুর্নীতির জন্য কেউই তাদের শিক্ষাব্যবস্থা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করেন না। কারণ তাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদ করেন তারাও একই শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত। তাঁরা ভাল করেই জানেন যে, জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় বা এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি শিক্ষা দেওয়া হয় না। কাজেই দুর্নীতিবাজের দুর্নীতির জন্য তার ব্যক্তিগত লোভ, সামাজিক অনাচার, আইনের শাসনের অনুপস্থিতি ইত্যাদিই দায়ী;

তার শিক্ষা ব্যবস্থা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়। এজন্য কোনো অজ্ঞ বা 'মাদ্রাসা শিক্ষিত' মানুষ দুর্নীতির প্রসারের জন্য 'আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা' বা 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' দায়ী বলে মন্তব্য করলে বা ডাক্তারদের 'কসাইসুলভ আচরণের জন্য' মেডিকেল কলেজগুলি' দায়ী বলে মন্তব্য করলে শিক্ষিত মানুষেরা তাকে মুর্খ বা নির্বোধ বলেই মনে করবেন। (তবে কতিপয় মাদ্রাসা শিক্ষিত জঙ্গির জন্য মাদ্রাসা শিক্ষাকে দায়ী করাকে মুর্খতা বা নির্বুদ্ধিতা বলে গণ্য না করে প্রগতিশীলতা, প্রাজ্ঞতা ও বুদ্ধিজীবিতা বলে মনে করবেন তাদের অনেকেই।)

(২) অনুরূপভাবে আমাদের দেশের অনেকে 'সর্বহারার রাজত্বের' নামে সন্ত্রাসকর্মে লিপ্ত। এরা আমাদের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে শিক্ষা লাভ করেছেন। কিন্তু কেউই বলবেন না যে, এদের ঘৃণ্য কর্মের জন্য তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সমাজতান্ত্রিক আদর্শ দায়ী।

(৩) ভারত, বাংলাদেশ ও বিশ্বের অন্যান্য অনেক দেশে অনেক মানুষ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন। আবার এদের পাশাপাশি অনেক দেশে অনেক মানুষ চরমপন্থা, সন্ত্রাস, হত্যা বা জঙ্গি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে একই আদর্শ বাস্তবায়নের চেষ্টা করছেন। তারা থানা, হাসপাতাল ইত্যাদি আক্রমন করছেন, হত্যা ও লুটতরাজ করছেন, বিভিন্ন জনপদ আক্রমন করে গণহত্যা বা গণ-লুটপাট করছেন। এ সকল "মার্কবাদী", "মাওবাদী", "সমাজতন্ত্রী" বা "সাম্যবাদী"-দের অপরাধের জন্য কখনো কেউ তাদের ধর্ম বা আদর্শকে দায়ী করেন না। এমনকি এদের কর্মকাণ্ডে মূলধারার "সাম্যবাদী", "সমাজতন্ত্রী", "মার্কবাদী" বা "মাওবাদী"-গণ লজ্জিত হন না বা তাদেরকে কেউ দায়ীও করেন না।

(৪) মানবাধিকার, গণতন্ত্র ইত্যাদি মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কিন প্রশাসন ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। এ যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানব সন্তান জীবন ও সম্পদ হারিয়েছেন। তারা নির্বিচার বোমা মেরে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষের 'গণহত্যাযজ্ঞে' লিপ্ত হয়েছেন এবং সম্পদ ধ্বংস করেছেন এবং এরপর কয়েকশত কুর্দীকে হত্যার অপরাধে তারা সাদ্দাম হোসেনের বিচার করছেন। ইরাকী, আরব, মুসলিম ও বিশ্বের যে কোনো দেশ ও ধর্মের শান্তিকামী মানুষের দৃষ্টিতে এ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস মানবতার বিরুদ্ধে কঠিনতম অপরাধ। এখানে একজন বিক্ষুব্ধ ইরাকী, আরব বা মুসলমান এ অপরাধের জন্য 'খৃস্টধর্ম', 'গণতন্ত্র' বা 'আমেরিকান সভ্যতা'-কে দায়ী করে মন্তব্য করতে পারেন; কারণ প্রেসিডেন্ট বুশ ও তার সহকর্মীবৃন্দ 'বিশ্বাসী ও ধর্মপরায়ণ খৃস্টান, আমেরিকান সভ্যতার সন্তান ও গণতন্ত্রের ধারক-বাহক'। কিন্তু কোনো খৃস্টান, আমেরিকান, গণতন্ত্রপ্রেমিক বা কোনো একজন প্রাজ্ঞ পণ্ডিত এ মতের সাথে একমত হবেন না। তারা একে অজ্ঞতা প্রসূত প্রলাপ বলেই মনে করবেন। কারণ তারা জানেন যে, খৃস্টধর্ম, গণতন্ত্র বা আমেরিকান সভ্যতা কোনোটির এরূপ হত্যাযজ্ঞ, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও লুটতরাজ শিক্ষা দেয় না বা সমর্থন করে না। মার্কিন প্রশাসন যা করছেন তা বর্তমান নেতৃবৃন্দের অন্যায়, এজন্য তাদের ধর্ম, আদর্শ বা সভ্যতা দায়ী নয়।

(৫) ইসলামী শিক্ষা বা মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয়টিও একই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা লাভ করা মানুষদের দুর্নীতি বা সন্ত্রাসের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে দায়ী করলে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের সৎ ও নীতিবান ছাত্রদের কাছে তা পাগলামি বলে মনে হয়, তেমনিভাবে মাদ্রাসা শিক্ষিত কতিপয় মানুষের সন্ত্রাসের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষাকে দায়ী করলেও মাদ্রসা শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে জড়িত সাধারণ মানুষদের কাছে পাগলামি বলেই মনে হয়।

(৬) বর্তমান সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের সম্পৃক্তির মূল বিষয়টিও বিবেচ্য। আমরা দেখেছি যে, সন্ত্রাসে লিপ্ত ব্যক্তি নিজের ধর্ম বা আদর্শকে ব্যবহার করেন। দেশপ্রেম ও গণতন্ত্রের নামে সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে মানুষের দেশপ্রেম ও গণতান্ত্রিক অনুভূতির অপব্যবহার (exploit) করা হয়। এভাবেই আমেরিকার গণতন্ত্রপ্রেমিক ও মানবাধিকারবাদী মানুষেরা প্রেসিডেন্ট বুশকে ম্যান্ডেট দিয়েছেন আত্মরক্ষা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইরাকের নিরীহ নিরপরাধ মানুষদের মধ্যে হত্যাযজ্ঞ চালানোর।

স্বভাবতই ইসলামের নামে সন্ত্রাসে ইসলামী অনুভূতিকে ব্যবহার (exploit) করা হয়েছে ও হচ্ছে। এতে কোনো কোনো ইসলামপ্রেমিক সরল মানুষ প্রতারিত হচ্ছেন। মাদ্রাসায় পড়া কোনো মানুষ এরূপ প্রতারণার শিকার হতে পারেন না এরূপ দাবি কেউই করেন না। বরং এটাই স্বাভাবিক যে, গণতন্ত্রের নামে সন্ত্রাসে যেমন গণতন্ত্র-প্রেমিকরা প্রতারিত হচ্ছেন, সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্রের নামে সন্ত্রাসে যেমন সাম্যবাদী বা সমাজতন্ত্রীর প্রতারিত হচ্ছেন, তেমনি ইসলামের নামে সন্ত্রাসে ইসলাম প্রেমিক মাদ্রাসা ছাত্ররা বেশি প্রতারিত হবে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এর বিপরীত। জঙ্গিরা হয়ত তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য নিজেরা কোনো 'মাদ্রাসা' বা 'মসজিদ' প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলি বা মাদ্রাসা শিক্ষিত মানুষেরা দলে দলে এ সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে যোগদান করেছেন। বাংলাদেশে 'ইসলামী সন্ত্রাস' নামক জঙ্গিবাদের সাথে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে অভিযুক্তদের মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষিতের সংখ্যা খুবই কম, শতকরা ৫ ভাগও নয়, বাকী ৯৫ ভাগ সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার তথ্য থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতার উন্মেষ থেকে আজ পযন্ত জঙ্গি তৎপরতায় জড়িত থাকার অভিযোগে যেসকল মানুষ অভিযুক্ত হয়েছেন বা শাস্তি পেয়েছেন তাদের অধিকাংশই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত বা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া। ২৪১টি মামলায় আটক ৫০৬ জঙ্গির পরিচয় বিশ্লেষণ করে মাত্র ৩/৪ শতাংশ মাদ্রাসায় পড়া বলে জানা যায়। ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও বিশ্বের অন্যান্য দেশে জঙ্গি কর্মকাণ্ডের অভিযোগে অভিযুক্তদের তালিকা দেখলেও আমরা একই সত্য অনুধাবন করি।

(৭) সংবাদ মাধ্যমের সংবাদ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বিষয়। এরূপ সংবাদ, গণমাধ্যমীয় গবেষণা-প্রবন্ধ ও পর্যালোচনার উপর নির্ভর করে আমেরিকার জনগণ নিশ্চিত বিশ্বাস করেছিল যে, সাদ্দাম হোসেনের কাছে গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র রয়েছে, যা আমেরিকার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য ভয়ঙ্কর হুমকি। আর এজন্যই তারা একবাক্যে প্রেসিডেন্ট বুশকে ইরাক যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছিলেন। আজ

লক্ষ লক্ষ মানব সন্তানের রক্ত ঝরানো এবং অমূল্য মানবীয় সম্পদের ধ্বংসলীলার পরে সবাই জানতে পারলেন ও স্বীকার করলেন যে, এরূপ কোনো অস্ত্র কোনোকালেই সেখানে ছিল না।

সংবাদ মাধ্যমের কারণেই এখনো সবাই জানলেন না যে, এরূপ অস্ত্র থাকলেও কোনো দিনই ইরাক আমেরিকার স্বাধীনতা বা নিরাপত্তার হুমকি হতে পারত না। শুধু ইসরায়েল রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার জন্যই এ গণহত্যা। সংবাদ মাধ্যমের কারণেই এশিয়ার সুনামি মহা সংবাদে পরিণত হয়, কিন্তু ফালুজার গণহত্যা ও মহাধ্বংস কোনো সংবাদই হয় না।

এজন্য গণমাধ্যমের সংবাদ বা তথ্যের উপর নির্ভর করা তো দূরের কথা, সুপ্রশিক্ষিত 'ইন্টেলিজেন্সী'র সুনিশ্চিত রিপোর্টের উপর নির্ভর করাও কঠিন। এ সকল তথ্যের বাইরে বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের দেশের আনাচে কানাচে অগণিত মাদ্রাসা ছড়িয়ে রয়েছে। এ সকল মাদ্রাসার কর্মকাণ্ড সবকিছুই সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত। এগুলির ছাত্র শিক্ষক সকলেই সমাজের সাথে বিভিন্নভাবে জড়িয়ে রয়েছেন। এদের মধ্যে কোনো সন্ত্রাসীর অস্তিত্ব আমরা পাই না। মাদ্রাসা শিক্ষিত যে সকল মানুষ জঙ্গিবাদের সাথে জড়িত হয়েছেন বলে আমরা শুনতে পাচ্ছি তাদের আনুপাতিক হার স্কুল-শিক্ষিত মানুষদের চেয়ে অনেক অনেক কম।

কেউ বলতে পারেন যে, যদিও জঙ্গি কর্মকাণ্ডে সাধারণ শিক্ষিতদের সম্পৃক্ততা বেশি, তবে এরা মাদ্রাসা শিক্ষিতদের প্রচারণার শিকার। যদি সম্পৃক্তদের মধ্যে অন্তত ৫০% মাদ্রাসা শিক্ষিত হতো তাহলেও হয়ত বলা যেত যে, অবশিষ্ট ৫০% তাদের প্রচারণার শিকার। কিন্তু আমরা দেখছি যে, প্রকৃত অবস্থা তার বিপরীত। বস্তুত জঙ্গি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ৫% মাদ্রাসা শিক্ষিতই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত "মুফতী" ও গুরুদের প্রচারণার শিকার।

পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত অনেক মানুষ ইসলামী গবেষণা ও কর্ম শুরু করে আবেগী ও "বোমা-ফাটানো" বৈপ্লবিক তত্ত্ব আবিষ্কার করতে শুরু করেন। গতানুগতিক আলিমদেরকে এরা অযোগ্য, দালাল ও দুর্বল ঈমান বলে আখ্যায়িত করেন। তাদের ক্ষুরধার যুক্তি ও আধুনিক তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্য অনেক মাদ্রাসা শিক্ষিতকেও আকৃষ্ট করে। জঙ্গি কর্মকাণ্ডের পিছনে এদের অবদানই বেশি। সাধারণ শিক্ষিত ও মাদ্রাসা শিক্ষিত সকলেই এদের দ্বারা প্রভাবিত।

কুরআনের যে সকল আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে এরা মানুষদের প্রতারিত করে সেগুলির প্রকৃত অর্থ বা প্রেক্ষাপট কোনো কোনো মাদ্রাসা-শিক্ষিতের জানা থাকে এবং এরা এ সকল বিষয়ে আলিমদেরকে প্রশ্ন করতে চেষ্টা করে। এজন্য মাদ্রাসা-শিক্ষিতদের চেয়ে সাধারণ-শিক্ষিত বা অশিক্ষিতদের প্রভাবিত ও প্রতারিত করা এদের জন্য সহজতর। এজন্যই জঙ্গি কর্মকাণ্ডে সাধারণ শিক্ষিত বা অশিক্ষিতদের সম্পৃক্তি বেশি।

বাংলাদেশে বিগত কয়েক বৎসরে জঙ্গিবাদ বিরোধী অনেক অভিযান চালানো হয়েছে। অনেক মানুষ আটক করা হয়েছে ও অনেক অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত মাদ্রাসা থেকে অস্ত্র উদ্ধার বা গ্রেফতারের একটি রেকর্ডও নেই। ডাকাত বা সন্ত্রাসীরা সেনাবাহিনী বা পুলিশের পোশাক ব্যবহার করলে যেমন সেনাবাহিনী বা পুলিশবাহিনীকে দায়ী করা যায় না, তেমনি কোনো সন্ত্রাসী কোনো স্থানে মসজিদ বা মাদ্রাসা নামে কোনো একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে সেখানে অস্ত্র রাখলে বা মাদক ব্যবসা করলে সেজন্য মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে দায়ী করা যায় না। বিশেষত মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে জড়িতদের তো কোনোরূপ ক্ষমতা বা অধিকার নেই যে, মাদ্রাসা নামে যা কিছু প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে তা তদারকি করবেন।

(৮) জঙ্গিবাদের সাথে মাদ্রাসাকে সম্পৃক্ত করে যারা আমাদের দেশে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেন তাদের বড় দুর্বলতা বাছ-বিচার ছাড়াই পাশ্চাত্য বা বিদেশী পণ্ডিতদের মতামত আওড়ান। প্রকৃত বিষয় হলো "জঙ্গি" তৈরির বিশেষ উদ্দেশ্যেই আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে অনেক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।

বস্তুত রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য পাকিস্তান সরকার সর্বদা ইসলামী অনুভূতির অপব্যবহার করেছে। কাশ্মির জিহাদ ও অন্যান্য ইস্যুতে সরকার, সেনাবাহিনী বা এগুলির অঙ্গসংস্থা অনেক আলিম ও মাদ্রাসাকে ব্যবহার করেছে। তাদেরকে অস্ত্র প্রদান করা হয়েছে এবং ময়দানে যুদ্ধ করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। স্বভাবতই এক্ষেত্রে জিহাদের প্রেরণা ব্যবহার করা হয়েছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা দেখব যে, ইসলামে জিহাদ বৈধ হওয়ার একটি শর্ত হলো রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে জিহাদ পরিচালিত হওয়া। এজন্য স্বভাবতই মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ এরূপ জিহাদে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। আর একবার যারা অস্ত্রের ভাষা আয়ত্ব করেন তার সবসময়েই অস্ত্রের ভাষায় কথা বলতে চান।

১৯৭৯ খৃস্টাব্দে আফগানিস্তানে সোভিয়েট আগ্রাসন ও আলিমদের নেতৃত্বে আফগান জনগণের প্রতিরোধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সুর্বণ সুযোগ এনে দেয়। আফগান প্রতিরোধ যোদ্ধাদেরকে অর্থ ও অস্ত্র দেওয়া ছাড়াও সারা বিশ্ব থেকে মুজাহিদ সংগ্রহ, অর্থায়ন ও অস্ত্রায়নের কাজ যুক্তরাষ্ট্র ভালভাবেই করে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, সৌদি আরব ও অন্যান্য দেশ থেকে ধার্মিক মানুষদের বা মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে আফগান যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে এদের তত্ত্বাবধানে অনেক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমর্থনপুষ্ট এ সকল "মুজাহিদ" যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজনের পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে "জঙ্গি" বলে পরিগণিত হলেন। যুক্তরাষ্ট্র যতদিন এদের মুজাহিদ, প্রতিরোধ-যোদ্ধা বা মুক্তিযোদ্ধা বলেছে ততদিন আমাদের বুদ্ধিজীবীরাও এদেরকে তাই বলেছেন। আবার যখন থেকে যুক্তরাষ্ট্র এদেরকে জঙ্গি বলতে শুরু করল আমাদের বুদ্ধিজীবীরাও তা বলতে শুরু করলেন। সর্বোপরি মার্কিনীদের তালে তালে সকল দেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে জঙ্গি তৎপরতার সাথে যুক্ত করলেন।

(৯) কেন ইউ-টার্ন করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সাথীরা? প্রথমত তাদের প্রয়োজন মিটে যাওয়ার কারণে। দ্বিতীয়ত তাদের পরবর্তী প্রয়োজন মেটানোর জন্য। তাদের প্রথম প্রয়োজন ছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়া ও সোভিয়েট

ইউনিয়নকে পরাজিত করা। "মুজাহিদ"-দের মাধ্যমে সে প্রয়োজন মেটানোর পরে মুজাহিদরা জঙ্গিতে পরিণত হলেন।

তাদের পরবর্তী প্রয়োজন ইসলামকে নিয়ন্ত্রণ করা। সোভিয়েট ইউনিয়ন, সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সর্বগ্রাসী প্রচারাভিযান ও যুদ্ধাভিযান চালিয়ে তার পতন ঘটানোর পরে যুক্তরাষ্ট্র "ইসলাম"-কে "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের" সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে গণ্য করে। তবে সর্বদা সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের বক্তব্য অতি সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করেন। "ইসলাম সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের" প্রধন শত্রু একথা না বলে তারা বলেন "ইসলাম পাশ্চাত্য সভ্যতা, গণতন্ত্র বা মানবাধিকারের" প্রধান শত্রু, একসময় যেমন সমাজতন্ত্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন ছিল "পাশ্চাত্য সভ্যতা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের" অর্থাৎ "সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসানের" প্রধান শত্রু। তারা দেখলেন যে, ইসলামকে 'দানব'-রূপে চিত্রিত করার জন্য তাদের তৈরি এ সকল "মুজাহিদ"-কে জঙ্গিতে রূপান্তরি করা খুবই কার্যকর পদক্ষেপ।

(১০) যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে কোরিয়া, জার্মানী ও অন্যান্য দেশ দখল করে, সেদেশে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে তথায় অবস্থানের ও আধিপত্য করার সুযোগ পেয়েছে ঠিক তেমনিভাবে ইরাক ও আফগানিস্তান দখল করে এ সকল দেশে গণতন্ত্র ও জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে এ সকল দেশে তাদের অবস্থান ও আধিপত্য চিরস্থায়ী করতে পারবে বলে ধারণা করেছিল। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে নি। গণতন্ত্র, জাতীয় সরকার, আধুনিক জীবনযাত্রা, পাশ্চাত্য শিক্ষার সুযোগ ইত্যাদি কোনো কিছুর বিনিময়েই এ সকল দেশের জনগণ যুক্তরাষ্ট্রের ও তার সহযোগীদের অবস্থান ও আধিপত্য মেনে নিতে রাজি হচ্ছেন না। বাহ্যত এর একটিই কারণ; তা হলে "ইসলাম"। ইসলামী অনুভূতি, স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আবেগ বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত এ সকল দেশে এবং বিশ্বের অন্য কোনো মুসলিম দেশে সাম্রাজ্যবাদীদের অবস্থান ও আধিপত্য নিরাপদ নয়। আর ইসালামী বিশ্বাস, স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আবেগ নির্মূল বা নিয়ন্ত্রণ করতে "মাদ্রাসা" শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের কোনো বিকল্প নেই।

(১১) সাম্রাজ্যবাদীরা খুব ভালভাবে লক্ষ্য করেছেন, যে কোনো দেশে তাদের আগ্রাসন ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে সবেচেয়ে বেশি সোচ্চার সাম্যবাদী বা "বামপন্থী" এবং "ইসলামপন্থী"-গণ। আর "ইসলামপন্থী"-দেরকে নির্মুল বা দুর্বল করতে "জঙ্গিবাদ" ও "মাদ্রাসাশিক্ষা" বিরোধী প্রচারণা অত্যন্ত কার্যকর। মাদ্রাসা শিক্ষায় "জঙ্গি" তৈরি না হলেও "ধার্মিক মুসলিম" তৈরি হয়। এরা আধিপত্য ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। ইরাক, ইরান, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান ও অন্যান্য সকল দেশের তেল, গ্যাস, খনিজসম্পদ ইত্যাদির ইজারা বা দখল নিতে এবং এ সকল দেশে আধিপত্য বিস্তার করতে প্রধান বাধা এ সকল ধার্মিক মানুষ। এদের আধিক্য তাদের উদ্দেশ্য সাধনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে এবং এদের দুর্বলতা ও স্বল্পতা তাদের উদ্দেশ্য পূবণের পথ খুলে দেবে। ধার্মিক মানুষদেরকে সাধারণ মানুষদের চোখে হেয় করতে এবং ধার্মিক মানুষ তৈরির পথ রোধ করতে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করার কোনো বিকল্প নেই। এজন্যই তারা জঙ্গিবাদের ধুয়া তুলে মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। যদিও তাদের জানা থাকার কথা যে, তাদের তৈরি মাদ্রাসাগুলি এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিতগণ ছাড়া কোনো মাদ্রাসা থেকে জঙ্গি তৈরি হয় না।

(১২) নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত যে কোনো গবেষণা প্রমাণ করবে যে, জঙ্গিবাদের সাথে এদেশের কওমী বা আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষিত মানুষদের সম্পৃক্তি খুবই কম। এছাড়া অন্যান্য সকল দুনীতি ও অপরাধের সাথে এদের সম্পৃক্তি একেবারেই কম। যৌতুক, মাদকতা, মাদক পাচার, চুরি-ডাকাতি, খুন-সন্ত্রাস ইত্যাদি সকল অপরাধে জড়িত মানুষদের বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা করলেই তা জানতে পারবেন। দেশের জনসংখ্যার মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের আনুপাতিক হার সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান আমাদের জানা নেই। তবে গত কয়েক বৎসরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ও দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের আনুপাতিক হারের পাশাপাশি কওমী মাদ্রাসার ছাত্রদের যোগ করলে সাধারণভাবে অনুমান করা যায় যে, শিক্ষিত বা স্বাক্ষর মানুষদের মধ্যে কমবেশি ১৫% মানুষ মাদ্রাসা শিক্ষিত। কিন্তু উপরের যে কোনো অপরাধে জড়িতদের মধ্যে ২% বা ১% ভাগ মাদ্রাসা শিক্ষিত মানুষও পাওয়া যাবে না বলেই প্রতীয়মান হয়।

(১৩) মাদ্রাসা শিক্ষার ধর্মীয় ও নৈতিক ভিত্তির কারণে এ শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যে দুর্নীতি, অপরাধ, মাদকতা, মাদক পাচার ও অন্যান্য সকল অপরাধের প্রতি ঘৃণা ও আপত্তি বিদ্যমান থাকে। এজন্য তাদের অধিকাংশ এ সকল অপরাধ থেকে দূরে থাকার পাশাপাশি এ সকল অপরাধ বিরোধী মানসিকতা তৈরিতে সহায়তা করেন। এ ছাড়া স্বভাবতই তারা অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, ব্যভিচার, জুয়া, মদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন। যে কোনো দেশপ্রেমিক নাগরিকের দৃষ্টিতে এগুলি দেশগড়ার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে যারা বাণিজ্যিক বা অন্য কোনো স্বার্থে এ সকল অপরাধ বা অনাচারের প্রসার কামনা করেন তাদের দৃষ্টিতে মাদ্রাসা শিক্ষিত মানুষেরা তাদের প্রধান বাধা।

(১৪) বস্তুত ইসলামী শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার সম্প্রসারণই জঙ্গি দমনের অন্যতম উপায়। কারণ সঠিক ইসলামী জ্ঞান থাকলে তাকে ইসলামের নামে বিভ্রান্ত করা সম্ভব হয় না। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুসারে যতগুলি "জঙ্গি" দলের তালিকা করা হয়েছে, যত "জঙ্গি" গ্রেফতার করা হয়েছে বা তালিকাভুক্ত করা হয়েছে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার দিকে একবার তাকলেই যে কেউ নিশ্চিত হবেন যে, এদের অধিকাংশই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। উপরন্তু এদের অধিকাংশই মাদ্রাসা শিক্ষিত বা আলিমগণের ঘোর বিরোধী। তারা আলিমদেরকে দালাল, আপোষকামী ও অজ্ঞ বলে প্রচার করে এবং তাদের অনুসারীদেরকে আলিমদের সাথে মিশতে নিষেধ করে। শুধু তাদের মতের সাথে যে আলিমের মত মিলে যায় তার প্রশংসা করে। এদের ধর্মীয় আবেগের সাথে সঠিক ধর্মীয় জ্ঞান না থাকার কারণে এদের মধ্যে উগ্রতা জন্ম নিয়েছে বা বপন করা হয়েছে। এদের মধ্যে কিছু মানুষ রয়েছে যারা অল্প কিছুদিন মাদ্রাসায় পড়েছে। এদেরও আবেগ তৈরি হয়েছে, কিন্তু জ্ঞান অর্জিত হয় নি।

সঠিক ইসলামী জ্ঞান না থাকাই জঙ্গিবাদের ক্ষপ্পরে পড়ার মূল কারণ। বস্তুত ধর্মীয় অনুভূতি মানুষের জন্মগত সহজাত

অনুভূতি। সন্তানের প্রতি স্নেহ, পিতামাতার প্রতি ভালবাসা, সম্পদের মোহ, আত্মপ্রেম ইত্যাদির মতই ধর্মীয় অনুভূতি মানুষের সহজাত অনুভূতি। এ সকল অনুভূতিকে নির্মূল করা যায় না। একে সঠিক খাতে প্রবাহিত করাই মানবতার কল্যাণের একমাত্র পথ। ইসলাম সম্পর্কে আবেগ ও ভালবাসার পাশাপাশি সঠিক জ্ঞান না থাকলে সহজেই একজন মানুষকে বিভ্রান্ত করা সম্ভব।

(১৫) জঙ্গিবাদ আমাদের দেশের একটি সমস্যা। এর পাশাপাশি আমাদের সমস্যগুলির অন্যতম হলো, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, পারিবারিক বা সামাজিক সহিংসতা, যৌতুক, এসিড, দুর্নীতি, ধর্ষণ, অপহরণ, খুন-খারাবি, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, মাদকাসক্তি ইত্যাদি। কেবলমাত্র নীতিকথা বা বদলে যাওয়ার উৎসাহ দিয়ে এ সকল অপরাধ বা অবক্ষয় কখনোই রোধ করা যায় না। বস্তুত মমত্ববোধ, দায়িত্ববোধ ও নৈতিক অনুভূতির সাথে "ভয় ও লোভ"-ই মানুষকে অপরাধ ও অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে পারে। প্রতিশোধের স্পৃহা, সম্পদ, ক্ষমতা বা শক্তির লোভ ও অনুরূপ পশুপ্রবৃত্তি মানুষকে দ্রুত ও নগদ স্বার্থ হাসিলের জন্য দুর্নীতি ও হিংস্রতায় উদ্বুদ্ধ করে। ভয় ও লোভই তার "নগদ" প্রাপ্তির স্পৃহা নিয়ন্ত্রণ করে। এ ভয় ও লোভের তিনটি পর্যায়: (১) নিজের বিবেকের কাছে নন্দিত বা নিন্দিত হওয়ার ভয় ও লোভ। (২) সমাজ, রাষ্ট্র বা আইনের চোখে নিন্দিত, নন্দিত, তিরস্কৃত, পুরস্কৃত বা শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার আশা ও ভয়। (৩) আল্লাহর কাছে নিন্দিত, নন্দিত, তিরস্কৃত বা পুরস্কৃত হওয়ার আশা ও ভয়।

এর মধ্যে তৃতীয় পর্যায়টিই প্রকৃতভাবে দুর্নীতি ও হিংস্রতা বন্ধ করতে পারে। কারণ, প্রত্যেকের পক্ষেই নিজের বিবেককে প্রবোধ দেওয়া সম্ভব। সকলেই জানে সমাজ, রাষ্ট্র বা আইনকে ফাঁকি দেওয়া যায় এবং এগুলির কাছে কোনো সঠিক মূল্যায়ন আশা করা যায় না। এজন্য প্রকৃত সততা তৈরি করতে আল্লাহর ভয় ও লোভ সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই। আল্লাহ সকল কর্মের পরিপূর্ণ পুরস্কার দিবেন এবং সকল অন্যায়ের শাস্তি দিবেন বলে অবচেতনের বিশ্বাস লাভের পর মানুষ যে কর্মটি আল্লাহর কাছে অন্যায় বলে নিশ্চিত জানতে পারে সে কাজ করতে পারে না এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে ভাল বলে প্রমাণিত কাজটি কোনো জাগতিক পুরস্কার বা প্রশংসার আগ্রহ ছাড়াই, বরং সকল প্রতিকুলতা সত্ত্বেও করার চেষ্টা করে।

বিশেষত আমাদের দেশে যেখানে আইনকে ফাঁকি দেওয়া অনেক বেশি সহজ সেখানে একমাত্র আল্লাহর ভয়ই দুর্নীতি, অপরাধ ও অবক্ষয় রোধের একমাত্র রক্ষাকবজ। এজন্য নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রসারই এ সকল অপরাধ ও অবক্ষয় নিয়ন্ত্রণে সত্যিকার অবদান রাখতে পারে।

(১৬) জঙ্গিবাদ এবং মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী, আধিপত্যবাদী ও আর্ন্তজাতিক বেনিয়া বা বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদীরা কথা বলছেন। আবার দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দ ও জনগণও কথা বলছেন। তবে প্রত্যেকের কথা বলার প্রেক্ষাপট ভিন্ন। সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য এর মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনশক্তির উদ্ভব রোধ করা এবং তাদের আগ্রাসন, তাদের বাণিজ্য, অশ্লীলতা ভিত্তিক পণ্য, মাদক পণ্য ইত্যাদির ব্যাপক প্রসার ও জাতীয় সম্পদের ইজারা-দখলের পথ উন্মুক্ত করা। এতে সংশ্লিষ্ট দেশে অন্যান্য সমস্যা সৃষ্টি হলেও তাদের কোনো অসুবিধা নেই।

পক্ষান্তরে দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দ, সমাজবিদ ও জনগণ কথা বলছেন জাতীয় প্রেক্ষপটে দেশের অন্যান্য সমস্যার সাথে এ কঠিন সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করে দেশের সামগ্রিক স্থিতি ও অগ্রগতি নিশ্চিত করতে।

(১৭) জাতীয় কল্যাণে জঙ্গিবাদ দমনের কথা বলছেন যারা তাদের বুঝতে হবে যে, জঙ্গিবাদের অযুহাতে মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে বা মাদ্রাসা-পড়া, স্কুল-পড়া বা কোথাও না পড়া বোরকাওয়ালী, টুপিওয়ালা, দাড়িওয়ালা, মসজিদগামী ধার্মিক কর্মকর্তা, কর্মচারী, ছাত্র, ছাত্রী বা সাধারণ নাগরিককে অপদস্ত করলে, ঘৃণা প্রকাশ করলে, তাদের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করলে বা তাদেরকে হয়রানি করলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পুরোপুরি লাভবান হলেও দেশ ও জাতি পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতে জঙ্গিবাদ কমবে না, অন্যান্য অপরাধ ও দুর্নীতি বাড়বে এবং দেশ অভাবনীয় সংঘাত ও আল্লাহর গযবে নিপতিত হবে।

(১৮) এভাবে আমরা দেখছি যে, যারা জঙ্গিবাদের সাথে ইসলামী শিক্ষাকে সম্পৃক্ত করে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বা মাদ্রাসা শিক্ষার সংকোচন দাবি করছেন এবং যারা জঙ্গিবাদের সাথে ইসলামকে সম্পৃক্ত করে ইসলামের সংকোচন বা মুসলমানদের জোরপূর্বক খৃস্টান করার দাবি করছেন তাদের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। তাদের কেউ না জেনে এবং কেউ জেনেশুনে বিশেষ উদ্দেশ্যে এরূপ দাবি করছেন।

(১৯) আমরা আরো দেখছি যে, মাদ্রাসা শিক্ষা বা ধর্মভিত্তিক শিক্ষা সংকোচন করলে তা জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে কোনোরূপ অবদান রাখবে না, বরং তার প্রসারে অবদান রাখতে পারে। তবে এরূপ সংকোচন নিঃসন্দেহে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, পারিবারিক বা সামাজিক সহিংসতা, যৌতুক, এসিড, দুর্নীতি, ধর্ষণ, ব্যভিচার, এইডস, অপহরণ, খুন-খারাবি, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, মাদকাসক্তি ইত্যাদি অপরাধ ও অবক্ষয়ের প্রসারে অভাবনীয় অবদান রাখবে। আমরা জাতিগতভাবে এরূপ সংকোচনে লাভবান না হলেও আন্তর্জাতিক বেনিয়া চক্র তাদের মাদকদ্রব্য ও অশ্লীলতা-ভিত্তিক বহুমাত্রিক পণ্য বিপননের ক্ষেত্রে লাভবান হবে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমাদের অবক্ষয় ও দুর্নীতির সুযোগে তাদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে।

(২০) এখানে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় হলো, সমস্যার কারণ নির্ধারণে বিভ্রান্তি অনেক সময় সমস্যা উস্কে দিতে পারে। সন্ত্রাসের জন্য সন্ত্রাসীর জাতি, ধর্ম, গোত্র, দল বা শিক্ষাব্যবস্থাকে দায়ী করলে মূলত সন্ত্রাসীকে সাহায্য করা হয়। এতে একদিকে সন্ত্রাসীর স্বজাতি, স্বধর্ম, স্বদল বা স্বশিক্ষার মানুষেরা সন্ত্রাসের বিরোধিতার পরিবর্তে সন্ত্রাস বিরোধীদের সাথে বিরোধিতায় জড়িয়ে পড়েন, অপরদিকে পরোক্ষভাবে তাদের মধ্যে সন্ত্রাসীর প্রতি এক প্রকাররের 'সহমর্মিতা' জন্মলাভ করে। আমরা দেখেছি যে, কোনো কোনো পাশ্চাত্য পণ্ডিত সন্ত্রাসের জন্য ইসলামকে দায়ী বলে মন্তব্য করে ইসলামের সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতকেই উস্কে দিচ্ছেন। সন্ত্রাসের জন্য ইসলামী শিক্ষাকে দায়ী করলেও একইভাবে সন্ত্রাসকে উস্কে দেওয়া হবে এবং সন্ত্রাসীদের জন্য সহমর্মী সৃষ্টি

করা হবে। এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষিত মানুষেরা সন্ত্রাস বিরোধিতার বদলে অপ্রাসঙ্গিক বির্তকে জাড়িয়ে পড়বেন। সর্বোপরি এরূপ মতামতের ভিত্তিতে যদি সরকার বা প্রশাসন মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ, সংকোচন বা মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ঢালাও কোনো কর্মকাণ্ড হাতে নেন তবে তাতে নতুন এক প্রকারের সহিংসতায় আক্রান্ত হবে দেশ ও জাতি।

(২১) মূলত কোনো ধর্ম, মতবাদ বা আদর্শ সহিংসতা বা সন্ত্রাস শিক্ষা দেয় না। মানুষ মানবীয় লোভ, দুর্বলতা, অসহায়ত্ব, প্রতিশোধস্পৃহা ইত্যাদির কারণে সহিংসতা বা হিংস্রতায় লিপ্ত হয়। এরূপ সহিংসতায় লিপ্ত ব্যক্তি নিজের কর্মের পক্ষে সাফাই গাওয়ার জন্য, নিজের বিবেককে অপরাধবোধ থেকে মুক্ত করার জন্য, অন্যকে নিজের পক্ষে টানার জন্য এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে নিজের আদর্শকে ব্যবহার করে।

হাজার হাজার বছর ধরে বসবাসকারী আরবদেরকে জেরুজালেম ও অন্যান্য ফিলিস্তিনী এলাকা থেকে সন্ত্রাস ও গণহত্যার মাধ্যমে বিতাড়ন করে অন্যান্য দেশে হাজার বছর ধরে বসবাসকারী ইহূদীদেরকে সেখানে নিয়ে এসে ইস্রায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্য ইহূদী-খৃস্টানগণ পবিত্র বাইবেলের বাণীকে ব্যবহার করেছেন। অনুরূপভাবে আইরিশ ক্যাথলিক ব্রিটিশ প্রটেস্ট্যান্টের বিরুদ্ধে নিজের ধর্মমতকে ব্যবহার করেন, তিব্বতীয় বৌদ্ধ চীনের বিরুদ্ধে নিজের বৌদ্ধ ধর্মমতকে ব্যবহার করেন, নিম্নবর্ণের হিন্দু উচ্চবর্ণের হিন্দুর বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক বা ধর্মীয় মতামত ব্যবহার করেন, নিম্নরর্ণের হিন্দুদের বিরুদ্ধে জঙ্গি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাতে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা বর্ণপ্রথা বিষয়ে বেদ, গীতা ও হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের শিক্ষা ও বাণীগুলিকে ব্যবহার করেন, ফিলিস্তিনী যোদ্ধা ইহূদী দখলদারের বিরুদ্ধে নিজের ইসলাম বা খৃস্টান ধর্ম থেকে উদ্দীপনা বা প্রেরণা লাভের চেষ্টা করেন।

আমাদের সমাজে 'আওয়ামী লীগের' কর্মী যদি কোনো কারণে উত্তেজিত হয়ে সহিংসতায় লিপ্ত হনা তবে তিনি 'স্বাধীনতা', 'বঙ্গবন্ধু', 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' ইত্যাদি মহান বিষয়কে তার কর্মের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। অনুরূপভাবে 'বিএনপি'র কর্মী এ ক্ষেত্রে 'শহীদ জিয়া', জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা ইত্যাদি মহান বিষয়কে নিজের 'এক্সকিউজ' হিসেবে ব্যবহার করেন। উভয় ক্ষেত্রেই দলের অন্যান্য বিচক্ষণ কর্মী জানেন যে, নিজের সহিংসতা বৈধ করার জন্যই এগুলি বলা হচ্ছে।

সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষাকে দায়ী করে মাদ্রাসা শিক্ষা, মাদ্রাসা বা মাদ্রাসা শিক্ষিতদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিলে স্বভাবতই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে সহিংসতায় লিপ্ত হবেন এবং 'ইসলাম' ও 'ইসলামী শিক্ষা'-র বিপন্নতাকে অজুহাত হিসেবে পেশ করবেন। এতে একমাত্র সন্ত্রাসীরাই লাভবান হবে এবং জাতি ভয়ঙ্কর সংঘাতের মধ্যে নিপতিত হবে।

১. ৫. আলোচিত তৃতীয় কারণঃ ওহাবী মতবাদ

'ওহাবী মতবাদ'-কে জঙ্গিবাদের কারণ হিসেবে অনেক গবেষক উল্লেখ করছেন। সৌদি আরবের ধর্মীয় নেতা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব (১৭০৩-১৭৯২ খৃ) প্রচারিত মতবাদকে 'ওহাবী' মতবাদ বলা হয়। তিনি তৎকালীন আরবে প্রচলিত কবর পুজা, কবরে সাজদা করা, কবরে বা গাছে সুতা বেঁধে রাখা, মানত করা ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রকারের কুসংস্কার, শিরক, বিদ'আত ইত্যাদির প্রতিবাদ করেন। তাঁর বক্তব্য শুধু প্রতিবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। উপরন্তু তাঁর বিরোধীদের তিনি মুশরিক বলে অভিহিত করতেন। ১৭৪৫ খৃস্টাব্দে বর্তমান সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের অনতিদূরে অবস্থিত দিরইয়্যা নামক ছোট্ট গ্রাম-রাজ্যের শাসক আমীর মুহাম্মাদ ইবনু সাঊদ (মৃত্যু ১৭৬৫) তাঁর সাথে যোগ দেন। তাদের অনুসারীরা তাদের বিরোধীদেরকে মুশরিক বলে গণ্য করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালন শুরু করেন। ১৮০৪ সালের মধ্যে মক্কা-হিজায সহ আরব উপদ্বীপের অধিকাংশ 'সাউদী'-'ওহাবী'দের অধীনে চলে আসে।

তৎকালীন তুর্কী খিলাফত এ নতুন রাজত্বকে তার আধিপত্য ও নেতৃত্বের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে মনে করেন। কারণ একদিকে মক্কা-মদীনা সহ ইসলামের প্রাণকেন্দ্র তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়, অন্যদিকে মূল আরবে স্বাধীন রাজ্যের উত্থান মুসলিম বিশ্বে তুর্কীদের একচ্ছত্র নেতৃত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য তুর্কী খলীফা দরবারের আলিমগণের মাধ্যমে ওহাবীদেরকে ধর্মদ্রোহী, কাফির ও ইসলামের অন্যতম শত্রু হিসেবে ফাতওয়া প্রচার করেন। মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র এদের বিরুদ্ধে জোরালো প্রচারাভিযান চালানো হয়, যেন কেউ এ নব্য রাজত্বকে ইসলামী খিলাফতের স্থলাভিষিক্ত মনে না করে। পাশাপাশি তিনি তুর্কী নিয়ন্ত্রণাধীন মিসরের শাসক মুহাম্মাদ আলীকে ওহাবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার নির্দেশ দেন। মিশরীয় বাহিনীর অভিযানের মুখে ১৮১৮ সালে সউদী রাজত্বের পতন ঘটে। এরপর সাউদী রাজবংশের উত্তর পুরুষেরা বারংবার নিজেদের রাজত্ব উদ্ধারের চেষ্টা করেন। সর্বশেষ এ বংশের 'আব্দুল আযীয ইবনু আব্দুর রাহমান আল-সাউদ (১৮৭৯-১৯৫৩) ১৯০১ থেকে ১৯২৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে বর্তমান 'সৌদি আরব' প্রতিষ্ঠা করেন।[১১]

খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে মুসলিম বিশ্বের যেখানেই সংস্কারমূলক কোনো দাওয়াত বা আহ্বান প্রচারিত হয়েছে, তাকেই সৌদি 'ওহাবীগণ' মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহাবের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত বলে দাবি করেছেন। অপরদিকে তুর্কী প্রচারণায় 'ওহাবী' শব্দটি মুসলিম সমাজে অত্যন্ত ঘৃণ্য শব্দে পরিণত হয়। তাদেরকে অন্যান্য বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের চেয়েও অধিকতর ঘৃণা করা হয়। ফলে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার বৃটিশ বিরোধী আলিমদেরকে ওহাবী বলে প্রচার করতেন; যেন সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে তাদের গ্রহণযোগ্যতা না থাকে। এছাড়া মুসলিম সমাজের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় একে অপরকে নিন্দা করার জন্য 'ওহাবী' শব্দের ব্যাপক ব্যাবহার করেন।

মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবের সমসাময়িক ভারতীয় মুসলিম সংস্কারক শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (১৭০৩-১৭৬২ খৃ)।

তাঁর মত-প্রচারের প্রথম দিকে ১৭৩১ খৃস্টাব্দে তিনি মক্কায় গমন করেন এবং তিন বৎসর তথায় অবস্থান করেন। এরপর দেশে ফিরে তিনি ভারতে ইসলামী শিক্ষা প্রসারে বিশেষ অবদান রাখেন। তিনিও কবর পূজা, পীর পূজা, কবরে মানত করা, কবরবাসী বা জীবিত পীর বা ওলীগণের কাছে বিপদমুক্তির সাহায্য চাওয়া ও অন্যান্য শিরক, বিদ'আত, কুসংস্কার, মাযহাবী বাড়াবাড়ি ইত্যাদির বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেন। এজন্য কেউ কেউ তাঁকে 'ওহাবী' বলে চিহ্নিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন।

তবে ভারতের সর্বপ্রথম সংবিধিবদ্ধ ও সুপ্রসিদ্ধ 'ওহাবী' নেতা ছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহর পুত্র শাহ আব্দুল আযীযের (১৩৪৬-১৮২৩ খৃ) অন্যতম ছাত্র সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী (১৭৮৬-১৮৩১ খৃ)। তিনি সমগ্র ভারতে মাযার, দরগা, ব্যক্তি পূজা, মৃত মানুষদের নামে মানত, শিন্নি ইত্যাদি বিভিন্ন শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার করেন। এছাড়া তিনি বৃটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৮২১ খৃস্টাব্দে তিনি হজ্জে গমন করেন। প্রায় তিন বৎসর তথায় অবস্থানের পর তিনি ভারতে ফিরে আসেন। ১৮২৬ খৃস্টাব্দে তিনি বৃটিশ ভারত থেকে 'হিজরত' করে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গমন করে সেখানে 'ইসলামী রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন এবং নিজে সেই রাষ্ট্রের প্রধান হন। এরপর তাঁর নেতৃত্বে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিম সেখানে একত্রিত হয়ে বৃটিশ ও শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। কয়েকটি যুদ্ধের পরে ১৮৩১ খৃস্টাব্দে বালাকোটের যুদ্ধে তাঁর বাহিনী পরাজিত হয় এবং তিনি শাহাদত বরণ করেন। পরবর্তী প্রায় ৩০ বৎসর সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর অনুসারীগণ বৃটিশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার বিচ্ছিন্ন জিহাদ ও প্রতিরোধ চালিয়ে যান।

১৮০৩-৪ সালে "ওহাবী"-গণ মক্কা-মদীনা দখল করে এবং তথাকার প্রচীন মাজার-কেন্দ্রিক সৌধগুলি ভেঙ্গে ফেলে। এতে সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভীর অনুসারীগণ "ওহাবী"-দের মতই একইভাবে শিরক, কুফর, বিদ'আত, কুসংস্কার ইত্যাদির প্রতিবাদ করতেন। এভাবে তাদের মতামতের সাথে "ওহাবী"-দের মতামতের বাহ্যিক সাদৃশ্য ছিল। ১৮২৩ খৃস্টাব্দে সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় গমন করেন। ইংরেজ শাসকগণ সুকৌশলে প্রচার করে যে, 'স্বাধীনতার নামে যারা আপনাদের ধর্মের বাণী শোনাচ্ছে আসলে তারা ইসলামের শত্রু এবং নবী ও সাহাবাদের অপমানকারী দল, এদের নাম ওহাবী, এরাই আপনাদের প্রিয় রাসুলের (ﷺ) বংশধরদের কবরগুলি ধ্বংস করে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছে ... আর সৈয়দ আহমদ তাদেরই এজেন্ট নিযুক্ত হয়েছে এবং এরা সবাই ওহাবী তাই এরাও আপনাদের শ্রদ্ধেয় পীরবুজুর্গ ও পুর্বপুরুষদের কবর ভাঙ্গতে চায়... ।[১২]

এভাবে বৃটিশ সরকার বুঝান যে, প্রকৃত ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের কোনো ক্ষোভ নেই। প্রকৃত ইসলাম ও মুসলিমদেরকে তাঁরা খুবই ভালবাসেন। শুধু বিভ্রান্ত ওহাবী সম্প্রদায়ের মানুষদেরকেই তারা দমন করছেন ও শাস্তি দিচ্ছেন। কাজেই এতে সাধারণ ভাল মুসলিমরেদ বিরক্ত হওয়ার বা কষ্ট পাওয়ার কোনো কারণ নেই।

সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর শিষ্যদের থেকে ভারতে বিভিন্ন সংস্কারমুখী ধারার জন্ম নেয়। তাঁর শিষ্যদের মধ্য থেকে অনেকে নির্ধারিত মাযহাব অনুসরণ অস্বীকার করে নিজেদেরকে 'আহলে হাদীস' বলে দাবি করেন। তাঁর শিষ্য জৌনপূরের পীর মাওলানা কারামত আলী একটি সংস্কারমুখী ধারার জন্ম দেন। ফুরফুরার পীর মাওলানা আবূ বাক্র সিদ্দীকীও সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর মতানুসারী ও তাঁর প্র-শিষ্য ছিলেন। দেওবন্দী আলিমগণও তাঁরই শিষ্যদের থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন। এদেরর সকলকেই প্রতিপক্ষগণ ও ঔপনিবেশিক সরকার 'ওহাবী', "রঙিন ওহাবী" বা "বর্ণচোরা ওহাবী" বলে আখ্যায়িত করেছেন। সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর অন্যতম শিষ্য ও সমসাময়িক সংস্কারক মীর নেসার আলী ওরফে তিতুমির (১৭৮২-১৮৩১) এবং সমকালীন অন্য সংস্কারক হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০)। এদেরকেও ওহাবী নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এদের আন্দোলন ও প্রতিরোধকে ওহাবী আন্দোলন বলা হয়েছে।

"ওহাবী" শব্দের ব্যবহার বুঝতে একটি উদাহরণ পেশ করছি। মীর নিসার আলী ওরফে তীতু মীর ১৭৮২ খৃস্টাব্দে বাংলার ২৪ পরগনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮২৩ সালে হজ্জের সময় মক্কায় সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। তিনি তাঁর মুরীদ হন। দেশে ফিরে তিনি তাঁর এলাকার মানুষদের মধ্যে বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা প্রচার করেন। তিনি বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বললেও কখনোই হিন্দু ধর্ম, ধর্মাবলম্বী বা হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে কিছুই বলেন নি। কিন্তু তাঁর শিক্ষায় সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে ধর্মপালন বৃদ্ধি পাওয়াতে এলাকার হিন্দু জমিদারগণ ক্ষুদ্ধ হন। তাঁরা সাধারণ মুসলিম প্রজাদেরকে জানান যে, প্রকৃত ইসলামকে তাঁরা খুবই ভালবাসেন। তবে ওহাবী মতবাদকে তারা দমন করতে চান। যুগযুগ ধরে মুসলিমগণ হিন্দুদের মতই নাম রেখেছেন, দাড়ি কেটেছেন, গোঁফ রেখেছেন, মসজিদ বানানোর জন্য ব্যস্ত হন নি এবং গোহত্যা করেন নি। তীতুমীর ওহাবী মতানুসারে দাড়ি রাখতে, গোঁফ কাটতে, মুসলমানী নাম রাখতে, মুসলমানদের গ্রামে মসজিদ বানাতে ও কুরবানীর নামে গোহাত্যা করতে উৎসাহ দিচ্ছে। এতে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি নষ্ট হচ্ছে। এজন্য ওহাবী মতবাদ দমন করা অতীব জরুরী। এদের দমনের কারণে "ভাল" মুসলমানদের বিক্ষুদ্ধ হওয়ার বা কষ্ট পাওয়ার কোনোই কারণ নেই।

এজন্য তারাগুনিয়ার জমিদার রামনারায়ন বাবু, পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়, নগরপুরের জমিদার গৌড়প্রসাদ চৌধুরী ও অন্যান্য প্রখ্যাত জমিদার সমবেতভাবে ৫টি বিষয়ে নোটিশ জারি করেন: "(১) যাহারা তীতুমীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ওহাবী হইবে, দাড়ি রাখিবে, গোঁফ ছাটিবে, তাদের প্রত্যেককে ফি দাড়ির উপর আড়াই টাকা এবং ফি গোঁফের উপর পাঁচ সিকা খাজনা দিতে হইবে। (২) মসজিদ প্রস্তুত করিলে প্রত্যেক কাঁচা মসজিদের জন্য পাঁচশত টাকা ও প্রত্যেক পাকা মসজিদের জন্য এক সহস্র টাকা

জমিদার সরকারে নজর দিতে হইবে। (৩) পিতা-পিতামহ বা আত্মীয়- স্বজন সন্তানের যে নাম রাখিবে সে নাম পরিবর্তন করিয়া ওহাবী মতে আরবী নাম রাখিলে প্রত্যেক নামের জন্য খারিজানা ফি পঞ্চাশ টাকা জমিদার সরকারে জমা দিতে হইবে। (৪) গোহত্যা করিলে হত্যাকারীর দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া নেওয়া হইবে, যেন সে ব্যক্তি আর গোহত্যা করিতো না পারে। (৫) যে ব্যক্তি ওহাবী তীতুমীরকে নিজ বাড়ীতে স্থান দিবে তাহাকে তাহার ভিটা হইতে উচ্ছেদ করা হইবে।"[১৩]

বস্তুত, তুর্কী খিলাফাত ও বৃটিশ সরকারের ব্যাপক প্রচারের কারণে "প্রকৃত ইসলাম" ও "ওহাবী ইসলামের" এ বিভাজন পাশ্চাত্য গবেষকদের কাছে সার্বজনীনতার রূপ পেয়েছে। বিশ্বের যে কোনো স্থানে সংস্কার আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, উপনিবেশ বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বা পাশ্চাত্য বিরোধী আন্দোলনে ধার্মিক মুসলিম, আলিম, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব বা পীর-মাশাইখের সম্পৃক্ততা থাকলেই তাকে "ওহাবী" বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়।

ওহাবী ইসলাম ও প্রকৃত ইসলামের এ বিভাজনের ক্ষেত্রে অনেক পাশ্চাত্য গবেষক প্রকৃত ইসলামকে "সূফী ইসলাম" বলে চিহ্নিত করেন। তাঁদের মতে, সূফী ইসলাম অসাম্প্রদায়িক, অরাজনৈতিক ও উদার। প্রমাণ হিসেবে তারা বলেন যে, এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকার মুসলিম ও অমুসলিম সমাজের অগণিত সূফী দরবারে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল ধর্মের ও বর্ণের মানুষ একত্রিত হচ্ছেন, যিক্র, ওযীফা, সামা-কাওয়ালী ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন এবং তবারুক ও দুআ গ্রহণ করছেন। এ সকল দরবারে আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্যিকতার শিক্ষা দেওয়া হয়, রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি আলোচনা করা হয় না।

আমাদের দেশ ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা সূফী ইসলামের দুটি পর্যায় দেখতে পাই। আমরা দেখি যে, অনেক মুসলিম তাসাউফ ও সূফীবাদের নামে পীর-মাশাইখকে আল্লাহর অবতার বা বিশেষ "ঐশ্বরিক" সম্পর্ক বা ক্ষমতার অধিকারী বলে গণ্য করেন, তাদেরকে সাজদা করেন, তাদের কবর-মাযার বা সমাধি সাজদা করেন, সালাত, সিয়াম ইত্যাদি শরীয়তের আহকাম পালনকে গুরুত্বহীন মনে করেন এবং গান-বাজনা ও নৃত্যগীতিকে সূফী ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে গণ্য করেন। এরা নিজেদেরকে প্রকৃত সূফী ও প্রকৃত সুন্নী বলে দাবি করেন। যারা পীর সাজদা, করব সাজদা, গানবাজনা, ধুমপান ইত্যাদির প্রতি আপত্তি প্রকাশ করেন বা শরীয়ত পালনের বাধ্যবাধকতার কথা বলেন তাদেরকে এ পর্যায়ের সূফীগণ "ওহাবী" এবং "ওলীগণের দুশমন" বলে কঠোরভাবে নিন্দা করেন। অনেকে তামাক, গাজা ইত্যাদি সেবন বা ধুমপানকে সুন্নী ইসলাম ও সূফী ইসলামের মৌলিক পরিচয় বলে গণ্য করেন এবং ধুমপান বিরোধীদেরকে ওহাবী ও ওলীগণের দুশমন বলে নিন্দা করেন।

অন্য অনেক মুসলিম পীর-সাজদা, করব-সাজদা, গান-বাজনা ইত্যাদি কর্মকে কঠিনভাবে নিন্দা করেন, শরীয়ত প্রতিপালনকে সূফী ইসলামের মূল বিষয় বলে গণ্য করেন এবং শরীয়ত প্রতিপালনের পাশাপাশি পীর-মাশাইখের নিকট তরীকত শিক্ষা করেন ও পালন করেন। প্রথম পর্যায়ের সুফী ও মারফতীগণের মতানুসারে এরা ওহাবী ও সূফী ইসলামের দুশমন। তবে এরা নিজেদেরকে প্রকৃত সূফী ও সুন্নী বলে দাবি করেন এবং প্রথম পর্যায়ের মানুষদেরকে বিভ্রান্ত বলে গণ্য করেন।

এ পর্যায়ের তাসাউফ-পন্থীদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ওরস, ঈসালে সাওয়াব, মীলাদুন্নবী, সীরাতুন্নবী, যিকরের পদ্ধতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে এ পর্যায়ের সূফীগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ সকল মতভেদের ভিত্তিতে এ পর্যায়ের সূফীগণের একদল আরেকদলকে ওহাবী, নবীর দুশমন বা ওলীগণের দুশমন বলে নিন্দা করেন এবং নিজেদেরকে প্রকৃত সুন্নী ও প্রকৃত সূফী বলে দাবি করেন, যদিও সকলেই পীর-মুরিদী ও তাসাউফে বিশ্বাস করেন ও বিভিন্ন তরীকা অনুসরণ করেন।

পাশ্চাত্যের খৃস্টানগণ প্রকৃতিগতভাবেই প্রথম পর্যায়ের সূফী ইসলাম ও এর অনুসারীদের ভালবাসেন। কারণ তাদের "মানসিকতার" সাথে এদের "মানসিকতার" খুবই মিল। ইউরোপ-আমেরিকা ও অন্যান্য বিভিন্ন দেশে এরূপ সূফীদের মাজলিস-দরবার ও খানকা-মাজারে তারা আগমন করেন, গান-বাজনা ও আধ্যাত্যিক চর্চায় অংশ নেন। এ সকল সূফীও এদেরকে অত্যন্ত ভালবেসে গ্রহণ করেন। স্বভাবতই পাশ্চাত্যের মানুষেরা বিশ্বের সকল মুসলিম দেশে এরূপ সূফী ইসলামের প্রসার কামনা করেন। এরূপ সূফী ইসলামের প্রসারই সকল ধর্মের ও ধর্মহীন মানুষদের মধ্যে অনাবিল শান্তি ও সহাবস্থান নিশ্চিত করতে পারে বলে তারা বিশ্বাস করেন।

"সভ্যতার সংঘাতের" নামে ইসলামী দেশগুলিতে আধিপত্য বিস্তারে আগ্রহী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি প্রথমে ঢালাওভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। কিন্তু তারা দেখেন যে, এতে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বাড়ছে। তখন তারা মুসলমানদেরকে বিভিন্নভাবে ভাগ করে কাউকে পক্ষে ও কাউকে বিপক্ষে নিতে চান। এজন্য প্রথমে তারা লিবারেল (liberal) বা উদার ও (fundamentalist) অর্থাৎ মৌলবাদী বা কট্টরপন্থী বলে ভাগাভাগি করেন। এরূপ ভাগাভাগি মুসলিম দেশগুলিতে তেমন কোনো বাজার লাভ করে না। এজন্য বিগত কয়েক বছর যাবত তারা নতুন একটি ভাগাভাগি বাজারজাত করতে চেষ্টা করছেন, তা হলো সূফী ইসলাম ও ওহাবী ইসলাম।

মুসলিম দেশগুলিতে সূফীগণের প্রভাব ও "ওহাবী" শব্দটির প্রতি মুসলিমদের ঘৃণার বিষয়টি তারা জানেন। বৃটিশ সরকার ও হিন্দু জমিদারগণ যেভাবে সাইয়েদ আহমদ, তিতুমীর, শরীয়তুল্লাহ ও অন্যান্য সকল ধর্মীয় সংস্কার ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে "ওহাবী" বলে চিত্রিত করে সাধারণ মুসলিমদের কাছে ঘৃণিত করার চেষ্টায় অনেকটা সফলতা লাভ করেছিলেন, তেমনি তারা তাদের স্বার্থের সাথে সাংঘষিক সকল ইসলামী কর্মকাণ্ড ও ব্যক্তিত্বকে "ওহাবী" রূপে চিত্রিত করতে চেষ্টা করছেন। অন্তত সুন্নী-ওহাবী বা সূফী-ওহাবী বিতর্ক ও সজ্ঞাত উস্কে দিতে পারলে ইসলামী দাওয়াত, শিক্ষা বিস্তার, অশ্লীলতা-মাদকতার প্রতিবাদ ও রাষ্ট্র

ব্যবস্থায় আলিম বা ইসলামপন্থীদের উত্থান নিশ্চিতরূপেই ব্যাহত ও বাধাগ্রস্ত হবে।

তারা মূলত সূফী ইসলাম বলতে প্রথম পর্যায়ের সূফীদের বুঝছেন। কারণ, দ্বিতীয় পর্যায়ের সূফীদের মধ্যে শাহ ওয়ালিউল্লাহ, সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী, তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ প্রমুখের মত ব্যক্তিত্বর আবির্ভাব ঘটতে পারে, যাদের ক্ষমতায়ন তাদের স্বার্থ রক্ষা করে না। তারা বিশ্বাস করেন যে, প্রথম পর্যায়ের সূফীদের উত্থানই মুসলিম মানসিকতা থেকে জঙ্গিবাদের মূল উৎপাটন করতে সক্ষম এবং এ পর্যায়ের সূফী ইসলামই বিশ্বের মানুষদেরকে জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ ও ধর্মীয় সংঘাত থেকে রক্ষা করে সকল ধর্মের শান্তি পূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে পারে। শুধু তাই নয়, এদের প্রতিষ্ঠা বিশ্বের প্রধান দুটি ধর্মঃ খৃস্টধর্ম ও ইসলামকে একেবারেই কাছাকাছি করে দিতে পারে।

বস্তুত প্রথম পর্যায়ের সূফীগণ এবং পাশ্চাত্য নেতৃবৃন্দ দ্বিতীয় পর্যায়ের সূফীগণকে "প্রকৃত ওহাবী" বা "বর্ণচোরা ওহাবী" বলে বিশ্বাস করেন। এদের হাতে তাদের স্বার্থ নিরাপদ নয় বলেও তারা জানেন। তবে মুসলিম দেশগুলিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের সূফীগণের প্রভাব সম্পর্কেও তারা সচেতন। এজন্য তার "সূফী ইসলামের" নামে প্রথম পর্যায়ের সূফীদের নেতৃত্বাধীনে ও তাদের প্রভাব বলয়ের মধ্যে থেকে উভয় পর্যায়ের সূফীগণকে একত্রিত করে তাদেরকে "ওহাবী"-দের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে উদ্বুদ্ধ করছেন।

তারা বুঝাচ্ছেন যে, যারা ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র, বিচার, অর্থব্যবস্থা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার দাবি করছেন তারা মূলত ওলীগণের মাজারভাঙ্গা সৌদী ওহাবীগণের দালাল ও তাদের মতের অনুসারী। এরা ক্ষমতা লাভ করলে এরাও পীর-মাশাইখ ও কবর-মাজার ধ্বংস করবে। কাজেই এদেরকে প্রতিহত করতে ঐক্যবদ্ধ হোন। একথা নিশ্চিত যে, সাধারণ মুসলিম, আলিম ও পীর-মাশাইখ তাদের এরূপ প্রচারণায় প্রভাবিত হবেন। এছাড়া এ অযুহাতে ওহাবী-সুন্নী বির্তর্ক ও হানাহানির প্রসার ঘটিয়ে মুসলিমদেরকে সাম্রাজ্যবাদ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বা ইসলামী মূল্যবোধ প্রচারের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত রাখা সম্ভব হবে বলে তারা মনে করছেন।

বস্তুত "ইসলাম" নামের যেমন ব্যাপক অপব্যবহার করা হয়েছে এবং ইসলামের নামে ইসলাম বিরোধী কর্ম করা হয়েছে ও হচ্ছে, তেমনি "সূফী" শব্দেরও ব্যাপক অপব্যবহার করা হয়েছে। তাসাউফ, সূফী, পীর, দরবেশ ও ওলীগণের নামে অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডও ঘটেছে অনেক। তবে সর্বজন স্বীকৃত সূফী-দরবেশগণের জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে, তাঁরা সকলেই সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতি সচেতন ছিলেন এবং সমাজ পরিবর্তনে তাঁদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

প্রায় সকল সূফী "তরীকা"-র মূল সূত্র হিসেবে আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) ও আলী (রা)-কে উল্লেখ করা হয়েছে। যাকাত অমান্যকারী, ধর্মত্যাগী, ধর্মীয় অনাচারে লিপ্তদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁরা ছিলেন মুসলিম উম্মাহর পথিকৃতি। হাসান বসরী, ইবরাহীম আদহাম, জুনাইদ বাগদাদী, আব্দুল কাদির জীলানী, আবূ হামিদ গাযালী, মুজাদ্দিদ-ই আলফিসানী, শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী, সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী, এমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী, কারামত আলী জৌনপুরী, আবূ বকর সিদ্দীকী ফুরফুরাবী (রাহিমাহুমুল্লাহ) ও অন্যান্য সকল সুপ্রসিদ্ধ সূফী-সাধক আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতি নিয়ে কথা বলেছেন, শাসকদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন, কারাবরণ করেছেন বা শাহাদাত লাভ করেছেন।

আধুনিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে এদের কর্মপদ্ধতির পার্থক্য হলো ক্ষমতায় না যেয়ে ক্ষমতাসীনদের সংশোধনের চেষ্টা করা। এরা নিজেরা রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করেন নি বরং ক্ষমতাসীনদেরকে নসীহত করেছেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন, ন্যায়ের পক্ষে উৎসাহ দিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন, জনগণকে সচেতন করেছেন, সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিক শাসন ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধে শরীক হয়েছেন এবং এ সকল কর্মকাণ্ডে যে সকল ব্যক্তি বা দলকে অপেক্ষাকৃত ভাল বলে মনে করেছেন তাদেরকে সমর্থন করেছেন বা উৎসাহ দিয়েছেন।

তথাকথিত "জঙ্গি" কর্মকাণ্ড বা উগ্রতার সাথে তাদের কর্মপদ্ধতির পার্থক্য হলো অন্যায়ের প্রতিবাদ করা কিন্তু শাস্তি বা বলপ্রয়োগের চেষ্টা না করা। তারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন, নসীহত করেছেন, ক্ষমতাসীন ও অন্যান্য সকলকে অন্যান্য দমন করতে, প্রতিবাদ করতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন, কিন্তু নিজে অন্যায় দমনের নামে শক্তি প্রয়োগ করেন নি, আইন অমান্য করেন নি, আইন নিজের হাতে তুলে নেন নি এবং আইন অমান্য করার ঘোর বিরোধিতা করেছেন।

এভাবে আমরা দেখছি যে, প্রকৃত সূফীগণ কখনোই সমাজ-বিমুখ বা রাজনীতি-বিমুখ ছিলেন না। "সূফী ইসলাম"-কে সমাজ, রাষ্ট্র ও জগৎ-বিমুখ বলে চিহ্নিত করা ও সকল সংস্কার আন্দোলনকে "ওহাবী" বলে চিত্রিত করার কোনো ভিত্তি নেই।

তথাকথিত 'ইসলামী সন্ত্রাস' বা জঙ্গিবাদের নেতৃত্বে উসামা বিন লাদিনের মত সৌদি বংশোদ্ভুত ব্যক্তিত্ব রয়েছেন বলে শোনা যায়। সৌদি আরবের বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থা এদের অর্থায়ন করেন বলে দাবি করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিশেষত উপমহাদেশে আহলে হাদীস ও দেওবন্দী-পদ্ধতির কওমী মাদ্রাসায় শিক্ষিত দু-চার ব্যক্তির এর সাথে সংশ্লিষ্টতার কথা শোনা যায়। এছাড়া এদের মধ্যে কবর-মাযার ইত্যাদির বিরোধিতা দেখা যায়। সর্বোপরি এরা নিজেদের মতামত প্রতিষ্ঠার জন্য মৌখিক প্রচার ছাড়াও অস্ত্র হাতে তুলে নিচ্ছেন। এজন্য অনেক গবেষক মনে করেন যে, ওহাবী মতবাদের প্রসারই বর্তমান জঙ্গিবাদের উত্থানের কারণ।

তবে লক্ষণীয় যে, উসামা বিন লাদিন-এর আন্দোলনের গোড়া পত্তন হয় সৌদি-ওহাবী রাষ্ট্রের বিরোধিতার মাধ্যমে। তার অনুসারীরা তথাকার রাজতন্ত্র, মার্কিন সৈন্য, অনাচার ইত্যাদির বিরোধিতা করেন এবং সৌদি রাষ্ট্র ও নাগরিকদের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন। এছাড়া মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবের বংশধরসহ সকল সৌদি আলিম বিন লাদিনের আন্দোলন ও কার্যক্রমের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সোচ্চার।

সর্বোপরি, বিভিন্ন দেশের সংস্কার বা প্রতিরোধ আন্দোলনকে 'ওহাবী' বলে আখ্যায়িত করার কোনো ভিত্তি নেই। বস্তুত মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব ও তাঁর আদর্শ প্রাপ্যের চেয়ে বেশি গুরুত্ব ও মর্যাদা লাভ করেছে তুর্কি খিলাফতের প্রচার ও বৃটিশ সরকারের সুযোগসন্ধানের কারণে। ওহাবী মতবাদ ও আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে একান্তই একটি আঞ্চলিক বিষয় ছিল। অন্যান্য মুসলিম দেশের সংস্কার-প্রতিরোধ ও ধর্মকেন্দ্রিক সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনের মতই ভালমন্দ মেশানো একটি বিষয়। অন্যান্য দেশে মুসলিমগণ তাদের পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুসারে অনুরূপ আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। যেহেতু ওহাবীগণ ও অন্যান্য দেশের মুসলিমগণ সকলেই একই সূত্র, অর্থাৎ কুরআন, হাদীস, ইসলামী ফিক্হ ও ইসলামের ইতিহাস থেকে নিজেদের মতামত সংগ্রহ করেছেন, সেহেতু তাদের মতামত ও কর্মের মধ্যে মিল থাকাই স্বাভাবিক। এ জন্য সকল কৃতিত্ব মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবকে দেওয়ার কোনো কারণ নেই।

আফগানিস্থান ও ইরাকে বিন লাদিনের মতবাদ প্রসার লাভ করেছে। আর এ দুটি দেশই ঘোর ওহাবী বিরোধী। আফগানিস্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী হানাফী মাযহাবের কঠোর অনুসারী, পীর মাশাইখদের ভক্ত এবং ওহাবীদের বিরোধী। ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের দীর্ঘ শাসনামলে ওহাবী বা অন্য যে কোনো সংস্কারমুখী আলিম ও মতবাদকে কঠোরভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। শুধুমাত্র সূফীদের বিরুদ্ধে কোনো কঠোরতা অবলম্বন করা হয় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ দুই দেশে জঙ্গিবাদের প্রসার থেকে বুঝা যায় যে, জঙ্গিবাদের কারণ অন্য কোথাও নিহিত রয়েছে।

আমরা আগেই দেখেছি যে, সন্ত্রাসীদের জাতি, ধর্ম গোত্র ইত্যাদিকে ঢালাওভাবে 'সন্ত্রাসের' কারণ বা চালিকা শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা সঠিক নয়। এতে সন্ত্রাস দমনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। কারণ, কোনো, জাতি, ধর্ম বা গোত্রের সকল মানুষকে তো আর ঢালাওভাবে বিচার করা যায় না। জঙ্গিবাদের দায়িত্ব 'ওহাবী মতবাদের' উপর চাপানোর বড় বিপত্তি হলো, এতে সমস্যা সমাধানের পথ হারিয়ে যাবে। কেননা, সৌদি ওহাবীদের সাথে জঙ্গিবাদের সম্পর্ক স্থাপন করা কঠিন, কারণ জঙ্গিবাদ তাদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত। আর অন্য কোনো দেশের কেউ নিজেকে ওহাবী বলে স্বীকার করেন না, কিন্তু প্রায় সকল ধর্মীয় দলই বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা 'ওহাবী' বলে আখ্যায়িত। প্রত্যেকেই দাবি করেন যে, তাঁরা সরাসরি কুরআন, হাদীস, ফিকহ ও পূর্ববর্তী ইমামগণের মতের ভিত্তিতে তাদের মত ও দল গঠন করেছেন; মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবের নিজস্ব কোনো মত তারা মানেন না। এমনকি সৌদি আরবের আলিমগণ কখনোই নিজেদেরকে ওহাবী বলে স্বীকার করেন না। তাঁরা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবকে একজন সংস্কারক হিসেবে মনে করেন এবং তাঁর সকল মতামতই কুরআন, সুন্নাহ ও পূর্ববর্তী ইমামগণের থেকে গৃহীত বলে দাবি ও প্রমাণ করেন।

১. ৬. আলোচিত চতুর্থ কারণঃ পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র

বিশ্বের সর্বত্রই সাধারণ আলিম-উলামা, পীর-মাশাইখ, ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও ইসলামী দলসমূহ জঙ্গিবাদের বিরোধিতা করছেন এবং নিন্দা করছেন। সাধারণভাবে তাঁরা উপরের তিনটি কারণকে জঙ্গিবাদের উত্থানের কারণ বলে স্বীকার করেন না। রবং তাঁরা দাবি করেন যে, ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্রের কারণেই জঙ্গিবাদের উত্থান। ইসলামকে কলঙ্কিত করতে, ইসলামী দেশগুলির আর্থ-সামাজিক উন্নতি বন্ধ করতে এবং এ সকল দেশে সামরিক আধিপত্য বিস্তার করতেই তারা গোপন অর্থায়নে কিছু মুসলিম যুবককে বিভ্রান্ত করে এরূপ জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করেছেন।

তাঁরা তাদের এ দাবির পক্ষে প্রমাণ নয় বরং যুক্তি পেশ করেন। তাঁরা দাবি করেন যে, বোমাবাজি, সন্ত্রাস ইত্যাদি মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে কখনো দেখা যায় নি। 'সভ্যতার সংঘাত' থিওরি আবিষ্কারের পূর্বে বিগত দেড় হাজার বৎসর ধরে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে 'জিহাদ' নামে এরূপ সন্ত্রাস কখনোই দেখা যায় নি। রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিচালিত যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কোথাও কোনো মুসলিম ব্যক্তিগতভাবে বা দলগত ভাবে কাউকে গুপ্ত হত্যা করেছে, কারো বাড়িতে অগ্নি সংযোগ করেছে.... ইত্যাদির কোনো নযির আমরা দেখতে পাই না। 'সভ্যতার সংঘাত' থিওরি আবিষ্কারের পরে পাশ্চাত্য বিশ্ব নিজ প্রয়োজনেই এ অবস্থা তৈরি করে নিয়েছে।

ক্রুসেড যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন ইউরোপীয় খৃস্টানগণ। ১ম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পতন ও মুসলিম বিশ্বে উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে ক্রুসেডের সমাপ্তি হয়েছে বলে ধারণা করেছিলেন তারা। বিংশ শতাব্দীর ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষত সেভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পরে তারা হিসাব নিকাশ পাল্টে ফেলেন। তারা 'সভ্যতার সংঘাতের' থিওরী উপস্থাপন করেন। তারা ভালভাবেই উপলব্ধি করেন যে, মুসলিম বিশ্বকে তার নিজের গতিতে অগ্রসর হতে দিলে ২১শ শতকের প্রথমার্ধেই মুসলমানগণ 'বিশ্ব শক্তিতে' পরিণত হবে। অর্থনৈতিক স্থিতি, প্রযুক্তিগত শক্তি ও সমর শক্তিতে তারা শক্তিশালী হয়ে যাবে এবং তাদের 'নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরানোর' কোনো সুযোগ থাকবে না। মুসলিম উম্মাহকে ঠেকাতে হলে তাদেরকে আঘাত করতে হবে।

কিন্তু আঘাত তো কোনো 'কারণ' ছাড়া করা যায় না। স্বভাবতই কোনো মুসলিম দেশই পাশ্চাত্যের সাথে কোনো সংঘাতে যেতে রাজি নয়। কিন্তু সংঘাত না হলেও তো কাজ উদ্ধার করা যাচ্ছে না। বিশেষত দুর্বলকে সংঘাতের মধ্যে নামাতে পারলে বিজয় নিশ্চিত থাকে। এজন্যই তাঁরা এ জঙ্গিবাদের জন্ম দিয়েছেন।

এছাড়া পাশ্চাত্য বিশ্ব আরো একটি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। তা হলো তাদের দেশগুলির নীরব "ইসলামায়ন"। ইসলাম মানুষের জীবন-ধর্ম। ইসলামের সহজ-সরল বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয় সহজেই মানুষকে আকৃষ্ট করে। মানুষের প্রকৃতির সাথে এ ধর্ম মিশে একাকার হয়ে যায়। মানব প্রকৃতি অতি সহজেই একে গ্রহণ করে। আধুনিক সভ্যতার নৈতিক অবক্ষয়, অশ্লীলতা, বিলাসিতা ও অমানবিকতার মধ্যে নিপতিত পাশ্চাত্য দেশগুলির অনেক মানুষই ইসলাম গ্রহণ করছেন। ইসলাম সম্পর্কে সামান্য কিছু

তথ্য জানলেই অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেন।

অশ্লীলতা, বিলাসিতা ও মাদকতার প্রসারে ইউরোপ-আমেরিকার পরিবারিক কাঠামো ভেঙ্গে গিয়েছে এবং তথাকার প্রকৃত "সাদা" অধিবাসীদের জনসংখ্যা দ্রুত কমছে। এ সকল দেশ তাদের শিল্প, কারখানা ও উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে বাইরের অভিবাসী গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। এ ভাবে প্রতিনিয়ত অনেক মুসলিম এ সকল দেশে প্রবেশ ও বসবাস করছেন। এদের সংস্পর্শে এসে এ সকল দেশের মূল অধিবাসীদের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করছেন। এ ভাবে এসকল দেশে নীরব ইসলামায়ন চলছে। এ ইসলামায়ন ঠেকাতে, মুসলিম অভিবাসীদেরকে নাগরিকত্ব না দিতে, বহিস্কার করতে এবং সর্বোপরি মূল অধিবাসীদেরকে ইসলাম থেকে দূরে রাখতে ইসলাম বিরোধী অপপ্রচার ও ইসলামের "দানবায়ন" অতীব জরুরী। আর এজন্য জঙ্গিবাদ ইসূ অতীব কার্যকর বলে মনে করেছেন তারা।

বিশেষত খৃস্টীয় দ্বিতীয় মিলেনিয়ামের শুরু থেকে ক্রুসেড যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে ইসলাম ধর্ম ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দানব রূপে চিত্রিত করার জন্য ইউরোপের চার্চ ও রাষ্ট্রপ্রশাসন ইসলামের বিরুদ্ধে কয়েকশত বৎসর যাবত যে সকল জঘন্য মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়েছে সেগুলির অন্যতম ছিল ইসলামের জিহাদ বিষয়ক নির্দেশনার অপব্যখ্যা। আমরা এ পুস্তকের শেষ দিকে ইসলামের জিহাদ ও বাইবেলীয় জিহাদ বিষয়ক আলোচনায় এ বিষয়ে কিছু দেখতে পাব। এজন্য পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ ইসলামী দেশগুলির নিয়ন্ত্রন ও তাদের দেশগুলির নীরব ইসলামায়ন রোধে জঙ্গিবাদ ইসূকেই সর্বোত্তম বিবেচনা করেন এবং তাদের স্বার্থেই "জঙ্গিবাদ" সৃষ্টি করেন।

এ সকল মুসলিম পণ্ডিত আফগান জিহাদকে অন্যতম দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেন। সোভিয়েত আগ্রাসনের প্রতিবাদে আফগানিস্থানের মুসলিম জনগোষ্ঠী প্রতিরোধ শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগীরা এ সুযোগে এ সকল প্রতিরোধ যোদ্ধাদেরকে অস্ত্র, ট্রেনিং, প্রযুক্তি ও সকল প্রকার সাহায্য দিয়ে এগিয়ে নেয়। সারা বিশ্বে এদের পক্ষে প্রচার চালায়। এরপর তারা তাদেরকে উস্কানির মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য করে। তারা বেপরোয়া হয়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলেন। পরিত্যক্ত ও উত্তেজিত এ সকল মানুষ আবেগ তাড়িত হয়েও অনেক কাজ করতে থাকেন। এছাড়া এ সকল 'মুজাহিদ'দের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদীদের নিজস্ব অনুচর রয়েছে। যারা এদেরকে 'সংঘাতের পথে' যেতে প্ররোচিত করছে। এরা জিহাদ ও কিতাল বিষয়ক আয়াত ও হাদীসগুলির অপব্যাখ্যা করে মুসলিম উম্মাহকে 'প্রিম্যাচিউরড' সংঘাতের পথে যেতে উস্কানি দিচ্ছে। এভাবে সারা মুসলিম বিশ্বে 'জিহাদের' বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে।

এ সকল গবেষক আরো একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারা বলেন যে, খিলাফাতে রাশেদার পর থেকে ইসলামী দেশগুলিতে ক্রমান্বয়ে ধর্মপালনে শিথিলতা, অনাচার, অশ্লীলতা, ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও আকীদার প্রসার ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর ও গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে। রাষ্ট্র, প্রশাসন ও আমীর-ওমরাগণ এ অবক্ষয় রোধের চেষ্টা করেন নি, উপরন্তু অনেক সময় তারা তার প্রসারে সহযোগিতা করেছেন। আলিম-উলামা, পীর-মাশাইখ ও ধার্মিক মানুষেরা সাধ্যমত 'দাওয়াত' বা প্রচার ও উপদেশের মাধ্যমে এগুলির সংশোধনের চেষ্টা করেন। তবে তারা ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধে নামে বলপ্রয়োগ বা শাস্তি প্রয়োগ করেন নি। সর্বোপরি তারা অনাচার ও অবক্ষয়ের সর্বগ্রাসী প্রসারের জন্য রাষ্ট বা সরকারকে দায়ী করে রাষ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন নি বা "ধার্মিকদের রাষ্ট্র" প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন নি। বরং তারা এ সকল রাষ্ট্র ও সরকার আনুগত্য বজায় রেখেছেন এবং বহির্শত্রুর বিরুদ্ধে এদেরে জিহাদে শরিক হয়েছেন। মূলত এ কারণেই দ্বিতীয় মিলেনিয়ামের ক্রুসেড যুদ্ধে ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের আগ্রাসন রোধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন মুসলমানরা।

কিন্তু বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এখন অনেক মুসলিম দীন প্রতিষ্ঠার নামে মুসলিম দেশের স্থিতি নষ্ট করছেন, যাতে বহির্শত্রুর আগ্রাসন প্রতিরোধের ক্ষমতা হারাচ্ছে মুসলিম সমাজ। উদাহরণ হিসেবে তারা বলেন যে, পাকিস্তান ও আফগানিস্তনে মার্কিন অর্থায়ন ও প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত কতিপয় মুজাহিদ এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত "মাদ্রাসা" থেকে আগত কোনো কোনো ছাত্র ইসলামী আইন বা শরীয়া আইন বাস্তবায়ন, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়ের নিষেধ ইত্যাদি শ্লোগানের ভিত্তিতে এমন কর্মকাণ্ড পরিচালন করছেন যা পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ঐক্য, অর্থনৈতিক ও সামারিক প্রবৃদ্ধি কঠিনভাবে ব্যাহত করেছে। এখন যদি আমরা আরেকটি ক্রুসেড কল্পনা করি তাহলে অনুভব করব যে, এরূপ ক্রুসেড প্রতিহত করার ক্ষমতা হারাচ্ছে পাকিস্তান এবং ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়ার মত মানুষও হারাচ্ছে।

'ইসলামপন্থী'দের এসকল দাবি-দাওয়া ও যুক্তি যতই জোরালো হোক এর পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। এছাড়া এ দাবিও সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে কোনোরূপ সহায়তা করে না। শত্রু তো শত্রুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবেই। যদি কেউ সত্যিই ইসলামের শত্রু হন তবে তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। এজন্য তাঁদের দোষ দেওয়া বা তার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা অর্থহীন কর্ম। আমাদের দেখতে হবে কি কারণে মুসলিম যুবকগণ তাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছেন। কারণগুলি চিহ্নিত করে সেগুলির প্রতিকার না করতে পারলে আমাদের দোষারোপ ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাঁদের ষড়যন্ত্র সফলতা লাভ করবে।

১. ৭. ইস্রায়েল, সাম্রাজ্যবাদ, তেল ও ধর্ম

উপরের মতটির সম্পূরক বা কাছাকাছি একটি মত হলো, সমকালীন বিশ্বের সকল অশান্তি, যুদ্ধ, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের অন্যতম কারণ ফিলিস্তিনে ইস্রায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, মধ্যপ্রাচ্যের তেল, মুসলিম দেশগুলির সম্পদ ও ভৌগলিক অবস্থান ও ইউরোপ-আমেরিকার উগ্র ধর্মভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদী নব্য রক্ষণশীল (neoconservatives) বা নিওকনদের আবির্ভাব ও আধিপত্য।

পবিত্র বাইবেল থেকে জানা যায় যে, ফিলিস্তিনে ইহূদীদের অবস্থান বিশ্বে অশান্তির অন্যতম কারণ। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে আল্লাহ ইস্রায়েল-সন্তানগণকে আল্লাহর বিধান পালন ও মানবজাতির কল্যাণের বিনিময়ে ফিলিস্তিনে তাদের বাসস্থান

প্রদানের ওয়াদা করেন। কিন্তু পুরোহিতদের বিকৃতির কারণে তারা এ ওয়াদাকে তাদের জাতিগত সম্পদ বলে গণ্য করে এবং আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়।

ইস্রায়েল-সন্তানগণ খৃস্টপূর্ব ১২৮৫ সালের দিকে মূসা (আ)-এর নেতৃত্বে মিসর থেকে ফিলিস্তিনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। প্রায় আড়াইশত বৎসর বিভিন্ন স্থানে বসবাসের পর খৃস্টপূর্ব ১০০০ সালের দিকে তালুতের এবং এরপর দাউদের (আ) নেতৃত্বে তারা ফিলিস্তিনে ইহূদী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। দাউদ (আ) ও সুলাইমান (আ)-এর রাজত্বকালের প্রায় ৬৫ বৎসর এ রাজ্য ভালভাবে চলে। সুলাইমানের (আ) ইন্তেকালের পরে তাঁর রাজত্ব দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। পরবর্তী প্রায় তিনশত বৎসরের ইতিহাস হলো রাজত্বের উভয় অংশের পারস্পরিক এবং পার্শবর্তী রাজ্যগুলির সাথে তাদের অভাবনীয়- অবর্ণনীয় রক্তারক্তি ও হানাহানির ইতিহাস।

খৃস্টপূর্ব ৬০৬ থেকে ৫৮৭ সালের মধ্যে ব্যাবিলনের শাসক নেবুকাদনেজার কয়েকবার আক্রমনের মাধ্যমে জেরুজালেম সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন এবং ইস্রায়েলীয়দেরকে বন্দী করে ব্যাবিলনে নিয়ে যান। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে তারা মুক্তি লাভ করে এবং জেরুজালেমে ফিরে আসে।

পরবর্তী প্রায় ৫০০ বৎসর ইস্রায়েলীরা গ্রীক, সিরিয় বা রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে জেরুজালেমে বসবাস করে। সর্বশেষ ১৩৬ খৃস্টাব্দে রোমান সম্রাট হার্ডিয়ান (Hadrian :১১৭-১৩৮) জেরুজালেম ও মসজিদে আকসা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেন। তিনি ইহূদীদেরকে ফিলিস্তিন থেকে চিরতরে বিতাড়িত করেন। অধিকাংশ ইহূদীকে বন্দী করে রোমে নিয়ে যান। তিনি ইহূদীদের জন্য জেরুজালেমে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন। শুধু বৎসরে নির্ধারিত একদিন ক্রন্দন করার জন্য আগমনের অনুমতি ছিল তাদের।

এ হলো জেরুজালেম ও ফিলিস্তিনে ইহূদীদের প্রায় হাজার বছরের ইতিহাস। এ ইতিহাস শুধু রক্তের ইতিহাস। ইহূদীগণ যতদিন জেরুজালেমে ছিল ততদিন এতদাঞ্চলের কোনো মানুষই শান্তিতে থাকতে পারে নি। তারা নিজেদের মধ্যে হানাহানি ও রক্তারক্তি করেছে, নবী-রাসূলগণকে হত্যা করেছে, পার্শবর্তী দেশগুলিতে রক্তারক্তি ও হানাহানি রফতানি করেছে এবং পুরো অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করেছে। ইহূদী-খৃস্টানদের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র বাইবেল থেকে তাদের প্রতারণা, জবরদখল, গণহত্যা, গণধ্বংসযজ্ঞ, অনাচার ও ধর্মদ্রোহিতার ইতিহাস বিস্তারিতভাবো জানা যায়। ইস্রায়েলীয়দের রক্তারক্তি ও হানাহানি এতই অস্বাভাবিক ছিল যে, পার্শবর্তী রাজাগণ তাদের রাজ্য দখল করার পরে একাধিকবার তাদেরকে এলাকা থেকে সম্পূর্ণ বিতাড়ন করেছেন। বিশ্বের ইতিহাসে জয়-পরাজয়ের অনেক ঘটনা রয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠীকে বিতাড়নের এরূপ ঘটনা তেমন দেখা যায় না।

খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় দু হাজার বৎসর ইহূদীগণ ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে সাধারণ নাগরিক হিসেবে বসবাস করেছে। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯৪৮ খৃস্টাব্দে ইউরোপ ও আমেরিকার সহায়তায় হাজার হাজার বৎসর ধরে ফিলিস্তিনে বসবাসকারী আররদেরকে হত্যা ও বিতাড়ন করে ফিলিস্তিনে আবার ইস্রায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বাইবেলের বর্ণনা প্রমাণ করে যে, ফিলিস্তিনে ইহূদীদের প্রথম অবস্থানের প্রায় হাজার বছরে কখনোই তারা পার্শবর্তী কোনো দেশের মানুষদেরকে শান্তিতে থাকতে দেয় নি। এথেকে বুঝা যায় যে, ফিলিস্তিনে ইস্রায়েলীয়দের অবস্থান এতদাঞ্চলের অশান্তির মূল কারণ। যতদিন তারা তথায় থাকবে ততদিন কোনোভাবেই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না।

কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ তাদের অনাচার, অত্যাচার ও দুবার জেরুজালেম ধ্বংস ও তাদের বিতাড়নের ঘটনার উল্লেখ করে বলেন:

عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا

"আশা করা যায় যে, তোমাদের রব তোমাদেরকে করুণা করবেন। আর যদি তোমরা প্রত্যাবর্তন কর তবে আমিও প্রত্যাবর্তন করব"[১৪]

এ থেকে বুঝা যায় যে, ১৩৬ খৃস্টাব্দে দ্বিতীয় বিতাড়নের পরে, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে পুনরায় একবার তাদেরকে জেরুজালেমে বসবাসের সুযোগ আল্লাহ দিতে পারেন এবং জেরুজালেমে ফেরার পরে যদি তারা আবার তাদের আগের স্বভাব ও কর্মে ফিরে যায় তাহলে আল্লাহও আবার তাদের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করাবেন। কুরআনের আলোকে আমরা বলতে পারি যে, আল্লাহ তাদেরকে আরেকবার করুণা করেছেন। কিন্তু তারা আবারো তাদের পূর্বের স্বভাব ও কর্মে ফিরে গিয়েছে। কাজেই অশান্তি চলতে থাকবে এবং বিতাড়নের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী থেকেও তা জানা যায়।

আমরা আগেই বলেছি, ফিলিস্তিনে ইহূদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাম্রাজ্যবাদীদের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত হয়েছে, যা পরিস্থিতিকে আরো কঠিন করেছে। এর সাথে মিলিত হয়েছে নব্য রক্ষণশীলদের ধর্মচিন্তা। ইউরোপে এবং বিশেষ করে আমেরিকায় খৃস্টধর্মীয় মৌলবাদিতা ও রক্ষণশীলতা ব্যাপকভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে। যারা খৃস্টধর্মের ইতিহাস জানেন তারা নিশ্চিত জানেন যে, খৃস্টধর্মীয় রক্ষণশীলতার অর্থই ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা।

ইতিহাসের পাঠকগণ জানেন, গ্রীক ও রোমানগণ সর্বদা অন্যান্য মানবগোষ্ঠীকে বর্বর বলে চিত্রিত করেছে এবং একমাত্র তাদের সভ্যতাকেই উন্নত সভ্যতা বলে চিত্রিত করেছে। গ্রীক ও রোমান সভ্যতার উত্তরসূরী ইউরোপ-আমেরিকা বা পাশ্চাত্যের মানুষেরা এ উন্নাসিকতার উত্তরাধিকার লাভ করেছেন। তারা সর্বদা তাদের সহনশীলতা, উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বহুত্ববাদ (Pluralism) নিয়ে গর্ব ও গৌরব করেন।

তাদের এ বহুত্ববাদ বড় অদ্ভুত! আমেরিকান, বৃটিশ, আইরিশ বা অন্য কোনো দেশের খৃস্টধর্মের অনুসারী কোনো সন্ত্রাসীকে

"খৃস্টান সন্ত্রাসী" বললে তারা আহত হন এবং এরূপ বলাকে অসহিষ্ণুতা বলে মনে করেন; কারণ এতে ধর্মপ্রাণ সৎ খৃস্টানগণের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া হয়। কিন্তু ইসলাম ধর্মের অনুসারী কোনো সন্ত্রাসীকে "মুসলিম সন্ত্রাসী" বলতে অসুবিধা আছে বলে তারা মনে করেন না। উপরন্তু ইসলামকে সন্ত্রাসী ধর্ম মুসলিমদেরকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করলেও কোনোরূপ অসহিষ্ণুতা হয় বলে তারা মনে করেন না, বরং এরূপ কথার প্রতিবাদই অসহিষ্ণুতা!

এ বহুত্ববাদের কারণে ইসলাম বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাসে আঘাত দিয়ে বক্তব্য, কার্টুন, সিনেমা, সাহিত্য ইত্যাদিকে বাকস্বাধীনতা বলে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু 'এন্টি সেমিটিযম' (Anti-Semitism) আইনের নামে ইহূদী জাতি ও ধর্ম বিষয়ক ঐতিহাসিক গবেষণা ও মতপ্রকাশ নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় করা হয়েছে, ব্লাসফেমি (Blasphemy) আইনের মাধ্যমে খৃস্টান ধর্মের বিরুদ্ধে বক্তব্য নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় করা হয়েছে।

এ বহুত্বের শর্ত merge বা একীভূত হওয়া। যে বিষয়কে তারা 'তাদের নিজস্ব' বলে গণ্য করবেন তা বিনা বাক্যে মেনে নিয়ে তার মধ্যে একীভূত হলেই কেবল তাদের বহুত্ববাদের কল্যাণ লাভ করা যাবে। আর এর বিপরীত মত, কর্ম, কৃষ্টি বা সভ্যতাকে তারা "সভ্যতার" জন্য ক্ষতিকর বিবেচনা করে প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হন। এজন্য যখন তারা "খৃস্টধর্ম"-কে তাদের নিজস্ব বলে গণ্য করেছেন তখন ইহূদী ও মুসলিমদের আইন করে দমন, নির্মূল বা ধর্মান্তর করেছেন। অনুরূপভাবে "খৃস্টধর্ম" বিরোধী মতামত প্রকাশকারী সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাবিদদের দমন ও নির্মূল করেছেন। একই কারণে প্রটেস্ট্যান্টগণ ক্যাথলিকদেরকে এবং ক্যাথলিকগণ প্রটেস্ট্যান্টদেরকে দমন, নির্মূল বা ধর্মান্তর করেছেন। এরূপ বহুত্ববাদী ধর্মনিরপেক্ষ ধার্মিক নিও-কনদের আধিপত্য আবার সেই পুরাতন জবরদস্তি, ধর্মান্তর ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার কথা মনে করায়।

আর সাম্রাজ্যবাদীদের ধর্ম ও সাম্রাজ্যবাদ হাত ধরাধরি করে চলে। যেখানেই সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশ করেছে সেখানেই তারা নানা কৌশলে ধর্মান্তর করতে চেষ্টা করেছে। এখনো এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। ইরাক ও আফগানিস্তানে সামরিক আগ্রাসনের পাশাপাশি মিশনারি আগ্রাসনের প্রস্তুতির সংবাদ সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। তথায় মার্কিন ও বৃটিশ সৈন্যরা এবং তাদের ছত্রছায়ায় অন্যান্য প্রচারক সরাসরি অথবা "সেবার" নামে ধর্মান্তরের বহুমুখি চেষ্টা চালাচ্ছেন। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উপজাতি ও সংখ্যালঘুদেরকে বিভিন্ন প্রলোভনে খৃস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের প্রেক্ষাপট তৈরি করা হচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্যের তেল নিয়ন্ত্রণ, খৃস্টীয় ধর্ম বিশ্বাস অনুসারে বিশ্বের ইহূদীদেরকে ফিলিস্তিন-জেরুজালেমে একত্রিত করে যীশুখৃস্টের পুনরাগমনের প্রেক্ষাপট তৈরি এবং মুসলিম দেশগুলিকে অস্থিতিশীল করে তাদের সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে একদিকে ফিলিস্তিন, ইরাক ও অন্যান্য দেশে নির্বিচারে নারী, পুরুষ ও শিশুরেদেক গণহারে হত্যা করা হচ্ছে, এ সকল মানবতা-বিরোধী অপরাধের সরব সমর্থনের পাশাপাশি এগুলির বিরুদ্ধে সকল কণ্ঠকে নীরব করে দেওয়া হচ্ছে। বিক্ষুব্ধ কেউ সন্ত্রাসের পথ বেছে নিলে তাকে "ইসলামী জঙ্গি" বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। বিনা প্রমাণে বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনাকে ইসলামী জঙ্গিদের কর্মকাণ্ড বলে দাবি করা হচ্ছে। প্রয়োজনে বিভিন্ন দেশের ধর্মপ্রাণ যুবকদের ধর্মীয় অনুভূতি ব্যবহার করে তাদেরকে ডেকে এনে অস্ত্র, ট্রেনিং ও সমর্থন দিয়ে জঙ্গি তৈরি করা হচ্ছে। এরপর আর জঙ্গিবাদের অভিযোগে তাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

১. ৮. বিশ্বব্যাপী মুসলিম নিধন

ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থানের প্রধান কারণ বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের উপর নির্বিচার অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞ। এ নিধনযজ্ঞের বড় একটি দিক ইস্রায়েল রাষ্ট্রের মাধ্যমে ফিলিস্তিন ও মধ্যপ্রাচ্যে হত্যাযজ্ঞ, যা আমরা উপরের অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছি। এছাড়াও চেচনিয়া, কাশ্মীর, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, চীন ও অন্যান্য বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নির্বিচার জুলুম, অত্যাচার ও জাতিগত নিধনযজ্ঞ (ethnic cleansing) চলছে। আর আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ, জাতিসংঘ, পাশ্চাত্য দেশগুলি ও আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যম এ নিধনযজ্ঞের বিষয়ে নীরব অথবা নিধনযজ্ঞের সরব সমর্থক। এর বিরুদ্ধে প্রায় কেউই সরব নয়।

এ পরিস্থিতিতে এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশের অদম্য আবেগই জঙ্গিবাদের জন্ম দিচ্ছে। মানুষ যখন নির্বিচার অত্যাচারের প্রতিবাদে আইনগতভাবে কিছুই করতে না পারে তখন বে-আইনীভাবে প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করে এবং তার বে-আইনী কর্মকে 'আদর্শিক' ছাপ দেয়। এছাড়া সারা বিশ্বের মুসলিম মানস এ নিধনযজ্ঞের অবসান ও মুসলিম সভ্যতার বিজয় কামনা করছে। জঙ্গিবাদীরা এদেরকে সহজেই বুঝাতে পারছে যে, তাদের পথই নিধনযজ্ঞের অবসানের ও বিজয়ের পথ। এক্ষেত্রে ইসলামী বিধি-বিধান বিচার, আলিমদের মতামত গ্রহণ, ফলাফল বিচার ইত্যাদির চেয়ে আবেগই বেশি কার্যকর।

এরূপ আবেগ ও হতাশা থেকেই যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইস্রায়েল বা অন্য কোনো দেশের অন্যায় বা জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ বা জুলুমের প্রতিকার করতে আবেগী যুবক সাধারণ মার্কিন নাগরিককে বা মার্কিনীদের সাথে সহযোগী বলে অন্য কোনো দেশ ও ধর্মের কোনো মানুষকে হত্যা করেন।

তার এ কর্মটি ইসলামের দৃষ্টিতে একটি কঠিন অন্যায় ও পাপ। কারণ: (১) ইসলাম অন্যায়ের প্রতিবাদ অন্যায় পদ্ধতিতে করতে অনুমতি দেয় না, (২) ইসলাম একের অপরাধে অন্যকে শাস্তি প্রদানের অনুমতি দেয় না এবং (৩) ইসলাম কোনো ব্যক্তি দল বা গোষ্ঠীকে বিচার বা শাস্তির দায়িত্ব নিজে গ্রহণের অনুমতি দেয় না।

এজন্য কখনোই কোনো দেশের প্রাজ্ঞ আলিম ও মুফতীগণ এরূপ প্রতিশোধ বা প্রতিবাদ বৈধ বলেন না। তাঁরা এ সকল ক্ষেত্রে ধৈর্যের সাথে, শান্তিপূর্ণভাবে সহিংসতা বর্জন করে প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপনের উৎসাহ দেন। তবে আবেগী যুবক তো তাদের "ফাতওয়া" নিয়ে কাজে নামেন নি। বরং আবেগতাড়িত হয়ে কাজ করেছেন এবং আলিমগণের ফাতওয়াকে দুর্বলতা বা দালালি বলে

গণ্য করেছেন। তার আবেগের পক্ষে অন্য আরেক আবেগী 'আধুনিক অর্ধ-আলিম ধর্মগুরু' বা মুফতীর 'ফাতওয়া' তার কাছে যুগোপযোগী, সঠিক ও দ্রুত ফললাভের সহায়ক বলে মনে হয়েছে।

১. ৯. মুসলিম দেশে ইসলাম-দমন

মুসলিম দেশগুলিতে উগ্রতা ও জঙ্গিবাদ প্রসারের অন্যতম কারণ এ সকল দেশে "ইসলাম-দমন"। বিশ্বের যে কোনো মুসলিম দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর দিকে তাকালে আমরা দেখি যে, তাদের প্রায় ১০% বা ১৫% মানুষ "ধার্মিক মুসলিম", যারা ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণের চেষ্টা করেন এবং সকলেই এরূপ করুক বলে আশা করেন। এর বিপরীতে জনসংখ্যার অতি নগণ্য অংশ- ২% বা ১%-এরও কম মানুষ ধর্মকে আফিম, প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা বলে মনে করেন বা দাবি করেন এবং টুপি, দাড়ি, বোরকা, মসজিদ, মাদ্রাসা ইত্যাদি ধর্মপালন বা ধর্মশিক্ষার যে কোনো প্রকার বা প্রকরণের প্রসারে আতঙ্কিত হন। বাকী প্রায় ৮০-৮৫% ভাগ মানুষ সাধারণ মুসলিম। যারা ধর্ম সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানেন না, ধর্মের কিছু বিধান পালন করেন, কিছু পরিত্যাগ করেন এবং সাধারণভাবে ধর্ম ও ধার্মিকদের শ্রদ্ধা করেন।

বাস্তবতার নিরিখে দেখা যায় যে, অনেক মুসলিম দেশে বাকস্বাধীনতা বা গণতান্ত্রিক অধিকারের নামে দ্বিতীয় প্রকারের মানুষদেরকে তাদের মতপ্রকাশ ও কর্মকাণ্ডের যেরূপ সুযোগ দেওয়া হয়, প্রথম প্রকারের মানুষদেরকে সেরূপ সুযোগ দেওয়া হয় না, বরং বিভিন্ন অযুহাতে তাদের মতপ্রকাশের অধিকার হরণ করা হয় বা কণ্ঠরোধ করা হয়।

"ইসলামপন্থী" বলে আখ্যায়িত ধার্মিক মানষেরা কী দাবি করেন? তাদের দাবি মূলত দু ধরণের: (১) রাষ্ট্র, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থায় ইসলামী নীতিমালার বাস্তবায়ন ও (২) সমাজের অশ্লীলতা, নগ্নতা, মাদকতা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ। ধার্মিকদের মধ্য থেকে সামান্য মানুষই প্রথম বিষয়ে সরব, তবে সকলেই দ্বিতীয় বিষয়ে আবেগী হন। যে কোনো ধার্মিক মানুষ সমাজের অবক্ষয়, অনাচার, অশ্লীলতা, নগ্নতা, মাদকদ্রব্যের প্রসার, জুলুম-অত্যাচার ইত্যাদি দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হন। এগুলি তার হৃদয়ের রক্ত ঝরায়। তিনি এর বিরুদ্ধে কথা বলতে বা প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অনেক সময় তার কথা বলার অধিকার হরণ করা হয়। বিষয়টি খুবই অদ্ভুত!

সকল দেশেরই ঘোষিত নীতি সহিংসতা, ধর্ষণ, এসিড, নৈতিক অবক্ষয়, এইডস, মাদকাসক্তি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা। সকল বিবেকবান মানুষই এগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে চান। তবে নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি ভিন্ন। পাশ্চাত্য রীতিতে অবাধ যৌনাচার, যৌনতা-উদ্দীপক কর্মকাণ্ড, পণ্য ও মদের অবাধ সরবরাহ, বিজ্ঞাপন ও বিপনন অব্যাহত রাখতে হবে এবং পাশাপাশি আইন বা উপদেশের মাধ্যমে এ সকল অবক্ষয় রোধ করতে হবে। বাহ্যত তাদের বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে এ ব্যবস্থা সম্পৃক্ত। জুয়া, মদ, মাদকদ্রব্য, তামাক-পণ্য, যৌনতা-প্রসারক পণ্যের বিজ্ঞাপন ও বিপননের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করার পর তারা মাদকাসক্তি, ধর্ষণ, ক্যান্সার, এইডস ইত্যাদির বিরুদ্ধে কিছু টাকা অনুদান প্রদান করেন।

আর ইসলামের নির্দেশনা এ সকল অবক্ষয়ের মূল উৎস রোধ করা। অবাধ নগ্নতা, অশ্লীল নাচ-গান, সিনেমা-ছবি, জুয়া, মাদকদ্রব্যের ব্যবহার ইত্যাদির সুযোগ অব্যাহত রেখে মহিলা-উত্যক্তি (Eve teasing), যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, এসিড, মাদকাসক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক সহিংসতা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। বিশ্বের সকল দেশের বাস্তবতা এর বড় প্রমাণ।

আমাদের দেশের সরকার, প্রশাসন ও সাধারণ মানুষেরা পাশ্চাত্যের প্রভাবে বা বেনিয়া-চক্রের চাপে অবক্ষয় ও অপরাধের বিরুদ্ধে কথা বললেও, উৎসগুলির বিরুদ্ধে কথা বলেন না। যেমন, তারা 'অনৈতিক কর্মের' আপত্তি করেন, কিন্তু মেলা বন্ধের দাবী করেন না। তারা এইডস, মহিলা-উত্ত্যক্তি (Eve teasing) ও যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে কথা বলেন, কিন্তু অশ্লীলতা, নগ্নতা, বেশ্যাবৃত্তি বা যৌনতা-উদ্দীপক পণ্যের বিরুদ্ধে কথা বলেন না। আর ধার্মিক মুসলিমগণ অবক্ষয় ও অপরাধের উৎস বন্ধ করার দাবি করেন।

যে কোনো বিবেকবান মানুষ স্বীকার করবেন যে, ধার্মিকগণের এ দাবি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ঘোষিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অত্যন্ত সহায়ক। জাগতিক স্বার্থ বা বেনিয়া-চক্রের চাপে কথা বলতে না পারলেও সরকার ও প্রশাসনের ন্যূনতম দায়িত্ব ধার্মিকদের মত প্রকাশ ও প্রচারে সহযোগিতা করা, যেন দেশ ও জাতি উপকৃত হয়। ধর্মীয় অনুভূতি ও দেশপ্রেম উভয়েরই দাবি এটি। কিন্তু দুঃখজনকভাবে অনেক সময় এর উল্টা করা হয়। বিভিন্ন অযুহাতে এদের কণ্ঠরোধ করা হয়। কখনো বেনিয়া-চক্র এদের অপমান ও নির্যাতন করেন এবং প্রশাসন এদেরকে সহযোগিতা থেকে বিরত থাকে। কখনো প্রশাসনই এদের কণ্ঠরোধ ও নির্যাতন করে।

যখন একজন আবেগী ধার্মিক যুবক- বিশেষত যার আবেগ আছে কিন্তু ধর্মীয় জ্ঞানে পূর্ণতা নেই- এরূপ নগ্নতা, অশ্লীলতা, মাদকতা ইত্যাদি দেখে প্রতিবাদ বা প্রতিকারের কোনো পথই পান না, কথা বলার অধিকার থেকে বঞ্চিত হন এবং তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হলেও কেউ কোনো সহযোগিতা না করে, তখন হতাশা ও আবেগ তাকে উগ্রতার পথে প্ররোচিত করে। এরূপ ব্যক্তি তখন আইন নিজের হাতে তুলে নিতে চেষ্টা করেন বা অন্যায়ের প্রতিবাদের নামে সহিংসতায় লিপ্ত হন।

আমরা আগে বলেছি এবং পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব যে, ইসলাম এরূপ সহিংসতার কোনোরূপ অনুমতি দেয় না এবং সমাজের বিজ্ঞ আলিমগণও তা সমর্থন করেন না। তবে আবেগীরা আলিমদের "ফাতওয়া" নেওয়ার পরে তাদের সিদ্ধান্ত নেন না; বরং তারা তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরে "ফাতওয়া" তালাশ করেন এবং তাদের মতই আবেগী কারো ফাতওয়াকে সঠিক বলে গ্রহণ করে প্রাজ্ঞ আলিমদেরকে মতামতকে দালালি বা ঈমানের দুর্বলতা বলে আখ্যায়িত করেন।

১. ১০. বেকারত্ব ও হতাশা

বিশ্বব্যাপী মুসলিম নিধন ও মুসলিম দেশে ইসলাম-দমন কেন্দ্রিক উপরের ক্ষোভ সকল মুসলিম দেশে বিদ্যমান থাকলেও জঙ্গিবাদী কার্যক্রম সকল দেশে সমানভাবে বিস্তার লাভ করেনি। ইন্দোনেশিয়ায় যেরূপ সন্ত্রাসী কার্যক্রম লক্ষ্য করা যায়, মালয়েশিয়াতে তা পাওয়া যায় না, অথচ ইসলামী শিক্ষার বিস্তার, মাদ্রাসার সংখ্যাধিক্য এবং আমেরিকা ও পাশ্চাত্য বিরোধী মনোভাব মালয়েশিয়াতে বেশি। এর বড় কারণ সম্ভবত মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং পাশ্চাত্য আগ্রাসন ও মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের সুস্পষ্ট মতামত।

কর্মব্যস্ত ও পরিতৃপ্ত মানুষের মনে ক্ষোভ বা আবেগ বেশি স্থান পায় না। এছাড়া রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের বক্তব্যে তাদের মনের আবেগ প্রতিধ্বণিত হয়। ফলে তা প্রকাশের জন্য বিকৃত পথের সন্ধান করে না। পক্ষান্তরে বেকার, সামাজিক বৈষম্য বা প্রশাসনিক অনাচারের শিকার মানুষের মনের ক্ষোভ ও হতাশাকে এ সকল আবেগ আরো উস্কে দেয়। এছাড়া এইরূপ মানুষকে সহজেই বুঝানো যায় যে, এভাবে দুই-চারিটি বোমা মারলে বা মানুষ খুন করলেই তোমার মত অগণিত মানুষের বেকারত্ব বা অত্যাচার শেষ হয়ে শান্তির দিন এসে যাবে।

আমাদের দেশে যারা সর্বহারার রাজত্ব বা ইসলামী রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সহিংসতা ও সন্ত্রাসের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তাদের বিষয়ে যে কোনো মাঠ জরিপ এ বিষয়টি প্রমাণ করবে। এমনকি আঞ্চলিক বিভাজনও তা প্রমাণ করবে। বাংলাদেশে দক্ষিণ-পশ্চিম, পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলে যেভাবে সমাজতন্ত্রী জঙ্গি বা ইসলামী জঙ্গির "রিক্রুটমেন্ট" সম্ভব, রাজধানী ও তার পূর্ব দিকে তা সম্ভব নয়। এসব এলাকার অর্থনৈতিক দৈন্য, বেকারত্ব ইত্যাদি এর অন্যতম কারণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ইসলামের ইতিহাসে সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ

আমরা দেখেছি যে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমের মিথ্যাচার ও অপপ্রচার "ইসলামী জঙ্গিবাদ"-কে যেভাবে চিত্রিত করছে তা কখনোই সত্য নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ, কখনো তা মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বাধীকার আদায়ের সংগ্রাম বা আগ্রাসন বিরোধী জিহাদ। তারপরও আমরা দেখি যে, কোনো কোনো মুসলিম ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে সন্ত্রাসে লিপ্ত হচ্ছে। পাশ্চাত্য রাজনীতিবিদ ও গবেষকগণ এদের কর্মকাণ্ডকে "ইসলামী জঙ্গিবাদ" ও "সভ্যতার সংঘাত"-এর পক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। পক্ষান্তরে মুসলিম নেতৃবৃন্দ এদেরকে ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্রের অংশ ও অমুসলিমদের ক্রীড়ানক বলে দাবি করেন। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে, তাদের মধ্যে কেউ অমুসলিমদের ক্রীড়ানক বা এজেন্ট হলেও সাধারণ অনেক যুবক শুধু ইসলামের আবেগেই এদের সাথে যোগ দিয়েছে। ইসলামের কিছু শিক্ষা তারা বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে অনেককে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। এ সকল বিকৃতি তাত্ত্বিকভাবে আমাদের পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। ধর্মীয় অনুভূতি ও আবেগ কখনো অবহেলা, গালি বা কঠোর শাস্তি দিয়ে অবদমিত করা যায় না। ধর্মীয়ভাবে এগুলির বিকৃতি উপলব্ধি করানোই এরূপ প্রবণতা থামানোর অন্যতম পথ।

ইসলামের নামে উগ্রতার উদ্ভবের একটি কারণ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও বিকৃত ধারণা। এ পথে প্রাচীন ও মধ্যযুগেও ইসলামের নামে সন্ত্রাসী সংগঠনের জন্ম ও প্রসারের ঘটনা ঘটেছে। এগুলির অন্যতম ছিল প্রথম হিজরী শতকে আলী (রা)-এর শাসনামলে আবির্ভূত খারিজী দল, ৫ম হিজরী শতকে আবির্ভূত বাতিনী হাশাশীন সম্প্রদায় এবং আধুনিক মিসরের "জামাআতুল মুসলিমীন" সংগঠন। জঙ্গি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত মানুষদের কথাবার্তা ও দাবিদাওয়ার সাথে উপর্যুক্ত সন্ত্রাসী সংগঠনগুলির বিশ্বাস, তত্ত্ব ও কর্মের অদ্ভুত মিল দেখা যায়। জঙ্গিবাদের প্রেক্ষাপট বুঝতে এ সকল গোষ্ঠীর ইতিহাস, বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

২. ১. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণী

মুসলিম উম্মাহর মধ্যে উগ্রতার আবির্ভাবের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاتَكُمْ مَعَ صَلاتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় বের হবে, যাদের সালাতের পাশে তোমাদের সালাত তোমাদের কাছেই নগণ্য বলে মনে হবে, যাদের সিয়ামের পাশে তোমাদের সিয়াম তোমাদের কাছেই নগণ্য বলে মনে হবে, যাদের নেককর্মের পাশে তোমাদের কর্ম তোমাদের কাছেই নগণ্য ও অপছন্দনীয় বলে মনে হবে, যারা কুরআন পাঠে রত থাকবে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তীর যেমন শিকারের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে অন্য দিক দিক দিয়ে বেরিয়ে যায় (তীরের দেহে শিকারকৃত প্রাণীর কোনো মাংস লেগে থাকে না), তেমনিভাবে তারা দীনের মধ্যে প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে যাবে (তাদের মধ্যে দীনের কিছুই থাকবে না।)"[১৫]

এ অর্থে ১৭ জন সাহাবী থেকে প্রায় ৫০টি পৃথক সূত্রের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ সকল হাদীস প্রমাণ করে যে, বাহ্যিক আকর্ষণীয় ধার্মিকতা, সততা ও ঐকান্তিকতা সত্ত্বেও অনেক মানুষ উগ্রতার কারণে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এ সকল- প্রায় অর্ধশত- হাদীস থেকে আমরা এদের বিভ্রান্তির কারণ ও এদের কিছু বৈশিষ্ট্য জানতে পারি। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, ইয়ামান থেকে আলী (রা) মাটি মিশ্রিত কিছু স্বর্ণ প্রেরণ করেন। তিনি উক্ত স্বর্ণ ৪ জন নওমুসলিম আরবীয় নেতার মধ্যে বণ্টন করে দেন। তখন বসা চক্ষু, উচু গাল, বড় কপাল ও মুণ্ডিত চুল, যুল খুওয়াইসিরা নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে:

يَا رَسُولَ اللهِ، اتَّقِ اللَّهَ (مَا عَدَلْتَ)، قَالَ: وَيْلَكَ! أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ (مَنْ يُطِعْ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُ؟ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ أَيَأْمَنُنِي اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَلا تَأْمَنُونِي؟) قَالَ ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ لا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي فَقَالَ خَالِدٌ وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ قَالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفٍّ فَقَالَ إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ

হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহকে ভয় করুন, আপনি তো বে ইনসাফি করলেন! তিনি বলেন, দুর্ভোগ তোমার! পৃথিবীর বুকে আল্লাহকে ভয় করার সবচেয়ে বড় অধিকার কি আমার নয়? আমি যদি আল্লাহর অবাধ্যতা করি বা বে-ইনসাফি করি তবে আল্লাহর আনুগত্য এবং ন্যায় বিচার আর কে করবে? আল্লাহ আমাকে পৃথিবীবাসীর বিষয়ে বিশ্বস্ত বলে গণ্য করলেন, আর তোমরা আমার বিশ্বস্ততায় আস্থা রাখতে পারছ না! এরপর লোকটি চলে গেল। তখন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি কি লোকটিকে (রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করে ধর্মত্যাগ ও কুফরী করার অপরাধে) মৃত্যুদণ্ড প্রদান করব না? তিনি বলেন, না। হয়তবা লোকটি সালাত আদায় করে। খালিদ (রা) বলেন, কত মুসল্লীই তো আছে যে মুখে যা বলে তার অন্তরে তা নেই। তখন রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয় নি যে, আমি মানুষের অন্তর খুঁজে দেখব বা তাদের পেট ফেড়ে দেখব। অতঃপর তিনি গমনরত উক্ত ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, এ ব্যক্তির অনুগামীদের মধ্যে এমন একদল মানুষ বের হবে যারা সদাসর্বদা সুন্দর-হৃদয়গ্রাহীভাবে কুরআন তিলাওয়াত করবে, অথচ কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তীর যেমন শিকারের দেহ ভেদ করে বেরিয়ে চলে যায়, এরাও তেমনি ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে চলে যাবে। তারা ইসলামে অনুসারীদের হত্যা করবে এবং প্রতিমা-পাথরের অনুসারীদের ছেড়ে দেবে। আমি যদি তাদেরকে পাই তবে সামূদ সম্প্রদায়কে যেভাবে নির্মূল করা হয়েছিল সেভাবেই আমি তাদেরকে হত্যা করে নির্মূল করব।[১৬]

মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, যুল খুওয়াইসিরা বা হুরকূস নামক এ ব্যক্তি খারিজীদের গুরুজনদের একজন ছিল।[১৭]

এখানে এ ব্যক্তি ও তার অনুসারীদের বিভ্রান্তির মূল কারণটি প্রতিভাত হয়েছে। তা ছিল ইসলামকে বুঝার ক্ষেত্রে নিজের বুঝকে একমাত্র সঠিক বলে মনে করা এবং এ বুঝের বিপরীত সকলকেই অন্যায়কারী বলে মনে করা। এখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রাষ্ট্রীয় সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করেছেন। তিনি সকল যোদ্ধার মধ্যে তা বণ্টন না করে অল্প কয়েকজনকে তা দিয়েছেন। এতে মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে মুমিন সহজেই বুঝতে পারেন যে, নিশ্চয় কোনো বিশেষ কারণে আল্লাহর বিশেষ নির্দেশেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তা করেছেন। অথবা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এর কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারেন। কিন্তু তিনি কখনোই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অন্যায়কারী বলে কল্পনা করতে পারেন না বা তাঁকে 'ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ' করতে পারেন না। কিন্তু এ ব্যক্তি দীন বুঝার ব্যাপারে নিজের জ্ঞানকেই চূড়ান্ত মনে করেছে। সে তার জ্ঞান দিয়ে অনুভব করেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন এবং তৎক্ষণাৎ সে 'সত্য ও দীন প্রতিষ্ঠা'-র লক্ষ্যে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহকে ভয় করতে ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ দিয়েছে!

এখানে ইসলামের নামে সন্ত্রাসী কর্মের একটি বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো, এরা এদের সন্ত্রাসী কর্ম মূলত 'মুসলিমদের' বিরুদ্ধে পরিচালিত করে। 'মুরতাদ', 'কাফির' ইত্যাদি অভিযোগে এরা মুসলিমদেরকে হত্যা করে। এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন:

إِنَّهُمْ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

"কাফিরদের বিষয়ে যে সকল আয়াত নাযিল হয়েছে এরা সেগুলিকে নিয়ে মুসলিমদের উপর প্রয়োগ করে।"[১৮]

আলী (রা) এবং আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) থেকে বিভিন্ন সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

يَخْرُجُ فِيكُمْ (فِيْ هَذِهِ الأُمَّةِ، فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ) قَوْمٌ حُدَثَاءُ (أَحْدَاثُ) الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ (يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ البَرِيَّةِ) (يَتَكَلَّمُونَ الْحَقَّ) يَمْرُقُونَ مِنْ الإِسْلامِ (مِنَ الْحَقِّ) كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ لا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَإِذَا (فَأَيْنَمَا) لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"এ উম্মাতের মধ্যে (তোমাদের মধ্যে, শেষ যুগে) এমন একটি সম্প্রদায় আগমন করবে যারা বয়সে তরুণ এবং তাদের বুদ্ধিজ্ঞান অপরিপক্কতা ও প্রগভতায় পূর্ণ। মানুষ যত কথা বলে তন্মধ্যে সর্বোত্তম কথা তারা বলবে (সর্বোত্তম মানুষের কথা বলবে, সত্য-ন্যায়ের কথা বলবে)। কিন্তু তারা সত্য, ন্যায় ও ইসলাম থেকে তেমনি ছিটকে বেরিয়ে যাবে, যেমন করে তীর শিকারের দেহ ভেদ করে ছিটকে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তোমরা যখন যেখানেই তাদেরকে পাবে তখন তাদেরকে হত্যা করবে; কারণ তাদেরকে যারা হত্যা করবে তাদের জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট পুরস্কার থাকবে।"[১৯]

এখানে ইসলামের নামে বা সত্য, ন্যায় ও হক্ক প্রতিষ্ঠার নামে সন্ত্রাসীকর্মে লিপ্ত মানুষদের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে:

প্রথমত, এরা অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সের। 'যুল খুওয়াইসিরা'র মত দুচার জন বয়স্ক মানুষ এদের মধ্যে থাকলেও এদের নেতৃত্ব, সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদি সবই যুবক বা তরুণদের হাতে। সমাজের বয়স্ক ও অভিজ্ঞ আলিম ও নেতৃবৃন্দের নেতৃত্ব বা পরামর্শ এরা মূল্যায়ন করে না।

দ্বিতীয়ত, এদের বুদ্ধি অপরিপক্ক ও প্রগলভতাপূর্ণ। আমরা আগেই দেখেছি যে, সকল সন্ত্রাসই মূলত রাজনৈতিক পরিবর্তন অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। আর রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য অস্থিরতা ও অদুরদর্শিতা সন্ত্রাসী কর্মের অন্যতম কারণ। অপরিপক্ক বুদ্ধি, অভিজ্ঞতার অভাব ও দূরদর্শিতার কমতির সাথে নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধির অহঙ্কার এ সকল সত্যান্বেষী ও ধার্মিক যুবককে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করেছিল।

২. ২. খারিজী সম্প্রদায়

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ ভবিষ্যদ্বাণী সর্বজনীন এবং সকল যুগেই এরূপ মানুষের আবির্ভাব হতে পারে। তবে সাহাবীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ একমত যে, এ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম বাস্তবায়ন হয়েছিল খারিজীদের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে।[২০] খারিজী সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডেই আমরা ইসলামের ইতিহাসে উগ্রতা ও সন্ত্রাসের প্রথম ঘটনা দেখতে পাই। ৩৫ হিজরী সালে (৬৫৬ খৃ) ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান খলীফা উসমান ইবনু আফ্ফান (রা) কতিপয় বিদ্রোহীর হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। বিদ্রোহীদের মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের বা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার মত কেউ ছিল না। তাঁরা রাজধানী মদীনার সাহাবীগণকে এ বিষয়ে চাপ দিতে থাকে। একপর্যায়ে আলী (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মুসলিম রাষ্ট্রের সেনাপতি ও গভর্নরগণ আলীর আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু উসমান (রা) কর্তৃক নিযুক্ত সিরিয়ার গভর্নর মু'আবিয়া (রা) আলীর আনুগত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি দাবি জানান যে, আগে খলীফা উসমানের হত্যাকারীদের বিচার করতে হবে। আলী (রা) দাবি জানান যে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পূর্বে বিদ্রোহীদের বিচার শুরু করলে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে পারে, কাজেই আগে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ক্রমান্বয়ে বিষয়টি ঘোরালো হয়ে গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়। সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে উভয়পক্ষে হতাহত হতে থাকে। এক পর্যায়ে উভয়পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য একটি সালিসী মজলিস গঠন করেন।

এ পর্যায়ে আলীর (রা) অনুসারীদের মধ্য থেকে কয়েক হাজার মানুষ আলীর পক্ষ ত্যাগ করেন। এদেরকে 'খারিজী' অর্থাৎ দলত্যাগী বা বিদ্রোহী বলা হয়। এরা ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় প্রজন্মের মানুষ, যারা রাসূলুল্লাহর (ﷺ) ইন্তেকালের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। এদের প্রায় সকলেই ছিলেন যুবক। এরা ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক ও নিষ্ঠাবান আবেগী মুসলিম। সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় ও সরাদিন যিক্র ও কুরআন পাঠে রত থাকার কারণে এরা 'কুর্রা' বা 'কুরআনপাঠকারী দল' বলে সুপরিচিত ছিলেন। এরা দাবি করেন যে, একমাত্র কুরআনের আইন ও আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছুই চলবে না। আল্লাহর নির্দেশ, অবাধ্যদের সাথে লড়তে হবে। আল্লাহ বলেছেন:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ.

"মুমিনগণের দু দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর তাদের একদল অপর দলের উপর অত্যাচার বা সীমালঙ্ঘন করলে তোমরা জুলুমকারী বা সীমালঙ্ঘনকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।"[২১]

এখানে আল্লাহ দ্ব্যর্থহীনভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে, সীমালঙ্ঘনকারী দলের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ না তারা ফিরে আসে। মু'আবিয়ার (রা) দল সীমালঙ্ঘনকারী, কাজেই তাদের আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। আত্মসমর্পনের আগেই যুদ্ধ থামানো বা এ বিষয়ে মানুষকে সালিস বানানোর অর্থই আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার ব্যতিক্রম বিধান দেওয়া। এছাড়া আল্লাহ বলেছেন:

إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ

"হুকুম শুধু আল্লাহরই।"[২২]

কাজেই মানুষকে ফয়সালা করার দায়িত্ব প্রদান কুরআনের নির্দেশের স্পষ্ট লঙ্ঘন। আল্লাহ আরো বলেছেন:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির।"[২৩]

আলী ও তার অনুগামীরা যেহেতু আল্লাহর নাযিল করা বিধান মত মু'আবিয়ার সাথে যুদ্ধ না চালিয়ে, সালিসের বিধান দিয়েছেন, সেহেতু তাঁরা কাফির। তারা দাবি করেন, আলী (রা), মু'আবিয়া (রা) ও তাঁদের অনুসারীরা সকলেই কুরআনের আইন অমান্য করে কাফির হয়ে গিয়েছেন। কাজেই তঁদের তাওবা করতে হবে। তাঁরা তাঁদের কর্মকে অপরাধ বলে মানতে অস্বীকার করলে তারা তাঁদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে।

খারিজীরা তাদের মতের পক্ষে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত উদ্ধৃত করতে থাকেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) ও অন্যান্য সাহাবী তাদেরকে এ মর্মে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, কুরআন ও হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পারঙ্গম হলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আজীবনের সহচর সাহাবীগণ। কুরআন ও হাদীসের তোমরা যে অর্থ বুঝেছ তা সঠিক নয়, বরং সাহাবীদের ব্যাখ্যাই সঠিক। এতে কিছু মানুষ উগ্রতা ত্যাগ করলেও বাকিরা তাদের মতকেই সঠিক বলে দাবি করেন। তারা সাহাবীদেরকে দালাল, আপোষকামী, অন্যায়ের সহযোগী ইত্যাদি মনে করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে।[২৪]

সালিসি ব্যবস্থা আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা)-এর মধ্যকার বিবাদ নিষ্পত্তিতে ব্যর্থ হওয়াতে তাদের দাবি ও প্রচারণা আরো জোরদার হয়। তারা আবেগী যুবকদেরকে বুঝাতে থাকে যে, আপোসকামিতার মধ্য দিয়ে কখনো হক্ক প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। কাজেই দীন প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআনের নির্দেশ অনুসারে জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। ফলে বৎসর খানেকের মধ্যেই তাদের সংখ্যা ৩/৪ হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ২৫/৩০ হাজারে পরিণত হয়। ৩৭ হিজরীতে মাত্র ৩/৪ হাজার মানুষ আলীর (রা) দল ত্যাগ করেন। অথচ ৩৮ হিজরীতে নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে আলীর বাহিনীর বিরুদ্ধে খারিজী বাহিনীতে প্রায় ২৫ হাজার সৈন্য উপস্থিত ছিল।[২৫]

তারা মনে করে, যেহেতু আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা) মুসলিম উম্মাহকে খোদাদ্রোহিতার মধ্যে নিমজ্জিত করেছেন, সেহেতু তাদেরকে গুপ্ত হত্যা করলেই জাতি এ পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার পাবে। এজন্য আব্দুর রাহমান ইবনু মুলজিম নামে একব্যক্তি ৪০ হিজরীর রামাদান মাসের ২১ তারিখে ফজরের সালাতের পূর্বে আলী যখন বাড়ি থেকে বের হন, তখন বিষাক্ত তরবারী দ্বারা তাঁকে আঘাত করে। আলীর (রা) শাহাদতের পরে উত্তেজিত সৈন্যেরা যখন আব্দুর রাহমানের হস্তপদ কর্তন করে তখন সে মোটেও কষ্ট প্রকাশ করে না, বরং আনন্দ প্রকাশ করে। কিন্তু যখন তারা তার জিহ্বা কর্তন করতে চায় তখন সে অত্যন্ত আপত্তি ও বেদনা প্রকাশ করে। তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে, আমি চাই যে, আল্লাহর যিক্র করতে করতে আমি শহীদ হব![২৬]

এ গুপ্তঘাতককে প্রশংসা করে তাদের এক কবি ইমরান ইবনু হিত্তান (৮৪ হি) বলেন: "কত মহান ছিলেন সে নেককার মুত্তাকি মানুষটি, যিনি সে মহান আঘাতটি করেছিলেন! সে আঘাতটির দ্বারা তিনি আরশের অধিপতির সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই চান নি। আমি প্রায়ই তাঁর স্মরণ করি এবং মনে করি, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি সাওয়াবের অধিকারী মানুষ তিনিই।"[২৭]

আলী (রা) ও অন্যান্য সাহাবী এদের নিষ্ঠা ও ধার্মিকতার কারণে এদের প্রতি অত্যন্ত দরদ অনুভব করতেন। তাঁরা এদেরেকে উগ্রতার পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারা তাদের 'ব্রান্ডের' ইসলাম বা ইসলাম সম্পর্কে তাদের নিজস্ব চিন্তা ও ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। আলীকে প্রশ্ন করা হয়: এরা কি কাফির? তিনি বলেন, এরা তো কুফরী থেকে বাঁচার জন্যই পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বলা হয়, তবে কি তারা মুনাফিক? তিনি বলেন, মুনাফিকরা তো খুব কমই আল্লাহর যিক্র করে, আর এরা তো রাতদিন আল্লাহর যিক্রে লিপ্ত। বলা হয়, তবে এরা কী? তিনি বলেন, এরা বিভ্রান্তি ও নিজ-মত পূজার ফিতনার মধ্যে নিপতিত হয়ে অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছে।[২৮]

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য এদের সংগ্রাম ছিল অত্যন্ত আন্তরিক। আরবী সাহিত্যে এদের কবিতা ইসলামী জযবা ও জিহাদী প্রেরণার অতুলনীয় ভাণ্ডার।[২৯] এদের ধার্মিকতা ও সততা ছিল অতুলনীয়। রাতদিন নফল সালাতে দীর্ঘ সাজদায় পড়ে থাকতে থাকতে তাদের কপালে কড়া পড়ে গিয়েছিল। তাদের ক্যাম্পের পাশ দিয়ে গেলে শুধু কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজই কানে আসতো।[৩০] কুরআন পাঠ করলে বা শুনলে তারা কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে যেত।[৩১]

পাশাপাশি এদের হিংস্রতা ও সন্ত্রাস ছিল ভয়ঙ্কর। ৩৭ হিজরী থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এদের সন্ত্রাস, হত্যা ও যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। ৬৪-৭০ হিজরীর দিকে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর ও উমাইয়া বংশের শাসকগণের মধ্যে যুদ্ধে তারা আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরকে সমর্থন করে। কারণ তাদের মতে, তিনিই সত্যিকার ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন উসমান (রা) ও আলী (রা)-কে কাফির বলতে অস্বীকার করলেন, উপরন্তু তাঁদের প্রশংসা করলেন তখন তারা তার বিরোধিতা শুরু করে।

৯৯-১০০ হিজরীর দিকে উমাইয়া খলীফা উমার ইবনু আব্দুল আযীয তাদের ধার্মিকতা ও নিষ্ঠার কারণে তাদেরকে বুঝিয়ে ভাল পথে আনার চেষ্টা করেন। তারা তাঁর সততা, ন্যায়বিচার ও ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণের বিষয়ে একমত পোষণ করে। তবে তাদের দাবি ছিল, উসমান (রা) ও আলী (রা)-কে কাফির বলতে হবে, কারণ তারা আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত বিধান প্রদান করেছন। এছাড়া মু'আবিয়া (রা) ও পরবর্তী উমাইয়া শাসকদেরকেও কাফির বলতে হবে, কারণ তারা আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে শাসকদের মনগড়া আইনে দেশ পরিচালনা করেন। যেমন, রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, রাজকোষের সম্পদ যথেচ্ছ ব্যবহারে শাসকের ক্ষমতা প্রদান ইত্যাদি। উমার ইবনু আব্দুল আযীয তাদের এ দাবী না মানাতে শান্তি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁর নিজের শাসনকার্য ইসলাম সম্মত

বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও তারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে।[৩২]

এরা মনে করত যে, ইসলামী বিধিবিধানের লঙ্ঘন হলেই মুসলিম ব্যক্তি কাফিরে পরিণত হয়। তারা এরূপ কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে 'ইসলাম প্রতিষ্ঠা' বা রাজনৈতিক পর্যায়ে ইসলামী বিধিবিধান তাদের ধারণামত "পরিপূর্ণ" বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের বাইরে দলবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করে। এছাড়া তারা আলীকে কাফির মনে করেন না এরূপ সাধারণ অযোদ্ধা পুরুষ, নারী ও শিশুদের হত্যা করতে থাকে।[৩৩]

উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ সাহাবী আলী (রা) ও মু'আবিয়া (রা)-এর মধ্যকার রাজনৈতিক মতবিরোধ ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন। প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ইবনু সিরীন (১১০ হি) বলেন, "যখন ফিতনা শুরু হলো, তখন হাজার হাজার সাহাবী জীবিত ছিলেন। তাদের মধ্য থেকে ১০০ জন সাহাবীও এতে অংশ গ্রহণ করেন নি। বরং এতে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা ৩০ জনেরও কম ছিল।"[৩৪]

এ সকল সাহাবী ও অন্যান্য সাহাবী-তাবিয়ী নৈতিকভাবে আলীর (রা) কর্ম সমর্থন করতেন। তাকে পাপী বা ইসলাম-লঙ্ঘনকারী বলতে কখনোই রাজি হতেন না। খারিজীগণ এদেরকেও কাফির বলে হত্যা করত।

একটি নমুনা দেখুন! সাহাবী খাব্বার ইবনুল আরাত-এর পুত্র আব্দুল্লাহ তাঁর স্ত্রী পরিজনদের নিয়ে পথে চলছিলেন। খারিজীগণ তাঁকে উসমান (রা) ও আলী (রা) সম্পর্কে প্রশ্ন করে। তিনি তাঁদের সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করেন এবং সন্ত্রাস ও হত্যার ভয়ানক পরিণতির বিষয়ে হাদীস বলেন। তখন তারা তাঁকে নদীর ধারে নিয়ে জবাই করে এবং তাঁর গর্ভবতী স্ত্রী ও অন্যান্য নারী ও শিশুকে হত্যা করে। এসময়ে তারা একস্থানে বিশ্রাম করতে বসে। তথায় একটি খেজুর গাছ থেকে একটি খেজুর ঝরে পড়লে একজন খারিজী তা তুলে নিয়ে মুখে দেয়। তখন অন্য একজন বলে, তুমি মূল্য না দিয়ে পরের দ্রব্য ভক্ষণ করলে? লোকটি তাড়াতাড়ি খেজুরটি উগরে দেয়। আরেকজন খারিজী একটি শূকর দেখে তার দেহে নিজের তরবারী দিয়ে আঘাত করে। তৎক্ষণাৎ তার বন্ধুরা প্রতিবাদ করে বলে, এতো অন্যায়, তুমি এভাবে আল্লাহর যমিনে বিশৃঙ্খলা ছড়াচ্ছ ও পরের সম্পদ নষ্ট করছ! তখন তারা শূকরের অমুসলিম মালিককে খুঁজে তাকে টাকা দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেয়।[৩৫]

এভাবে তারা অমুসলিমদের বিষয়ে ইসলামের উদারতা গ্রহণ করছে, সামান্য একটি খেজুরের বিষয়ে বান্দার হক্ক নষ্ট করাকে ভয় পাচ্ছে, অথচ ভিন্নমতাবলম্বী মুসলিমকে বিভিন্ন অযুহাতে কাফির বলে ইসলামের নামে তাকে হত্যা করছে এবং নিরস্ত্র নারী ও শিশুদেরকেও হত্যা করছে।

খারিজীগণের বিভ্রান্তিকর মতবাদের অন্যতম ছিল:

(১) ইসলামের নির্দেশনা বা কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে নিজেদের বুঝকেই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা। এক্ষেত্রে সাহাবীগণের মতামতের গুরুত্ব অস্বীকার করা।

(২) হাদীস মানলেও সুন্নাত বা আলোচ্য ও বিতর্কিত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রায়োগিক কর্ম ও কর্মপদ্ধতির গুরুত্ব অস্বীকার করা।

(৩) পাপের কারণে মুসলিমকে কাফির বলা।

(৪) কাফির হত্যার ঢালাও বৈধতা দাবি করা।

(৫) রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের শরয়ী গুরুত্ব অস্বীকার করা।

(৬) রাষ্ট্রপ্রধান ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের পাপের কারণে রাষ্ট্রকে কাফির রাষ্ট্র বলে গণ্য করা।

(৭) এরূপ রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্যকারী নাগরিকদেরকে কাফির বলা।

(৮) এরূপ কাফির রাষ্ট্র ও নাগরিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ বৈধ বলা।

(৯) জিহাদকে ফরয আইন, বড় ফরয ও দীনের রুকন বলে দাবি করা।

(১০) ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের নামে শাস্তি প্রদান।

(১১) তাদের মতের বিরোধী সকল আলিমকে অবজ্ঞা করা।[৩৬]

২. ৩. বাতিনী শীয়া সম্প্রদায়

ইসলামের ইতিহাসে আরেকটি সন্ত্রাসী দল ছিল 'বাতিনী শিয়া' বা 'হাশাশীন'গণ (Assassins)। শিয়া সম্প্রদায়ের অনেক উপদলের একটি 'বাতিনী' সম্প্রদায়। শিয়াগণ ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা 'ইমামত' বংশতান্ত্রিক বলে বিশ্বাস করেন। তাঁদের মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উভয়বিধ নেতৃত্ব আলী (রা)-এর প্রাপ্য ছিল। এরপর তা তাঁর বংশধরদের মধ্যেই থাকবে। এ নেতৃত্ব বা ইমামতকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে অনেক দল উপদল সৃষ্টি হয়েছে। অধিকাংশ শিয়া বিশ্বাস করেন যে, আলী বংশের ৬ষ্ঠ ইমাম জা'ফার সাদিকের (১৪৮ হি) পরে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মূসা কাযিম (১৮৩ হি) 'ইমামত' লাভ করেন। একদল মনে করে যে, জা'ফার সাদিকের জৈষ্ঠ্য পুত্র ইসমাঈল (১৪৮ হি) ছিলেন প্রকৃত ইমাম। তাঁর পরে এ ইমামত

তাঁর সন্তানদের মধ্যে থাকে। এদেরকে ইসমাঈলিয়া বাতিনীয়া সম্প্রদায় বলা হয়।

'বাতিনীয়া' সম্প্রদায়ের মতামতের মূল ভিত্তি ধর্মের নির্দেশাবলীর 'বাতিনী' বা গোপন ব্যাখ্যা। তাঁদের মতে, ইসলামী ইলম দুপ্রকারের: যাহিরী ও বাতিনী।[৩৭] তারা দাবি করেন, ইসলামের নির্দেশাবলীর দুটি অর্থ রয়েছে। প্রথমত বাহ্যিক বা যাহিরী অর্থ। এ অর্থ সকলেই বুঝতে পারে। আর দ্বিতীয় অর্থ বাতিনী বা গোপন অর্থ। এ অর্থ শুধু আলী বংশের ইমামগণ বা তাদের খলীফা বা প্রতিনিধিগণ জানেন। আর এ গোপন অর্থই 'হাকীকত' বা ইসলামের প্রকৃত নির্দেশনা। এ 'হাকীকতের' জ্ঞানই প্রকৃত মারিফত। শুধু সাধারণ জাহিলগণই যাহিরী বা প্রকাশ্য ইলম ও আমল নিয়ে পড়ে থাকে। আর সত্যিকার বান্দারা গোপন অর্থ বা হাকীকত বুঝে মারিফাত অর্জন করেন এবং সেমতই তাদের জীবন পরিচালনা করে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হন।

এ মূলনীতির ভিত্তিতে বাতিনী সম্প্রদায়ের নেতারা তাদের সুবিধামত কুরআনের নির্দেশাবলী ব্যাখ্যা করতেন। ঈমান, সালাত, সিয়াম, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি ইবাদতের মনগড়া ব্যাখ্যা করে তারা সেগুলি বাতিল করেন। মদ, ব্যভিচার, ইত্যাদি পাপের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে তারা সেগুলি বৈধ করে দেন। তাঁদের অনুসারীরা তাদের এ সকল ব্যাখ্যা ভক্তিভরে মেনে নিতেন।

৩য়-৪র্থ হিজরী শতাব্দীতে ইয়ামান, ইরাক, মরক্কো, মিসর ইত্যাদি অঞ্চলে ইসমাইলীয় বাতিনী শিয়াগণ 'কারামিতা', ফাতিমিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন নামে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এরা যেহেতু ইসলামের নির্দেশনাগুলিকে নিজেদের মতমত ব্যাখ্যা করত সেহেতু এরা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য প্রয়োজনমত সন্ত্রাস, নির্বিচার হত্যা, গুপ্ত হত্যা ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করত। তাদের অনুসারীরা বিনা যুক্তিতে তাদের আনুগত্য করত। এ সকল সন্ত্রাসীদের অন্যতম ছিল হাশাশিয়া নিযারিয়া বাতিনী সম্প্রদায়। হাশিশ বা 'আফিম' ও 'গাজা' জাতীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার ছিল তাদের মৌলিক পরিচয়। এজন্য তারা 'হাশাশীন' নামে খ্যাত হয়। এরা পঞ্চম-ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বে সন্ত্রাস ও গুপ্ত হত্যার অপ্রতিরোধ্য ধারা সৃষ্টি করে। আরবী 'হাশাশীন' শব্দ থেকেই ইংরেজী assassin ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দগুলি গুপ্ত হত্যা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

হাসান ইবনু সাবাহ নামক এক ইরানী নিজেকে ইসমাঈলীয়া শিয়া মতবাদের ইমাম ও মিসরের শাসক মুসতানসির বিল্লাহ (৪৮৭ হি)-এর জৈষ্ঠ্য পুত্র নিযার-এর খলীফা ও প্রতিনিধি বলে দাবি করেন। তিনি প্রচার করেন যে, বুদ্ধি, বিবেক বা যুক্তি দিয়ে কুরআন ও ইসলামের নির্দেশ বুঝা সম্ভব নয়। কুরআনের সঠিক ও গোপন ব্যাখ্যা বুঝতে শুধু নিষ্পাপ ইমামের মতামতের উপরেই নির্ভর করতে হবে। আর সেই ইমাম লুক্কায়িত রয়েছেন। তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে হাসান নিজে কাজ করছেন। তিনি তার ভক্তদের মধ্যে একদল জানবায ফিদায়ী তৈরি করেন। যারা তার নির্দেশে তাৎক্ষণিকভাবে আত্মহনন সহ যে কোনো কর্মের জন্য প্রস্তুত থাকত।

এদের মাধ্যমে তিনি উত্তর পারস্যে আলবুর্জ পর্বতের দশ হাজার কুড়ি ফুট উচ্চ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যরাজি পরিপূর্ণ উপত্যাকায় 'আল-মাওত' নামক এক দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করে তথায় তার রাজনৈতিক কেন্দ্র স্থাপন করেন। সেখান থেকে তিনি তার ধর্মীয়-রাজনৈতিক প্রচারণা চালাতে থাকেন। তার প্রচারিত 'ধর্মীয়-রাজনৈতিক' আর্দশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যাকেই তিনি শত্রু মনে করতেন তাকে গুপ্ত হত্যা করার নির্দেশ দিতেন। ইসলামের ইতিহাসে ধর্মের নামে বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ঢালাও গুপ্তহত্যা এভাবে আর কোনো দল করে নি। এসকল দুর্ধর্ষ আত্মঘাতী ফিদায়ীদের হাতে তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ উযির নিযামুল মুলক, প্রসিদ্ধ আলিম নজুমুদ্দীন কুবরা সহ অনেক মুসলিম নিহত হন। পার্শবর্তী এলাকা ও দেশগুলিতে গভীর ভীতি ও সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কারণ কেউই বুঝতে পারতেন না যে, এ সকল ফিদাঈদের পরবর্তী টার্গেট কে। হাসানের পরে তার বংশধরেরা আল-মাওত দূর্গ থেকে ফিদাঈদের মাধ্যমে তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। তৎকালীন মুসলিম শাসকগণ এদের দমনে অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অবশেষে ৬৫৪ হিজরীতে (১২৫৬ খৃ) হালাকু খার বাহিনী এদের নির্মূল করে।[৩৮]

আমরা দেখছি যে, খারিজীগণের ন্যায় "বাতিনী"-গণের বিভ্রান্তির মূল ছিল ইসলামের নির্দেশনা বুঝার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের কর্মধারার গুরুত্ব না দেওয়া। তবে খারিজীদের সাথে এদের কিছু পার্থক্য আমরা দেখতে পাই:

(১) খারিজীগণ জিহাদের নামে সশস্ত্র রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ, অযোদ্ধা জনপদের উপর হামলা, হত্যা ও লুটতরাজ করলেও সাধারণত গুপ্ত হত্যা করত না। আলী (রা), মুআবিয়া (রা) প্রমুখের গুপ্ত হত্যার পরিকল্পনা ও আলী (রা)-কে গুপ্ত হত্যা করা ছাড়া অন্য কাউকে তারা গুপ্ত হত্যা করেছে বলে জানা যায় না। পক্ষান্তরে বাতিনীগণের মূল কর্মই ছিল গুপ্ত হত্যা।

(২) খারিজীগণের কর্মকাণ্ডে আত্মহত্যা বা আত্মঘাতী হামলার কোনো ঘটনা দেখতে পাই না। পক্ষান্তরে বাতিনীগণ নেতার নির্দেশে মৃত্যুবরণ করাকেই জান্নাতের পথ বলে বিশ্বাস করত, আত্মহনন বা অন্যের হাতে মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য করত না।

(৩) খারিজীগণ ইসলামী শরীয়তের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করত। এ বিষয়ে কোনোরূপ ছাড় দেওয়াকে কুফরী বলে মনে করত। পক্ষান্তরে বাতিনীগণ শরীয়ত পালন জরুরী বলে মনে করত না। বিশেষত নেতার নির্দেশে যে কোনো শরীয়ত বিরোধী কর্ম করাকে বৈধ মনে করত।

(৪) খারিজীগণ কখনোই নিজেদের আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য গোপনীয়তা বা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করত না। তারা নিজেদের বিশ্বাস ও কর্মের কথা সুস্পষ্টভাবেই প্রচার করত। পক্ষান্তরে বাতিনী সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডের ভিত্তিই ছিল গোপনীয়তা ও মিথ্যা। তারা সর্বদা নিজেদের মতবাদ গোপন রেখে সমাজের মানুষদের সাথে মত, বিশ্বাস ও কর্মে একাত্মতা প্রকাশ করত। শুধু

বাছাই করা মানুষদের কাছে নিজেদের মতামত প্রকাশ করে দাওয়াত দিত।[৩৯]

২. ৪. "জামাআতুল মুসলিমীন" বা তাকফীর ওয়াল হিজরা

ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের পরে বিভিন্ন মুসলিম দেশে অনেক ধার্মিক মুসলিম সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ ও রীতিনীতিতে প্রত্যাবর্তনের জন্য দাবি করতে থাকেন। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম প্রধান দেশ মিসরে এ জাতীয় দাবি উত্থিত হতে থাকে। সাধারণ মুসলিম যুবক ও শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে এ চেতনা ক্রমান্বয়ে স্থান লাভ করতে থাকে। পঞ্চাশের দশক থেকে মিসরের শাসকগোষ্ঠী এদের দাবির প্রতি কর্ণপাত করার পরিবর্তে এদেরকে দমন করার পথ বেছে নেন। তাঁদের দাবি পেশ করার গণতান্ত্রিক অধিকার থেকেও তাদের বঞ্চিত করা হয়। শুধু তাই নয় নির্বিচারে অগণিত আলিম, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী ও সাধারণ নাগরিককে কারাগারে আটক করা হয়। এরা ছিলেন সমাজের সবচেয়ে ভদ্র, শালীন ও সৎ যুবক। তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকারের অপরাধ বা আইন অমান্যের অভিযোগ পাওয়া যায় নি। একটি মাত্র অভিযোগে তাদেরকে আটক করা হয়, তা হলো তারা 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন' সংগঠনের সদস্য। আর 'ইখওয়ানের সদস্য' বলে কাউকে আটক করার পর উক্ত সংগঠনের সাথে তার সম্পর্ক প্রমাণ করার কোনো দায় দায়িত্ব মিসরের পুলিশ বাহিনীকে বহন করতে হতো না।

১৯৬৮ সালের দিকে আলী মাহমূদ নামে একজন সাংবাদিক 'ইসলাম-পন্থী' হওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হন। তিনি 'ইসলামপন্থী' হওয়া তো দূরের কথা ধর্মকর্ম যথারীতি পালনের অভ্যাসও তার ছিল না। সর্বাবস্থায় জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে তিনি কারাগারের রোজনামচা প্রকাশ করেন। এর এক স্থানে তিনি লিখেছেন: মিসরীয় গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান মেজর জেনারেল হাসান তাল'আত গ্রেফতারকৃত 'ইসলামপন্থীদের' সাথে সরাসরি আলাপের মাধ্যমে তাদেরকে সংশোধনের দায়িত্ব নেন। তিনি কারাগারে আসলে ১৮/১৯ বৎসরের এক যুবক প্রশ্ন করেন, তাকে কেন বিনা বিচারে দীর্ঘদিন আটক রাখা হয়েছে, সে তো কোনো দলমতের সাথে কোনোভাবে জড়িত নয়? তখন লেফটেন্যান্ট সালূমা জেনারেলের কানে কিছু বলেন। তখন জেনারেল গর্জে উঠে বলেন, কেন তোমাকে মসজিদ থেকে গ্রেফতার করা হয় নি? তুমি মসজিদে ছিলে না? তাহলে কিভাবে দাবি করছ যে, তুমি কোনো দলের সদস্য নও? তখন সেখানে উপস্থিত একজন ইমাম শেখ আরিফ বলেন, বাবা, তোমাকে যদি বেশ্যালয় বা মদের আড্ডা থেকে গ্রেফতার করা হতো, তবে তোমার বাঁচার পথ থাকত। কিন্তু তোমাকে যেহেতু মসজিদে পাওয়া গিয়েছে, কাজেই তোমার দুর্ভ্যাগ্যের শেষ নেই![৪০]

এভাবে নির্বিচারে নিরীহ, ধার্মিক যুবকদেরকে গণহারে গ্রেফতার করা হয়। কারাগারের অভ্যন্তরে তারা অকল্পনীয় ও অবর্ণনীয় অমানবিক অত্যাচার ও বিচারবহির্ভুত হত্যার সম্মুখীন হন। এ অত্যাচার কতিপয় যুবকের মধ্যে উগ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এরা খারিজীদের অনুরূপ সন্ত্রাসী চিন্তাচেতনাকে ইসলামী আদর্শ বলে প্রচার করতে থাকে। এদের অন্যতম ছিল মিসরের শুকরী আহমদ মুসতফা প্রতিষ্ঠিত 'জামা'আতুল মুসলিমীন'।

শুকরী আহমদ মুসতাফা ১৯৪২ সালে আসইয়ূতে জন্মগ্রহণ করেন। ২৩ বৎসর বয়সে ১৯৬৫ সালে মিসরের আসয়ূত শহরের কৃষি বিশ্ববিদ্যলয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় তাকে 'ইখওয়ানুল মুসলিমীনের' সদস্য হওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। দীর্ঘ প্রায় ৭ বৎসর কারাভোগের পর ১৯৭১ সালে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। কারাগার থেকে তিনি নতুন এক 'বৈপ্লবিক' চিন্তা ও তত্ত্ব নিয়ে বের হন।

তিনি ও তাঁর অনুসারীরা দাবি করেন যে, একমাত্র তাঁদের জিহাদী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই দীনের বিজয় সম্ভব হবে। তারা আরো দাবি করেন যে, অত্যন্ত দ্রুতই তারা এ বিজয় অর্জনে সক্ষম হবেন। তাঁদের এসকল দাবি দাওয়া ও দ্রুত ইসলাম প্রতিষ্ঠার আগ্রহ অনেক যুবককে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। তারা 'জামা'আতুল মুসলিমীন' নামে একটি দল গঠন করেন। সাধারণ মানুষ এ দলকে "জামাআতুত তাকফীর ওয়াল হিজরাহ" নামে চিনতেন। তাকফীর অর্থ কাফির বলা এবং "হিজরাহ" অর্থ হিজরত বা পরিত্যাগ করা। এ দলের মূলনীতি ছিল তারা ছাড়া সমাজের সকল মানুষই কাফির এবং কাফিরদের সমাজ থেকে হিজরত করে তাদের সমাজে না যাওয়া পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি মুসলিম বলে গণ্য হবে না।

শুকরী ও তাঁর অনুসারীরা খারিজী মতবাদ গ্রহণের প্রকাশ্য ঘোষণা দেন এবং খারিজী মতবাদই কুরআন-হাদীস সমর্থিত একমাত্র সঠিক মতবাদ বলে দাবি করেন। খারিজীদের মতই তাদের মধ্যে ইলমের চেয়ে আবেগ ছিল বেশি। এদের নেতৃবৃন্দের কেউই আলিম ছিলেন না; সকলেই ছিলেন সাধারণ শিক্ষিত যুবক। কুরআন ও হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে নিজেদের বুঝকেই তারা চূড়ান্ত বলে মনে করতেন। এছাড়া সাহাবীগণের যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সকল মুসলিম প্রজন্মকে তারা ইসলামচ্যুত বলে মনে করতেন; কারণ, -তাদের দাবি অনুসারে- তাঁরা সঠিক ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা না করে খোদাদ্রোহী তাগুতী রাষ্ট্রশক্তির সাথে আপোস করেছেন।

সাহাবীগণের যুগ থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল যুগের আলিম, ইমাম, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস ও সমকালিন সকল আলিমকে তারা মুর্খ, স্বার্থপর, আপসকামী, 'তাগুত'-এর অনুসারী, ইত্যাদি বলে অভিহিত করতেন। কোনো আলিমের পুস্তক পড়তে বা

কাউকে প্রশ্ন করতে তারা তাদের অনুসারীদের কঠিনভাবে নিষেধ করতেন।[৪১] সাহাবী, তাবিয়ী ও পরবর্তী যুগের আলিমদের ব্যাখ্যা বা মতামতকে তারা কোনোরূপ মূল্যায়ন করতেন না। হাদীস গ্রহণ করার বিষয়ে তারা নিজেদের পছন্দের উপর নির্ভর করত। তাদের মতে কুরআন ও হাদীসের পাশাপাশি মানুষ ও মানুষের বুদ্ধি-বিবেকেই ইসলামের মূল উৎস।[৪২]

এরা খারিজীদের মতই বিভিন্ন যুক্তি ও অযুহাতে তাদের দলভুক্ত হতে আপত্তিকারী সকল মুসলিমকে কাফির-মুরতাদ হিসেবে গণ্য করে তাদেরকে গুপ্ত হত্যা করার জন্য দলের কর্মীদের প্রতি নির্দেশ জারি করে। বিশেষত যে সকল আলিম ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব এদের কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের বিভ্রান্তি বুঝাতে চেষ্টা করতেন বা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাদের মতবাদের ভুলগুলি প্রকাশ করতেন তাদেরকে তারা গুপ্ত হত্যা করতে শুরু করে। ১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে তারা মিসরের সুপ্রসিদ্ধ আলিম ও গবেষক পণ্ডিত ড. মুহাম্মাদ হুসাইন যাহাবীকে অপহরণ করে এবং পরে তাকে হত্যা করে।[৪৩] এ হত্যাকাণ্ডের পরে সরকার এদেরকে গ্রেফতার করে এবং ৩০/৩/১৯৭৮ তারিখে শুকরী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। বাকিদেরকে দীর্ঘ মেয়াদি কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

দেখা যায় যে, ড. যাহাবীর হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে একমাত্র মিসর সরকারই লাভবান হন। তাঁরা এ অভিযোগে শুকরী ও তার সহকর্মীদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন। এ ঘটনাকে ভিত্তি করে সরকার এবং প্রচার মাধ্যম ঢালাওভাবে ইসলামপন্থী ও ধার্মিক মানুষদেরকে সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত করতে শুরু করে এবং সরকার নতুন করে 'ইসলামপন্থীদের' গ্রেফতার ও অত্যাচারের সুযোগ পান। সর্বোপরি ড. যাহাবীর মত একজন দলনিরপেক্ষ অথচ স্পষ্টভাষী আলিমের সমালোচনা থেকে সরকার রক্ষা পান।

এ অপহরণ, হত্যাকাণ্ড, বিচার ও শাস্তিপ্রদানের "টাইমিংটাও" অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ড. যাহাবীর অপহরণের পরে মিসরের সাথে ইস্রায়েলের শান্তি আলোচনা শুরু হয় ও শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। মিসরবাসীগণ এবং বিশেষত "ইসলামপন্থীরা" ইস্রায়েলের সাথে চুক্তির বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ড. যাহাবীর অপহরণের পর ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার, ধরপাকড় ও নির্যাতনের মধ্যেই এ চুক্তির আলোচনা শুরু ও শেষ হয়। এদের মৃত্যুদণ্ড "ইসলামপন্থী"-দেরকে "মেসেজ" প্রদান করে যে, কেউ শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিলে তারও এরূপ অবস্থা হবে।

যদিও শুকরী ও তার সহচরগণ তাদের মতবাদের ভিত্তিতে 'কাফির-মুরতাদ' ড. যাহাবীকে হত্যা করার কথা সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করে, তবুও অনেক গবেষক মনে করেন যে, সরকারের অনুচরগণই তাদের গোপনীয়তা, ব্যগ্রতা ও উগ্রতার কারণে তাদেরকে সুকৌশলে এ কর্মে প্ররোচিত করে। বিশেষত, ড. যাহাবীকে অপহরণের মূল দায়িত্ব পালন করেন আহমদ তারিক নামে একজন পুলিশ অফিসার, যিনি অপহরণ ঘটনার কিছু আগে 'ইসলাম প্রতিষ্ঠার' বিশেষ আগ্রহ নিয়ে জামা'আতুল মুসলিমীনে যোগদান করেন।[৪৪]

১৯৭৮ সালের পরে এদের জোরালো উপস্থিতি না থাকলেও এদের চিন্তাচেতনা ও মতবাদগুলি পরবর্তীকালে অনেক আবেগী মুসলিমের মধ্যে প্রভাব ফেলেছে। উগ্রতায় লিপ্ত সমকালীন বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যে তাদের এ সকল মতবাদ একইভাবে বিদ্যমান বলে দেখা যায়।

এভাবে আমরা দেখছি যে, প্রাচীন খারিজীগণের ন্যায় শুকরী মুস্তফা ও তাঁর "জামা'আতুল মুসলিমীন" বা "জামাআতুত তাকফীর ওয়াল হিজরা"-র মূল বিভ্রান্তি ছিল অতি আবেগ, দীনের বিষয়ে অতি-বাড়াবাড়ি, ধর্ম পালন ও বুঝার অহঙ্কার ও কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা বুঝার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের প্রায়োগিক সুন্নাত বা কর্মরীতির গুরুত্ব না দেওয়া। এ থেকে তারা বহুমুখি বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হন। সেগুলির মধ্যে রয়েছে:

(১) পাপের কারণে মুমিনকে কাফির বলা। ব্যাহিক পাপ না থাকলেও তাদের মতের বিরোধী সকলকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে কাফির বলা।

(২) কুরআন বিরোধী আইনের বিদ্যমানতার কারণে উপনিবেশোত্তর মুসলিম দেশগুলির শাসকদেরকে কাফির বলা। এ সকল রাষ্ট্রকে কাফির ও তাগুতী রাষ্ট্র বলে গণ্য করা। এ সকল রাষ্টের নাগরিকদেরকে রাষ্ট্রীয় আনুগতের কারণে কাফির বলা। যারা এদের কাফির না বলে তাদেরকেও কাফির বলা। একজন মুসলিমকে প্রশ্নত্তোরের মাধ্যমে মুসলিম বলে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে মুসলিম বলে স্বীকার না করা।

(৩) এ সকল রাষ্ট্র ও সমাজকে জাহিলী ও কাফির সমাজ মনে করে এগুলি থেকে "হিজরত" করা, বা অন্তত "মানসিক হিজরত' করা, অর্থাৎ, মানসিকভাবে নিজেকে এদের থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন বলে মনে করা, সমাজের মসজিদগুলিতে জুমআ ও জামাআত আদায় না করা।

(৪) নিজেদের দলকে "আল-জামাআত" বলে দাবি করা এবং তাদের আমিরের হাতে "বাইয়াত" করাকে ইসলামে প্রবেশের শর্ত বলে দাবি করা।

(৫) সমাজের সকল আলিমের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা ও তাদের ঘৃণা করা। সাহাবীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর সকল আলিম, ইমাম, ফকীহ ও নেককারগণকে ঘৃণা করা ও তারা কেউই ইসলাম সঠিকভাবে বুঝেন নি বা পালন করেন নি বলে দাবি

করা। আলিম, ইমাম ও সালফে সালেহীনের অনুসরণ বা তাকলীদকে শিরক বলে দাবি করা। সকলের জন্য ইজতিহাদ জরুরী বলে দাবি করা।

(৬) ইসলামের ফরয ইবাদগুলির মধ্যে বড়-ছোট নির্ণয় করা। "দীন প্রতিষ্ঠা" অর্থ "রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা" বলে দাবি করা, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে বড় ফরয বলে দাবি করা এবং বড় ফরযের জন্য ছোট ফরয-ওয়াজিব পরিত্যাগ করাকে জায়েয বলে দাবি করা। যেমন দীনের প্রয়োজনে (!) ফরয সালাত ত্যাগ, সিয়াম ত্যাগ, দাড়ি মুণ্ডন, মদপান, কাফির নারী বিবাহ করা ইত্যাদি।

(৭) ইসলামের বিধিবিধানকে পর্যায়ক্রমিক পালনীয় বলে দাবি করা। তারা দাবি করতেন যে, মিসরের তৎকালীন সময়ে তারা "মক্কী" যুগে অবস্থান করছেন। কাজেই ইসলামের অনেক বিধানই তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

(৮) শিক্ষাগ্রহণের বিরোধিতা করা, বিশেষত 'তাগূতী' সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণ বা সনদগ্রহণকে পাপ বা কুফরী বলে গণ্য করা এবং নিরক্ষর থাকাকে ইসলাম নির্দেশিত বলে দাবি করা।

(৯) "কাফিরদের" বা তাদের মতের বিরোধীদের হত্যা করা বৈধ, জিহাদ ও দীন প্রতিষ্ঠার কর্ম বলে দাবি করা।[৪৫]

২. ৫. দলীল-প্রমাণে পছন্দনির্ভরতা

আমরা উল্লেখ করেছি যে, বাতিনী শিয়াগণ মূলত কুরআন, হাদীস ও আলিমগণের মতামত কোনোকিছুই মানত না। তাদের একমাত্র দলীল ছিল কথিত ইমাম বা তাদের খলীফাগণের ব্যাখ্যা ও মতামত। খারিজীগণ ও জামাআতুল মুসলিমীন কুরআন ও হাদীসের উপর নির্ভরতার ঘোষণা দেয়। তারা তাদের সকল মতামতের প্রমাণ কুরআন ও হাদীস থেকে পেশ করার চেষ্টা করে। তবে তাদের প্রমাণ পেশের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো পছন্দনির্ভরতা। তারা যে আয়াত বা হাদীসকে নিজেদের পক্ষে বলে মনে করত সেগুলিকে গ্রহণ করত। আর যেগুলি তাদের মতের বিপক্ষে সেগুলিকে মানসূখ বা রহিত বলে অথবা ব্যাখ্যা করে বাতিল করত। কখনো কুরআন বুঝার জন্য "শানে নুযূল" বা অবতরণের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করতে অস্বীকার করত। আবার কখনো অবতরণের প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে কোনো আয়াতের সাধারণ নির্দেশনা মানতে অস্বীকার করত। কখনো আধুনিক কোনো গবেষক বা প্রসিদ্ধ আলিমের কোনো কোনো বক্তব্যকে তারা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে তাদের উগ্রতা প্রমাণের চেষ্টা করত। আবার কখনো কোনো আলিমের কথাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করাকে তারা শিরক বলে দাবি করত।

'নাসখ' একটি সুপরিচিত ইসলামী পরিভাষা। এর অর্থ রহিত হওয়া। মহান আল্লাহ কুরআন নাযিল করার মাধ্যমে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের অনেক বিধান রহিত করেছেন। এ ছাড়া কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন বিধিবিধান আংশিক বা পুরোপরি রহিত করে অন্য বিধান প্রদান করেছেন। তবে সাধারণভাবে আলিমগণ কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের অর্থের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য 'নাসখ' পরিভাষা ব্যবহার করেন। অর্থাৎ এ আয়াতের নির্দেশ গ্রহণ করতে হবে অন্য অমুক আয়াতের সাথে সমন্বয় করে। এ দ্বার তারা বুঝান না যে, কুরআনে পঠিত কোনো আয়াতের বিধান বা আদেশ পুরোপুরি বাতিল বা অর্থহীন হয়ে গিয়েছে। কারণ কুরআনের প্রতিটি আয়াত মুতাওয়াতির বা অগণিত মানুষের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর নিকট সংরক্ষিত। এর কোনো বিধান, বাক্য, অক্ষর বা অর্থকে রহিত দাবি করতে হলে ঠিক অনুরূপ মুতাওয়াতির কোনো নির্দেশনা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত হতে হবে। এ ছাড়া কুরাআনের কোনো নির্দেশ রহিত বলে গণ্য করা যায় না।

যেমন কুরআনে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন যে, ধর্মের বিষয়ে জবরদস্তি নেই। আবার আল্লাহ যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে কোনো কোনো আলিম বলেছেন যে, যুদ্ধের নির্দেশ দ্বারা জবরদস্তির নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়েছে। কথাটির অর্থ হলো ধর্মের মধ্যে জবরদস্তি নেই বলতে ধর্মীয় স্বাধীনতা বা অধিকার রক্ষার জন্যও যুদ্ধ করা যাবে না এরূপ মর্ম রহিত হয়েছে। এর অর্থ এ নয় যে, আয়াতটির নির্দেশনা রহিত হয়েছে। ইসলাম কখনোই বলপূর্বক ধর্মান্তর বা ধর্মের কারণে কারো নাগরিক অধিকার হরণের অনুমতি দেয় নি। জিহাদ, কিতাল বা যুদ্ধ ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা এবং রাষ্ট্র ও নাগরিকদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য, বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার জন্য নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে বা খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে তো নয়ই, পরবর্তী যুগেও ইসলাম গ্রহণের জন্য বল প্রয়োগের ঘটনা ঘটে নি।

জামাআতুল মুসলিমীন বা সমকালীন খারিজীগণ কুরআনকে তাদের সকল মতের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করলেও তাদের মতের ব্যতিক্রম আয়াত বা নির্দেশনাকে 'রহিত' বা মানসূখ বলে দাবি করত। তাদের এরূপ দাবির পক্ষে তারা কুরআন বা হাদীসের কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারত না। তবে কোনো কোনো আলিমের মতকে তারা প্রমাণ হিসেবে পেশ করত।

জামাআতুল মুসলিমীন পূর্ববর্তী ইমাম ও আলিমগণের বিষয়ে অত্যন্ত খারাপ মন্তব্য করত এবং দীনের বিষয়ে কোনো আলিমের কথাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করাকে অবৈধ বলে দাবি করত। কিন্তু নাসখ বিষয়ক মতামতের ক্ষেত্রে ও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজন মত তাদের মতের পক্ষে বিভিন্ন আলিমের মতামত পেশ করত। সর্বোপরি তারা অন্য কোনো আলিমের মতামত গ্রহণকে অপছন্দনীয় মনে করলেও তাদের নিজেদের মত গ্রহণকে অন্যদের জন্য বাধ্যতামূলক বলে মনে করত। দীনের বিষয়ে তাদের বুঝ বা মতামতকেই একমাত্র সত্য দীন বলে বিশ্বাস করত।

তাদের পছন্দ নির্ভরতার একটি বিশেষ দিক ছিল, সমকালীন বিভিন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্বের বক্তব্য ও লিখনিকে পছন্দমত দলীল হিসেবে পেশ করা। এ সকল গবেষক ও আলিম সমকালীন সমাজগুলির অবক্ষয় বুঝাতে অনেক সময় এগুলিকে "জাহিলী" বা "তাগূতী" বলেছেন। এদ্বারা তারা এগুলিকে কাফির বলে বুঝান নি। কিন্তু এরা তা বুঝেছে। কেউ কেউ সমাজ পরিবর্তনের কর্মকে

"জিহাদ" বলেছেন বা সবচেয়ে বড় দায়িত্ব বলে উল্লেখ করেছেন। এদ্বারা তারা বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন মাত্র; এ জাতীয় কর্মকে শরীয়তের পারিভাষিক জিহাদ বা শরীয়তের মাপকাঠিতে সবচেয়ে বড় ফরয বলে বুঝান নি। কিন্তু তারা তা বুঝেছে। কোনো কোনো গবেষক ও আলিম আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মান্য করার সাথে আল্লাহর আইন মান্য করার বিষয়টি সংযুক্ত করেছেন। এদ্বারা তারা বুঝান নি যে, ইলাহ মানেই হুকুম দাতা বা হুকুম না মানলেই কুফরী হয়। কিন্তু এরা তাদের মতপ্রতিষ্ঠায় এদের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছে। আবার তারা এ সকল আলিমের অন্য অনেক মত প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তাদের ভুল ব্যাখ্যার সংশোধনে অন্যান্য আলিমের মতামতও প্রত্যাখ্যান করেছে।

এখানে পছন্দ-নির্ভরতা ছাড়াও তাদের বিভ্রান্তির কারণ ছিল, কোনো আলিম বা গবেষকের বক্তব্যকে আক্ষরিকভাবে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা। মুমিন মূলত কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য আক্ষরিকভাবে প্রমাণ হিসেবে গণ্য করবেন। সুন্নাতে নববী ও সুন্নাতে সাহাবার আলোকে তা বুঝতে চেষ্টা করবেন। পরবর্তী ইমাম, ফকীহ ও আলিমদের বক্তব্য ও মতামতের সহযোগিতা নিবেন।

২. ৬. সুন্নাতই মুমিনের রক্ষাকবজ

খারিজী, বাতিনী, জামাআতুল মুসলিমীন ও অন্যান্য সকল বিভ্রান্ত দল ও গোষ্ঠীর বিভ্রান্তির মূল কারণ দীন পালনে "সুন্নাতের" প্রতি অবহেলা। সুন্নাতের অর্থ, পরিচয়, গুরুত্ব ও প্রয়োগ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি **"এহইয়াউস সুনান"** গ্রন্থে। এখানে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি যে, সুন্নাত অর্থ কর্মে ও বর্জনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুবহু অনুকরণ করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের ব্যাখ্যায়, পালনে ও পদ্ধতি গ্রহণে খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণের পদ্ধতিও সুন্নাত। কখনোই কোনোভাবে মুমিন নিজেকে সাহাবীগণ ও প্রথম প্রজন্মগুলির মানুষদের চেয়ে অধিক ঈমানদার, অধিক আমলকারী, ইসলাম সম্পর্কে অধিক অভিজ্ঞ বা ইসলাম বুঝার ক্ষেত্রে অধিক অগ্রসর বলে কল্পনা করতে পারেন না।

যে কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে যতটুকু বলেছেন ততটুকুই বলা, যে কর্ম তিনি যেভাবে যতটুকু গুরুত্ব দিয়ে যে পরিমাণ করেছেন ততটুকু গুরুত্ব দিয়ে সে পরিমান করা, যে কথা তিনি বলেন নি এবং যে কর্ম তিনি করেন নি তা না বলা ও না করাই সুন্নাত। কথায়, কর্মে, পালনে ও বর্জনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-হুবহু অনুকরণই সুন্নাত। তিনি যা বলেন নি তা বলা এবং তিনি যা করেন নি তা করা সুন্নাতের ব্যতিক্রম বা খিলাফে সুন্নাত। যে ইবাদত তিনি উন্মুক্তভাবে পালন করেছেন, অর্থাৎ কোনো নিয়ম, সময় বা রীতি নির্দিষ্ট করে দেন নি, সে ইবাদত উন্মুক্তভাবে পালন করাই সুন্নাত। কোনো নিয়ম, রীতি বা পদ্ধতিকে উক্ত ইবাদতের অংশ বলে গণ্য করা খিলাফে সুন্নাত।

তিনি যা বলেন নি বা করেন নি এবং বলতে বা করতে নিষেধও করেন নি তা সুন্নাতের ব্যতিক্রম হলেও জায়েয হতে পারে। আর তিনি যা বলেন নি বা করেন নি এবং বলতে বা করতে নিষেধ করেছেন তা না-জায়েয বা অবৈধ। সুন্নাতের ব্যতিক্রম জায়েয বিষয় মুমিন প্রয়োজনে করতে পারেন, তবে তাকে দীনের অংশ বলে কল্পনা করতে পারেন না। সুন্নাতের ব্যতিক্রম বা সুন্নাতের অতিরিক্ত কোনো কথা, কর্ম বা পদ্ধতিকে ঈমান, আকীদা, দীন বা ইবাদতের অংশ বলে গণ্য করা থেকেই সকল বিপর্যয় ও বিভ্রান্তির শুরু।

কুরআন-হাদীস থেকে কোনো ইবাদতের নির্দেশনা গ্রহণ করলেই হবে না, উপরন্তু সে ইবাদত রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে পালন করেছেন তা জানতে হবে এবং অবিকল তাঁরই অনুকরণে পালন করতে হবে। প্রয়োজনে উপকরণ বা জাগতিক বিষয়ে সুন্নাতের ব্যতিক্রম কোনো বিষয় বলা বা করা যেতে পারে, তবে তাকে উক্ত ইবাদতের অংশ হিসেবে গণ্য করা যাবে না এবং যথাসম্ভব সীমিত পর্যায়ে তা ব্যবহার করতে হবে। এ সকল বিষয় অগণিত উদাহরণসহ বিস্তারিত আলোচনা করেছি **"এহইয়াউস সুনান"** গ্রন্থে।

জঙ্গিবাদ, চরমপন্থা বা উগ্রতা মূলত ইসলামের একটি ইবাদতকে কেন্দ্র করে আবর্তিত, তা হলো: "অন্যের জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা"। ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়ের নিষেধ, দাওয়াত, জিহাদ, বিচার, দীন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি নামে এ ইবাদত পালিত হয়। বিভ্রান্তিতে নিপতিত মানুষেরা এ সকল ইবাদত পালনের নির্দেশ এবং এগুলির ফযীলত বিষয়ক আয়াত ও হাদীস গ্রহণ করেছেন, নিজেদের বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন এবং পালনের পদ্ধতি তৈরি করেছেন। এ সকল ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের হুবহু অনুকরণের চেষ্টা করেন নি।

সালাত, সিয়াম, যিকর, জানাযা ইত্যাদির ন্যায় দাওয়াত, জিহাদ, দীন প্রতিষ্ঠা, আদেশ, নিষেধ ইত্যাদিও ইবাদত। সকল ইবাদতই রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে পালন করেছেন। সাহাবীগণ তাঁর থেকে সরাসরি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন ও পালন করেছেন। পরবর্তী দু প্রজন্ম- যাদের নির্ভরযোগ্যতার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাক্ষ্য দিয়েছেন- তাঁরাও এ সকল ইবাদত পালন করেছেন।

আমরা যদি এ সকল ইবাদত সঠিকভাবে পালন করতে চাই, তাহলে আমাদের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে যে, আমরা যে ইবাদতের যে নামকরণ করছি, যে গুরুত্ব প্রদান করছি তা তারা করেছেন কিনা? আমরা যে পদ্ধতিকে ইবাদতের অংশ মনে করছি তা তারা করেছেন কিনা? আমরা যে পরিস্থিতিতে যে কথা বলছি বা যে কর্ম করছি সেরূপ পরিস্থিতি বা তার কাছাকাছি পরিস্থিতি তাদের কারো যুগে বিদ্যমান ছিল কিনা? এরূপ পরিস্থিতিতে তারা কি করেছেন? কিভাবে করেছেন?

বিভ্রান্তিতে নিপতিত মানুষেরা এ সকল বিষয় গভীরভাবে জানার কোনো চেষ্টা করেন নি। ফলে তারা বিশ্বাসগত, গুরুত্বগত বা পদ্ধতিগত বিভ্রান্তি ও বিদআতের মধ্যে নিপতিত হয়েছেন। আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে সুন্নাতের আলোকে তাদের বিভ্রান্তিগুলি অনুধাবনের চেষ্টা করব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বিভ্রান্তির তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

আমরা আগেই বলেছি, ধর্মীয় অনুভূতি মানুষের জন্মগত বা সহজাত অনুভূতি। একে নির্মূল করা যায় না এবং নির্মূলের প্রচেষ্টা বুমেরাং হয়। একে সঠিক ও স্বাভাবিক খাতে প্রবাহিত না করতে পারলে তা কখনো কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা বা অনৈতিকতার জন্ম দেয় এবং কখনো উগ্রতার জন্ম দেয়। এগুলির অপসারণ বা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রেক্ষাপটগুলি অনুধাবন প্রয়োজন।

আমরা দেখেছি যে, বিশ্বব্যপী মুসলিম নিধন, প্রতিকারের সকল পথ রুদ্ধ হওয়া, হতাশা ও পরিবর্তনের আবেগ অনেক মুসলিমকে উগ্রতার পথ বেছে নিতে উদ্বুদ্ধ করছে। কখনো বা মুমিন পারিপার্শিক অত্যাচার বা নিধনযজ্ঞের প্রতিকার করার কোনো পথ না পেয়ে উগ্র হয়ে পড়েন এবং উগ্রতার পক্ষে কিছু "দলিল-প্রমাণ" খুঁজে নেন। কখনো বা একজন মুসলিম নিজের আবেগে পড়াশোনা করতে যেয়ে এরূপ ব্যাখ্যা ও উগ্রতার মধ্যে নিপতিত হন। এরপর তিনি হয়ত অন্যদেরকেও প্রভাবিত করেন। কখনো বা অন্যের মুখে এরূপ ব্যাখ্যা শুনে প্রভাবিত হয়ে পড়েন। কখনো বা কোনো ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থ অর্জন করতে ইসলামী শিক্ষার বিকৃত উপস্থাপনের মাধ্যমে এরূপ উগ্রতার প্রসার ঘটাতে চেষ্টা করেন।

এছাড়া আমারা জানি যে,, ইহূদী ও খৃস্টান পণ্ডিতগণও কুরআন ও হাদীস ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করেছেন। তাদের পক্ষেও কুরআনের কিছু আয়াত, কিছু হাদীস বা কিছু ফিকহী মতামত বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে অজ্ঞ আবেগী যুবকদেরকে বিভ্রান্ত করা সম্ভব। আমরা দেখেছি যে, মুসলিম দেশগুলিকে অশান্ত করে তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক প্রবৃদ্ধি থামিয়ে দেওয়া, সভ্যতার সংঘাতের থিওরির সত্যতা প্রমাণ করা, "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" বা জঙ্গিবাদ দমনের নামে মুসলিম দেশগুলিকে দখল করা বা অধীনত রাখা, জঙ্গিবাদ দমনের নামে মুসলিম দেশগুলিতে ইসলামী মূল্যবোধ, ধর্মীয় অনুশাসন ও ইসলামী শিক্ষা সংকোচন করা, ধার্মিক মুসলিম ও আলিমগণের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করা ইত্যাদি বহুবিধ উদ্দেশ্যে ইহূদী-খৃস্টান ও ইসলাম-বিদ্বেষী পণ্ডিতগণ বা সংস্থা ইসলামের ছদ্মাবরণে এরূপ বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করতে পারেন।

ইসলামী শিক্ষার এ ধরনের বিকৃতি রোধে বিকৃতি সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে কুরআন, হাদীস, সাহাবীগণ ও তাঁদের পরের সকল যুগের আলিমগণের মতামত ও কর্মধারার আলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সমকালীন আলিম-উলামা, পীর-মাশাইখ, গবেষক ও সমাজসেবকদের সামষ্টিক চেষ্টা প্রয়োজন।

এখানে লক্ষণীয় যে, বিকৃতি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি আধুনিক। এ সকল বিষয়ে কুরআন, হাদীস ও পূর্ববর্তী আলিমগণের সুস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থহীন শিক্ষা ও মতামত না পাওয়াই স্বাভাবিক। যেমন, উপনিবেশোত্তর মুসলিম দেশগুলির বিধান, সমকালীন প্রেক্ষাপটে দারুল ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচয়, ধর্মরিনপেক্ষ অমুসলিম দেশগুলির বিধান, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্যবাদ, জাতীয়তাবাদ, পার্লামেন্ট, সার্বভৌমত্ব, ভোট ব্যবস্থা, এগুলিতে অংশ গ্রহণ বা বর্জন, সমকালীন মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের নেতৃত্বে জিহাদের বিধান, বিদেশী আগ্রাসনের শিকার মুসলিম দেশগুলির আগ্রাসন বিরোধী আন্দোলনের বিধান, এরূপ ক্ষেত্রে সশস্ত্র প্রতিরোধের বিধান ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক সমাধান দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতভেদ বা ভুল সিদ্ধান্ত অনেক মানুষকে কঠিন পাপের মধ্যে নিপতিত করতে পারে এবং উম্মাতের জন্য ধ্বংসাত্মক হতে পারে।

আমরা লক্ষ্য করি যে, এ সকল বিষয়ে সমাজের প্রাজ্ঞ ও সুপ্রসিদ্ধ পীর-মাশাইখ, আলিম ও মুফতীগণের মতামত কম পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে "চিন্তাবিদ" ও "আবেগী মুজাহিদগণ" এ সকল বিষয়ে ঝটপট অনেক সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেন। অনেকেই গতানুগতিক বা 'ট্রেডিশনাল' আলিম ও বুজুর্গদের দুর্বলতা বা অজ্ঞতাকে এর কারণ হিসেবে মনে করেন। অনেকে মনে করেন সমাজের সব অন্যায় মেনে নেওয়ার মানসিকতাই এর জন্য দায়ী। এরূপ মত নিঃসন্দেহে অজ্ঞতা ও আবেগপ্রসূত জুলম। বিগত দেড় হাজার বৎসর দীনের ঝাণ্ডাকে ধরে রেখেছেন আলিমগণ। তাঁদেরই মাধ্যমে আমরা দীন পেয়েছি। সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁরা সোচ্চার থেকেছেন। তবে সোচ্চার হওয়ার পদ্ধতিতে বিভিন্নতা ছিল।

বস্তুত এ সকল আধুনিক বিষয়ে "ট্রেডিশনাল" আলিম ও মুফতীগণের সুস্পষ্ট মতামত না থাকার কারণ আধুনিক হওয়াতে এগুলির বিষয়ে কুরআন-হাদীস ও পূর্ববর্তী আলিমগণের সুস্পষ্ট মতামত পাওয়া যায় না। আর প্রাজ্ঞ আলিমগণ এরূপ সুস্পষ্ট মতামতরে বাইরে ঝটপট কোনো সিদ্ধান্ত দিতে দ্বিধা করেন। পক্ষান্তরে একজন "চিন্তাবিদ" বা "আবেগী" মানুষ সাধারণত কুরআন-হাদীসের দু একটি সাধারণ বক্তব্যকেই তার মত প্রকাশের জন্য যথেষ্ঠ বলে গণ্য করেন; কাজেই সাহাবী-তাবিয়ীগণের মতামত বা পূর্ববর্তী ফকীহগণের মতামতের জন্য তিনি অপেক্ষা করেন না। এমনকি আয়াত বা হাদীসটি কতখানি প্রাসঙ্গিক বা তার বিপরীতে অন্য কোনো আয়াত বা হাদীস রয়েছে কিনা তাও তত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন না। আলিমগণের মতামত ধীর হলেও তাতে ভুলের সম্ভাবনা কম থাকে। আর চিন্তাবিদ বা আবেগী মানুষের মতামত খুবই দ্রুত ও সুস্পষ্ট হলেও তাদের ভুলের সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশি।

এছাড়া আমরা সমাজ সংস্কারে পূর্ববতী আলিম-উলামা ও পীর-মাশাইখের কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করলে দেখব যে, তাঁরা সর্বদা বিনম্রতা, ওয়ায-নসীহত ও জনমত তৈরির মাধ্যমে তা করতে চেষ্টা করেছেন, কখনোই দ্রুত ফল লাভের জন্য ব্যস্ত হন নি। তাদের কর্মধারার আলোকেই সমকালীন প্রসিদ্ধ আলিমগণ মতামত ব্যক্ত করেন। দ্রুত ফললাভে আগ্রহী আবেগী মানুষদের কাছে মনে হয়, এরূপ মতামত "সবকিছু মেনে নেওয়ার" শামিল। এভাবে কি আর কিছু পরিবর্তন করা যাবে? এদের কাছে চিন্তাবিদ ও আবেগী তরুণ মুফতীদের মতামত বেশি পছন্দনীয় বলে মনে হয়।

সকল আবেগ ও চাপের বাইরে থেকে কুরআন, হাদীস, সাহাবীগণের ও তৎপরবর্তী যুগের আলিমগণের কর্মধারার ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে এ সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। দ্রুত ফললাভ, প্রতিশোধ বা অন্য কোনো আবেগের অধীনে অথবা দেশ, দল, গোষ্ঠী বা কারো চাপের অধীনে কুরআন হাদীসের একপেশে সিদ্ধান্ত নিলে তা সঠিক হবে না এবং সংশ্লিষ্ট মানুষদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। উপরন্তু সিদ্ধান্ত ও মতামত প্রাসঙ্গিক তথ্যসমৃদ্ধ হতে হবে। এ ছাড়া যে সকল আয়াত ও হাদীসকে বিকৃতির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয় সেগুলির বিস্তারিত পর্যালোচনা প্রয়োজন।

বর্তমান যুগে এককভাবে গ্রহণযোগ্য আলিম যেমন দুর্লভ, তেমনি এ সকল বিষয়ে এককভাবে ইজতিহাদ করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন আলিমও দুর্লভ। এজন্য এ সকল বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আলিম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের মতবিনিময় ও সমবেত ইজতিহাদ প্রয়োজন। সমাজের গতানুগতিক অনেক বিষয়ের পাশাপাশি এ সকল বিষয়ে প্রাজ্ঞ আলিমগণের মতপ্রকাশ খুবই জরুরী। উম্মাতের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা ও দরদ নিয়ে আলিমগণকে একত্রে বসে মতবিনিময়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে। সমবেত মতবিনিময়ে নিজের মত, অভিরুচী, প্রয়োজন ও স্বার্থের উর্ধ্বে উম্মাতের বৃহত্তর কল্যাণে পূর্ববর্তী ইমাম ও আলিমগণের কর্মধারার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম চার প্রজন্মের এবং বিশেষ করে তিন প্রজন্মের নির্ভরযোগ্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। এরা হলেন সাহাবীগণ, তাঁদের ছাত্রগণ (তাবিয়ীগণ), তাঁদের ছাত্রগণ (তাবি-তাবিয়ীগণ) ও তাদের ছাত্রগণ (আতবা আতবায়িত তাবিয়ীন)। দীনের সকল বিষয়ে, বিশেষত মতভেদীয় ও জটিল বিষয়ে এ তিন ও চার প্রজন্মের আলিম, ফকীহ, ইমাম ও বুজুর্গগণের মতামতের ও কর্মধারার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অতীব প্রয়োজন।

৩. ১. বিভ্রান্তির সমকালীন প্রেক্ষাপট

খারিজী ও বাতিনীগণ কিছু মানুষকে বিভ্রান্ত করলেও সাধারণ মানুষদের মধ্যে তাদের বিভ্রান্তি প্রভাব ফেলতে পারে নি। কিন্তু বর্তমানে একদিকে বিশ্বব্যাপী মুসলিম নিধন, মুসলিম দেশগুলিতে ধার্মিক মানুষদের প্রতি বৈষম্য, হয়রানি ও জুলুম, ইসলামী অনুশাসন বিষয়ক দাবিদাওয়াকে গণতান্ত্রিক মতপ্রকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে দমন করার প্রচেষ্টা, অন্যদিকে তেমনি ইসলাম সম্পর্কে আবেগ ও ভালবাসার পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের ব্যবহারিক সুন্নাত সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবে তাদের উগ্র মতামত সমাজের অনেক ধার্মিক মানুষকে প্রভাবিত করছে।

নিঃসন্দেহে কুরআন ও হাদীস ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস এবং প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব নিজে কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা। সকল মুসলিম কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন করবেন, কিন্তু সকল মুসলিমই বিশেষজ্ঞ হবেন না। আরবী ভাষার গভীর জ্ঞান, কুরআনের পরিপূর্ণ অধ্যয়ন, বিশাল হাদীস ভাণ্ডারের সকল হাদীস অধ্যয়ন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবীগণের কর্ম, চিন্তা, মতামত ও কুরআন-হাদীস ব্যাখ্যার প্রক্রিয়া অধ্যয়ন ও সমস্যা সমাধানে সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণের মতামত ও কর্মধারা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভের পরেই একজন মানুষ প্রকৃত আলিম ও ফকীহ বলে গণ্য হন এবং ব্যক্তিগত, সামাজিক বা রাষ্ট্রিয় সমস্যার ক্ষেত্রে ইসলামী 'ফাতওয়া' বা সিদ্ধান্তদানের যোগ্যতা অর্জন করেন। স্বভাবতই এরূপ আলিমদের সংখ্যা সমাজে কম থাকে। এজন্য মুসলিম উম্মাহর আলিমগণের রীতি হলো, জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে সমকালীন প্রাজ্ঞ আলিমগণের মতামত গ্রহণের পাশাপাশি পূর্ববর্তী প্রখ্যাত আলিম, ফকীহ ও ইমামদের মতামতের অনুসন্ধান ও তাদের মতামতের আলোকে সিদ্ধান্ত প্রদান। এক্ষেত্রে তাঁরা কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনার আলোকে সাহাবীগণ ও তাঁদের পরবর্তী দুই প্রজন্মের আলিমদের মতামতের বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

এ মূলনীতি লঙ্ঘন করার কারণেই এ সকল উগ্র মতের জন্ম হয়। প্রাচীন ও নব্য খারিজীগণ সাহাবীগণের এবং তাঁদের পরে সমাজের মূলধারার আলিমগণের মতামত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। নিজেদের মতামতকেই তারা চূড়ান্ত বলে মনে করেছে। তবে তারা এরূপ মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির বিশেষ ক্ষমতা বা আল্লাহর সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক, কাশফ, ইলহাম, গোপন জ্ঞান ইত্যাদির কোনো দাবি করে নি। বাতিনীগণ ও শীয়াগণও সর্বদা সাহাবী, তাবিয়ী ও সমাজের মূলধারার মুসলিম আলিমগণকে অবজ্ঞা ও ঘৃণা করেছে এবং কুরআন বা ইসলাম সম্পর্কে নিজেদের "বুঝ"ই চূড়ান্ত বলে মনে করেছে। পাশাপাশি তারা বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ গোপন জ্ঞান, কাশফ, ইলহাম, ইলকা, ইলম-লাদুন্নী, আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক বা বিশেষ 'পদাধিকার' দাবি করেছে। ফলে এ সকল কল্পিত নেতা বা নেতাদের নামে অন্য কেউ তাদের কঠিন বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত করেছে। উভয় পদ্ধতিতেই তাদের মধ্যে ধার্মিকতা, ধর্মপালন ও ধর্মজ্ঞান সম্পর্কে অপ্রতিরোধ্য 'অহঙ্কার' সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে তারা ইসলাম সম্পর্কে তাদের বা তাদের নেতৃবৃন্দের ব্যাখ্যা বা মতকেই চূড়ান্ত সত্য বলে গ্রহণ করে বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়েছে।

বর্তমানে সঠিক ইসলামী শিক্ষার অনুপস্থিতি, বিশেষত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাদির বিষয়ে সঠিক ধারণার অনুপস্থিতিতে আবেগতাড়িত ধ্যানধারণার প্রসারের বিশেষ প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে:

(ক) গত প্রায় অর্ধ-সহস্র বৎসর যাবৎ মুসলিম উম্মাহর সকল দেশেই ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক মানগত অবনতি ঘটেছে। বিশেষত উপনিবেশাধীন সমাজে এবং এর পরে 'ইসলামী শিক্ষার' কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত মাদ্রাসগুলির শিক্ষার মান কমেছে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমর্থনের অভাব, মেধাবী শিক্ষার্থীর অভাব, গবেষণা উপকরণ ও পরিবেশের অভাব ইত্যাদি কারণে এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে বের হওয়া অধিকাংশেরই ইসলামী জ্ঞানের গভীরতা কম। সমাজ ও রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক সমর্থন ও মূল্যায়নের অভাবে গবেষণার সুযোগ থেকে তাঁরা বঞ্চিত। পূর্ববর্তী আলিমগণ যে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন সেগুলি পাঠ ও মুখস্থ করা হলেও, আধুনিক সমস্যাবলিতে ইজতিহাদ ও সমাধান দেওয়ার যোগ্যতা গড়ে তোলার মত কোনো পরিবেশ বা ব্যবস্থা

এ সকল প্রতিষ্ঠানে নেই বললেই চলে।

(খ) এ সকল ট্রেডিশনাল আলিমের পাশাপাশি বর্তমান যুগে আরেক শ্রেণীর ইসলামী চিন্তাবিদ রয়েছেন। এরা হচ্ছেন সে সকল 'সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রাপ্ত' শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী বা সাধারণ মানুষ জীবনের মাঝপথে এসে ধর্ম বিমুখতা থেকে ধার্মিকতার দিকে ফিরে আসেন। এ পর্যায়ে তাঁরা কুরআন, হাদীস ও ইসলামের ইতিহাস চর্চা শুরু করেন। এরা মূলত মেধাবী। এক সময়ে এদের অনেকে তাঁদের মেধা, মনন ও বুদ্ধি দিয়ে কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও 'ফাতওয়া' দিতে শুরু করেন। স্বভাবতই তাঁরা বিশাল হাদীস ভাণ্ডার, সাহাবীগণের কর্মপদ্ধতি ও পূর্ববর্তী আলিমগণের মতামত কিছুই জানেন না বা জানার গুরুত্বও অনুভব করেন না।

এ সকল চিন্তাবিদদের মধ্যে যারা আরব তারা সমকালীন আরবী ভাষা জানলেও কুরআন, হাদীস ও ইসলামী ফিকহের পরিভাষার সাথে ততটা পরিচিত নন। বিশেষ করে তাফসীর, হাদীস, ও ফিকহের বিশাল ভাণ্ডার তাদের কাছে একেবারেই অপরিচিত। আর এদের মধ্যে যারা অনারব তাদের অবস্থা আরো শোচনীয়। কুরআন-হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে তাঁরা মূলত অনুবাদ বা অনুবাদকের "বুঝ'-এর উপরেই নির্ভর করেন। তাঁদের জানা কুরআনের আয়াত এবং সীমিত কিছু হাদীসের শাব্দিক অর্থের সাথে নিজেদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও মননশীলতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তাঁরা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রদান করতে থাকেন। তাঁদের বাগ্মিতা, আধুনিক জগত ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁদের গভীর জ্ঞান সাধারণ মুসলিমদেরকে আকৃষ্ট করে। আধুনিক বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অনেক হলেও আরবী ভাষা, কুরআন, হাদীস, সাহাবীগণের কর্মধারা ও প্রাচীন ইমামগণের মতামতের বিষয়ে তাঁদের জ্ঞানের দৈন্যতা সুস্পষ্ট।

(গ) অধিকাংশ ক্ষেত্রে উভয় শ্রেণীর আলিম ও গবেষক একে অপরকে ভাল চোখে দেখেন না। এছাড়া সাধারণভাবে আলিম-উলামা ও গবেষকদের মধ্যে মতবিনিময়, গবেষণা, আলোচনা ইত্যাদির সুযোগ ও আগ্রহ নেই বললেই চলে। ফলে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, গণতন্ত্র, ভোটাধিকার, নির্বাচন, উপনিবেশোত্তর মুসলিম দেশগুলির ইসলামী অবস্থান, এগুলিতে পরিপূর্ণ ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি, এ সকল রাষ্ট্রের প্রতি মুসলিম নাগরিকের সম্পর্ক, রাষ্ট্র বা সরকারের দীন বিরোধী কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা ও ইসলামী সমাধান প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাপক অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। প্রত্যেকেই কুরআন ও হাদীস থেকে অল্প বা বেশি উদ্ধৃতি প্রদান করে একটি মত প্রকাশ করছেন। প্রায় সকল ক্ষেত্রে দলিল প্রদান প্রক্রিয়া খারিজীগণের মত হয়ে যাচ্ছে। সাধারণ কিছু আয়াত ও হাদীসের আলোকে মতামত প্রকাশ করা হলেও, যে বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা হচ্ছে, অনুরূপ কোনো বিষয় বা অবস্থা রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবীগণ বা তাবিয়ীগণের সময়ে ছিল কিনা এবং সেক্ষেত্রে তারা কি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, সেগুলি বিবেচনা করা হচ্ছে না। এভাবে ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন বিকৃত ধারণা জন্ম নিচ্ছে, যা ইসলামের নামে উগ্রতা সৃষ্টিতে সহায়তা করছে।

(ঘ) উপরের বিষয়গুলির পাশাপাশি রাষ্ট্র, প্রশাসন ও সমাজের অনাচার, পাপ, দুর্নীতি, নগ্নতা, অশ্লীলতা, জুলুম-অত্যাচার ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনেক আলিমের নীরবতা ও আলিম-উলামা ও পীর-মাশাইখের পারস্পারিক মতভেদ, দলাদলি ও গালাগালি সমাজের আবেগী যুবকদের হতাশ ও বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এ অবস্থায় উগ্রতার আহ্বানকারীদের নিষ্ঠা, সততা ও নির্ভীকতা তাদেরকে আকৃষ্ট করে।

খারিজীগণ, বাতিনী শিয়াগণ ও জামা'আতুল মুসলিমীন-এর বিভ্রান্তিআমরা কুরআন কারীম, সুন্নাতে নববী, সাহাবায়ে কেরামের কর্মপদ্ধতি এবং পূর্ববর্তী ইমাম, আলিম ও পীব-মাশাইখের কর্মধারার আলোকে পর্যালোচনা করতে চাই। কারণ ইসলামের নামে উগ্রতায় লিপ্ত মানুষদের তাত্ত্বিক বিভ্রান্তিগুলি প্রায় সবই একই প্রকৃতির। আমরা আল্লাহর তাওফীক প্রার্থনা করছি।

পূর্বোক্ত বিভ্রান্ত গোষ্ঠীগুলির মতামত ও দাবি-দাওয়া পর্যালোচনা করলে আমরা কয়েকটি বিষয় দেখতে পাই:

(১) নিজের জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেয়ে অন্যের জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া

(২) করণীয় ও বর্জনীয়ের মধ্যে পার্থক্য না বুঝা

(৩) ইসলামী শিক্ষার বিকৃত অনুধাবন ও উপস্থাপন।

৩. ২. নিজের জীবনে ইসলাম বনাম অন্যের জীবনে ইসলাম

ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে উগ্রতার পিছনে অন্যতম যে বিষয়টি দেখা যায় তা হলো, নিজের জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেয়ে অন্যের জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা। এটি আবেগপ্রসূত বিভ্রান্তিগুলির অন্যতম। দ্বীন প্রতিষ্ঠার দুটি পর্যায় রয়েছে: (১) নিজের জীবনে দীন প্রতিষ্ঠা করা এবং (২) অন্যের জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করা।

মুমিনের মূল দায়িত্ব নিজের জীবনে ও নিজের দায়িত্বাধীনদের জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামে নিজের জীবনে পালনীয় ইবাদতগুলিকে আরকানে ইসলাম, ফরয আইন বা সুন্নাত আইন হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দাওয়াত, আদেশ, নিষেধ, জিহাদ ইত্যাদি "অন্যের জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার" দায়িত্ব বিষয়ক ইবাদতগুলিকে মূলত 'ফরয কিফায়া' বা সামষ্টিক দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং সুযোগ ও সাধ্যের আলোকে কম বেশি পালনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির দায়িত্ব দাওয়াত দেওয়া। কেউ বা সকলে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলে বা অন্যায় পরিত্যাগ না করলে মুমিনের কোনোরূপ দায়বদ্ধতা থাকে না।

কিন্তু উগ্রতায় লিপ্ত মানুষদেরকে আমরা এর উল্টো পথে চলতে দেখি। তারা মূলত "অন্যের জীবনে দীন প্রতিষ্ঠাকে" ফরয

আইন ও বড় ফরয এবং নিজের জীবনে দীন পালনকে "ছোট ফরয" বা গুরুত্বহীন বলে মনে করেন। তারা অন্যের জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিগতভাবে হারাম-মাকরূহ কর্মে লিপ্ত হচ্ছেন এবং এরূপ হারাম-মাকরূহ কর্মে লিপ্ত হওয়াকে নানাভাবে বৈধ, বরং জরুরী বা ফরয বলে দাবি করছেন।

তাদের মনের একই চিন্তা, সমাজে বা দুনিয়ায় অমুক অন্যায় হচ্ছে, আল্লাহর আইনের বিরোধিতা হচ্ছে, আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করা হচ্ছে, কিভাবে নীরব থাকবে মুমিন। কাজেই যেভাবে পার ঝাপিয়ে পড়ে সব অন্যায় মিটিয়ে দিয়ে বিশ্বের সর্বত্র সকলের জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা কর।

বস্তুত এরূপ চিন্তা ভাল চিন্তার সাথে খারাপ চিন্তার সমন্বয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ মুমিনের মনে অবশ্যই থাকবে এবং মুমিন সাধ্যমত ইসলাম নির্দেশিত পথে তা প্রতিকারের চেষ্টা করবে বা দাওয়াত দিবে। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ মুমিনকে তাঁর নিজের ও নিজের দায়িত্বাধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাস করবেন, দুনিয়ার অন্য মানুষদের পাচাচার সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করবেন না। সাধ্যমত দাওয়াতের পরেও যদি মানুষ তা গ্রহণ না করে সে জন্য মুমিনের কোনোরূপ অপরাধ থাকে না। মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

"হে মুমিনগণ, তোমাদের উপরে শুধু তোমাদের নিজেদেরই দায়িত্ব। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তাহলে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না।"[৪৬]

বস্তুত সমাজ, রাষ্ট্রে ও বিশ্বে অন্যায়, পাপ ও অপরাধ থাকবেই, কখনো বেশি এবং কখনো কম। মুমিনের দায়িত্ব দাওয়াত দেওয়া, মুমিনের দায়িত্ব হিদায়াত করে ফেলা বা ভাল করে ফেলা নয়। মহান আল্লাহ তার মহান রাসূল (ﷺ)-কে বলেন:

إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

"তুমি যাকে ভালবাস তাকে তুমি হিদায়াত দিতে পারবে না; বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন।"[৪৭]

আল্লাহ আরো বলেন:

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

"আর তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাসী হবার নয়।"[৪৮]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

"তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলেই ঈমান আনত; তবে কি তুমি মুমিন হওয়ার জন্য মানুষদের উপর জবরদস্তি করবে?"[৪৯]

অনেক সময় আবেগী মুমিন সমাজের পাপাচারে বেদনাগ্রস্ত হয়ে দ্রুত সবকিছু ঠিক করে ফেলতে আগ্রহী হন। তিনি কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ ও মানবজাতির পরিচালনায় আল্লাহর সুন্নাতের কথা ভুলে যান। দ্রুত ফলাফল লাভের জন্য ব্যস্ত হয়ে যান। তিনি ভাবেন: ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে বা ইসলামের বিজয় আনতে হবে। অমুক বা তমুক পদ্ধতিতে তা আসবে না, বরং আমাদের এ পদ্ধতিতেই এ বিজয় দ্রুত হাতের মুঠোয় এসে যাবে। অমুক পদ্ধতিতে শত বৎসর বা হাজার বৎসর কাজ করলেও ইসলামের বিজয় আসবে না, কিন্তু আমাদের পদ্ধতিতে কাজ করলে অল্প সময়েই তা এসে যাবে। মনে হয় কে কত তাড়াতাড়ি ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারল এর উপরেই আল্লাহ নবী-রাসূল ও মুসলমানদের হিসাব নিবেন!!

ফলাফল লাভের উন্মাদনা আবেগী মুমিনকে বিপথগামী করে। মুমিন চায় যে, সমাজ থেকে ইসলাম বিরোধী ও মানবতা বিরোধী সকল অন্যায় ও পাপ দূরীভুত হোক। কোনো মুমিনের মনে হতে পারে যে, এত ওয়ায, বক্তৃতা, বইপত্র, আদেশ নিষেধ ইত্যাদিতে কিছুই হলো না, কাজেই মেরেধরে জোরকরে সব অন্যায় দূর করে ফেলতে হবে। তখন তিনি দাওয়াতের শরীয়ত সম্মত পদ্ধতি ও শরীয়ত নিষিদ্ধ পদ্ধতির মধ্যে বাছবিচার না করে ফলাফলের উন্মাদনায় শরীয়ত নিষিদ্ধ পদ্ধতিতে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করতে চেষ্টা করেন।

এ জাতীয় চিন্তভাবনা সবই কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষার সাথে সাংঘষিক। মুমিনের দায়িত্ব নিজের জীবনে দীন প্রতিষ্ঠা ও দীনের দাওয়াত। দাওয়াতের দ্রুত ফলাফলের চিন্তা তো দূরের কথা, কোনো ফলাফলের চিন্তাই মুমিনের দায়িত্ব নয়। অগণিত নবী-রাসূল আজীবন দাওয়াত দিয়েছেন, কিন্তু অতি অল্প কিছু সংখ্যক মানুষ তাদের দাওয়াত গ্রহণ করেছেন। এতে তাঁদের "দীন প্রতিষ্ঠার" বা "দাওয়াতের" দায়িত্ব পালনের কোনো ঘাটতি হয় নি।

পরবর্তী আলোচনা থেকে আমরা দেখব যে, "দ্রুত সকল অন্যায় মিটিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠার" জন্য উদগ্রীব মানুষেরা কখনই সত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি, বরং সুন্নাত পদ্ধতিতে ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়ের নিষেধ বা দাওয়াত ও দীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সমাজ সংস্কারের কর্ম সম্পাদিত হয়েছে।

কাজেই মুমিনের দায়িত্ব হলো নিজের জীবন দীন পালনের পাশাপাশি কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত পন্থায় দীনের দাওয়াত দেওয়া। দাওয়াতের দায়িত্ব দুভাবে আঞ্জাম দেওয়া হয়: (১) অরাষ্ট্রীয়, অর্থাৎ ব্যক্তিগত, দলগত বা গোষ্ঠীগতভাবে এবং (২) রাষ্ট্রীয়ভাবে। অরাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার একটিমাত্রই মাধ্যম, তা হলো 'দাওয়াত' বা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দাওয়াতের পাশাপাশি আরো দুটি মাধ্যম রয়েছে: (ক) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও (খ) প্রয়োজনে শত্রুরাষ্ট্রের কবল থেকে দীন, রাষ্ট্র, জনগণ, দুর্বল মুসলিম বা অমুসলিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জিহাদ বা কিতাল অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ করা।

সকল পর্যায়ে ও ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশ হলো সহিংসতা ও সীমালঙ্ঘন বর্জন করা। শুধু সহিংসতা বর্জনই নয়, দাওয়াত, প্রচার, সৎকাজে আদেশ, অন্যায় থেকে নিষেধ ইত্যাদি 'দ্বীন প্রতিষ্ঠার' সকল কর্মে 'অহিংসতা' দ্বারা 'সহিংসতা'-র প্রতিরোধ করতে এবং সহিংসতার প্রতিবাদে 'উত্তম' আচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

"কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা, যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি আত্মসমর্পনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। ভাল এবং মন্দ সমান হতে পারে না। (মন্দ) প্রতিহত কর উৎকৃষ্টতর (আচরণ) দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।"[৫০]

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে:

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ

"মন্দের মুকাবিলা করুন যা উৎকৃষ্টতর তা দিয়ে, তারা যা বলে আমি সে সম্পর্কে বিশেষ অবহিত।"[৫১]

বর্তমান বিশ্বে ইসলামী দা'ওয়াত বা ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অনেক সময় ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রতিরোধ, অত্যাচার বা সহিংস আচরণের সম্মুখীন হয়। এতে দা'ওয়াতে লিপ্ত মুসলিমের মধ্যে প্রতিক্রিয়ামূলক 'সহিংসতা'র আবেগ তৈরি হয়। এর সাথে 'দ্রুত ফললাভে' চিন্তা 'দাওয়াত' বা 'দ্বীন প্রতিষ্ঠা'র কর্মে রত ব্যক্তিকে ইসলাম নির্দেশিত এ 'অহিংস' পদ্ধতি পরিত্যাগ করে আবেগ নির্দেশিত 'সহিংস' পথে যাওয়ার প্ররোচনা দেয়। তিনি ভাবতে থাকেন 'সহিংসতা' বা কল্পিত 'জিহাদ'ই দ্রুত ফললাভের বা ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ, যদিও প্রকৃত সত্য এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামের ইতিহাসে ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর সহিংসতা, তথাকথিত 'জিহাদ' ও 'শাহাদতের' অনেক ঘটনা আছে। তারা সকলেই 'দ্রুত ফললাভের' আবেগ নিয়ে বৈধ বা কল্পিত 'জিহাদে' ঝাপিয়ে পড়ে 'শহীদ' হয়েছেন, কিন্তু কেউই দ্রুত বিজয় তো দূরের কথা কোনো স্থায়ী বিজয়ই অর্জন করতে পারেন নি। বস্তুত ইসলামের ইতিহাস প্রমাণ করে যে, 'অহিংস' ও 'মন্দের মুকাবিলায় উৎকৃষ্টতর' আচরণই ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের বিজয়ের একমাত্র পথ। এ পদ্ধতিতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ আরবের কঠোর হৃদয় যাযাবরদের হৃদয় জয় করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। পরবর্তী সকল যুগে এ পদ্ধতির অনুসরণকারী আলিম ও 'দাঈ'গণই ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে সর্বোচ্চ অবদান রেখেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করুন।

৩. ৩. করণীয় ও বর্জনীয়

মুমিন অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন, প্রতিকারের চেষ্টা করেন বা দাওয়াত দেন আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাওয়াবের জন্য, জাগতিক ফলাফল বা নিজের স্বার্থের জন্য নয়। কাজেই এক্ষেত্রে শরীয়ত সম্মত সুন্নাত পদ্ধতিতে দাওয়াত দিতে হবে, দাওয়াতের জন্য কোনো হারাম বা মাকরূহ কর্ম করা তো দূরের কথা, দাওয়াতের জন্য কোনো মুস্তাহাব কর্ম বর্জন করাও সুন্নাত বিরোধী। **"আল্লাহর পথে দাওয়াত"** পুস্তিকাতে আমি বিষয়টি আলোচনা করেছি।

কিন্তু এ সকল আবেগতাড়িত মানুষ অন্যের জীবনে বা সমাজে ও রাষ্ট্রে "ইসলাম প্রতিষ্ঠা"-র জন্য নিজের জীবনে "পাপ প্রতিষ্ঠা" করেন। ইসলামের মূলনীতি, পূন্য অর্জনের চেয়ে পাপ বর্জন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি যদি কোনো কর্ম ফরয হওয়া বা হারাম হওয়ার দ্বিবিধ সম্ভাবনা থাকে তবে তা বর্জন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ

"আমি যখন তোমাদেরকে কোনো কর্মের নির্দেশ প্রদান করি তখন তোমরা সে কর্মের যতটুকু পার পালন করবে। আর যখন আমি তোমাদেরকে কোনো কর্ম থেকে নিষেধ করি তখন তোমরা সে কর্ম সর্বোতভাবে বর্জন করবে।"[৫২]

খারিজীগণের বিভ্রান্তি অপনোদনে সাহাবীগণের বক্তব্যে আমরা বিষয়টি দেখতে পাব। অনেক সময় শয়তান আবেগের মাধ্যমে মুমিনকে এ মূলনীতি থেকে সরিয়ে নিয়ে সাওয়াবের নামে পাপে লিপ্ত করে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো দাওয়াত বা দীন প্রতিষ্ঠার নামে কোনো মানুষের অধিকার নষ্ট করা বা কারো সম্পদ, সম্ভ্রম বা প্রাণের সামান্যতম ক্ষতি করা। এভাবে মুমিন ইবাদত পালনের নামে কঠিনতম হারাম কর্মে লিপ্ত হন। ইবাদতটি যদি ফরযও হয় তাহলেও তা বিনা ওজরে ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করলে শুধু আল্লাহর হক্ক নষ্ট হয়, যা আল্লাহ তাওবা বা ওজরের কারণে ক্ষমা করবেন। কিন্তু এ ইবাদত পালনের নামে মানুষের হক্ক নষ্ট করলে বা ক্ষতি করলে তা কঠিন হারাম হওয়া ছাড়াও "বান্দার হক্ক" সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে তাওবা করলেও আল্লাহ তা ক্ষমা করেন না।

ইসলামের দৃষ্টিতে সবচেয়ে সম্মানিত বস্তু মানব জীবন ও মানুষের হক্ক বা অধিকার। মানুষকে আল্লাহ সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছেন। শুধুমাত্র 'আইনানুগ বিচার' অথবা 'যুদ্ধের ময়দান' ছাড়া অন্য কোনোভাবে কোনো মানুষকে হত্যা করা, সন্ত্রস্ত করা, আঘাত করা, কষ্ট দেওয়া বা কোনোভাবে কারো ক্ষতি করা, কারো সম্পদ বা সম্ভ্রমের সামান্যতম ক্ষতি করা কঠিনতম হারাম কর্ম। এ বিধান সর্বজনীন। কোনো ধর্মের কোনো মানুষকেই উপরের দুটি অবস্থা ছাড়া হত্যা করা, আঘাত করা বা কষ্ট দেওয়া যাবে না। কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে অগণিত নির্দেশনা রয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে 'মানব রক্ত' কঠিনতম হারাম। একমাত্র সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনে 'মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই' একজন মানুষের হত্যা বৈধ করা হয়েছে শুধু এ দুটি ক্ষেত্রে। এ দুটি বিষয়ই সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

আমরা খুব সহজেই বুঝি যে, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিচার, জিহাদ বা হত্যার অনুমতি থাকলে পৃথিবীর বুকে কোনো মানুষই বেঁচে থাকতে পারবে না। কারণ পৃথিবীর বুকে প্রায় প্রতিটি মানুষ অন্য কোনো না কোনো মানুষের দৃষ্টিতে জালিম, অনাচারী বা কাফির। কাজেই জুলম, অনাচার বা কুফরের কারণে যদি রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত স্বচ্ছ বিচারপদ্ধতি বা জিহাদের মাধ্যম ছাড়া ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে বিচার ও জিহাদের ক্ষমতা বা অধিকার ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে দুনিয়াতে কেউই বেঁচে থাকতে পারবে না।

বিচার ও জিহাদের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড বা হত্যার ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি যে, বিচারকের ভুলে নিরপরাধীর সাজা হওয়ার চেয়ে অপরাধীর বেঁচে যাওয়া বা সাজা কম হওয়া ভাল। অনুরূপভাবে জিহাদের নামে ভুল মানুষকে হত্যা করার চেয়ে জিহাদ না করা অনেক ভাল। জিহাদের নামে ভুল মানুষকে হত্যা করলে শত পুন্য করেও জান্নাত থেকে বঞ্চিত হতে হবে। পক্ষান্তরে সাধারণভাবে আজীবন জিহাদ না করলেও এরূপ শাস্তিলাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। বিশেষত জিহাদের গুরুত্ব অনুধাবন করা সত্ত্বেও জিহাদের শর্ত না পাওয়ায় জিহাদ বর্জন করলে কোনোরূপ গোনাহ হবে বলে কুরআন কারীমে বা হাদীস শরীফে কোথাও উল্লেখ করা হয় নি।[৫৩]

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাকে যদি নিহত হতে হয় সেও ভাল, তবে হত্যকারী হয়ো না। মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধ, সন্ত্রাস বা হানাহানির সময়ে করণীয় সম্পর্কে তিনি বলেন:

لْيَكُنْ عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُولُ، وَلاَ يَكُنْ عَبْدَ اللهِ الْقَاتِلُ... لْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ

"এরূপ পরিস্থিতিতে মুমিন নিহত হোক, কিন্তু সে যেন হত্যাকারী না হয়।" "সে যেন আদমের দু সন্তানের মধ্যে (হাবিল ও কাবিল) উত্তম জনের (হাবিলের) মত হয়।"[৫৪]

এ সকল নির্দেশনার কারণে সাহাবীগণ হত্যাকে ভয়ঙ্করভাবে ভয় পেতেন। খলীফা উসমান ইবনু আফ্ফান (রা) বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হলে সেনাবাহিনী এবং সমাজের নেতৃবৃন্দ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের ও অস্ত্রধারণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। ইসলামী শরীয়তে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বৈধ। কিন্তু উসমান (রা) বিদ্রোহীদের বুঝানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখেন, আর বিদ্রোহীরা সুযোগ পেয়ে তাকে হত্যা করে। উসমান (রা)-এর মূলনীতি ছিল, আমি নিহত হতে রাজি, কিন্তু কারো রক্তের দায়িত্ব নিয়ে আল্লাহর কাছে যেতে রজি নই।

৩. ৪. রাষ্ট্রীয় ফরয বনাম ব্যক্তিগত ফরয

ইসলম পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এজন্য কুরআন ও হাদীসে মানব জীবনের সকল দিকের বিধিবিধান বিদ্যমান। কোনো বিধান ব্যক্তিগতভাবে পালনীয়, কোনো বিধান সামাজিকভাবে বা রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনীয়। প্রত্যেক বিধান পালনের জন্য নির্ধারিত শর্তাদি রয়েছে। কুরআনে 'সালাত' প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবার কুরআনে 'চোরের হাত কাটার', 'ব্যভিচারীর বেত্রাঘাতের' ও জিহাদ বা কিতালের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথম ইবাদতটি ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনীয়। অন্য কেউ পালন না করলেও মুমিনকে ব্যক্তিগভাবে পালন করতেই হবে। কিন্তু দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ নির্দেশটি 'রাষ্ট্রীয় ভাবে' পালনীয়। কখনোই একজন মুমিন তা ব্যক্তিগতভাবে বা দলগতভাবে পালন করতে পারেন না।

এখানে লক্ষণীয় যে, কোনো ইবাদতের শর্তাবলি কুরআনে একত্রে বা একস্থানে উল্লেখ করা হয় নি। এছাড়া অধিকাংশ ইবাদতের সকল শর্ত কুরআনে উল্লেখ করা হয় নি। কুরআন ও হাদীসের সামগ্রিক বিধান বা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামগ্রিক জীবন ও এ সকল নির্দেশ পালনে তাঁর রীতি-পদ্ধতি থেকেই সেগুলির শর্ত ও পদ্ধতি বুঝতে হবে। তা নাহলে বিভ্রান্তিতে নিপতিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। মহান আল্লাহ বলেন:

أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ

"সূর্য হেলে পড়ার পর হতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে।"[৫৫]

এ নির্দেশের উপর নির্ভর করে যদি কেউ সূর্যাস্তের সময় সালাতে রত হন তবে তিনি নিজে যতই দাবি করুন, মূলত তা ইসলামী ইবাদাত বলে গণ্য হবে না, বরং তা পাপ ও হারাম কর্ম বলে গণ্য হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাদীস শরীফে 'সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাত্রি পর্যন্ত' সময়ের মধ্যে সালাত আদায়ের বৈধ ও অবৈধ সময় চিহ্নিত করেছেন এবং সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায় অবৈধ করেছেন। এভাবে আমরা দেখছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শিক্ষার বাইরে মনগড়াভাবে কুরআন কারীমের অর্থ বা ব্যাখ্যা করা আমাদেরকে ইবাদতের নামে পাপের মধ্যে লিপ্ত করে।

অনুরূপভাবে কুরআনে 'শাস্তি' ও 'কিতালের' নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআন-হাদীসে এ ইবাদত পালনের অনেক শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ যদি সেগুলি পূরণ না করে হত্যা, রক্তপাত ইত্যাদি কর্মে লিপ্ত হয়ে এগুলি জিহাদ বলে দাবি করেন, তবে তা কখনোই ইসলামী ইবাদাত বলে গণ্য হবে না, বরং তা হবে কঠিন পাপ ও হারাম কর্ম।

শর্ত পূরণ ছাড়া সালাত পালনের চেয়ে অনেক ভয়ঙ্কর পাপ শর্ত পূরণ ছাড়া শাস্তি, বিচার বা হত্যায় লিপ্ত হওয়া। সালাত ও বিচার-হত্যার মধ্যে পার্থক্য হলো, সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায় করলে উক্ত ব্যক্তি গোনাহগার হলেও, তাতে কোনো বান্দার হক নষ্ট হবে না। কিন্তু বিচার, শাস্তি ও কিতালের সাথে 'বান্দার' হক জাড়িত। কারো ভীতি প্রদর্শন, রক্তপাত বা সম্পদ নষ্ট করা কঠিনতম কবীরা গোনাহ, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষমা ছাড়া আল্লাহ ক্ষমা করেন না। কোনো মানুষকে হত্যার বিষয়ে সামান্য সহযোগিতা বা চোখের ইশারাও ভয়ঙ্কর পাপ বলে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

কাজেই রাষ্ট্রীয় অবকাঠামের মধ্যে আইনানুগ বিচারের বাইরে বা রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশে শত্রুবাহিনীর যোদ্ধাদের সাথে ঘোষিত ও আইনানুগ যুদ্ধের বাইরে যদি কেউ হত্যা, আঘাত, ভয় প্রদর্শন, সম্পদ-ধ্বংস ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হন, তবে ইবাদত কবুল না হওয়া এবং গোনাহগার হওয়া ছাড়াও তিনি বান্দার হক্ক নষ্ট করার ভয়ঙ্করতম পাপে লিপ্ত হবেন।

৩. ৫. বিচার ও হত্যা

বিচারের ক্ষেত্রে নরহত্যা, বিবাহিতের ব্যভিচার ও স্বেচ্ছায় বুঝে শুনে ইসলাম গ্রহণ করার পরে ইসলাম ত্যাগ করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিধান আছে। এ জন্য অনেক কঠিন শর্ত রয়েছে। বিচারক সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন মৃত্যুদণ্ড না দেওয়ার। অপরাধের পূর্ণতার বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহ থাকলেও আর মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা যাবে না। কারণ, বিচারকের ভুলে নিরপরাধের শাস্তি বা কম অপরাধীর বেশি শাস্তি হওয়ার চেয়ে অপরাধীর মুক্তি বা বেশি অপরাধের কম শাস্তি হওয়া বাঞ্চনীয়।

এ বিচার অবশ্যই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বিচারকের আদালতে যথাযথ সাক্ষ্য, প্রমাণ ও আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হতে হবে। মুমিনকে ন্যায়ের আদেশ এবং অন্যায়ের নিষেধ ও পরিবর্তন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাকে অন্যায়ের বিচার বা আইন হাতে তুলে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় নি। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ.

''তোমাদের কেউ যদি কোন অন্যায় দেখে তবে সে তার বাহুবল দিয়ে তা পরিবর্তন করবে। যদি তাতে সক্ষম না হয় তবে সে তার বক্তব্যের মাধ্যমে তা পবিবর্তন করবে। এতেও যদি সক্ষম না হয় তবে সে তার অন্তর দিয়ে তা পরিবর্তন (কামনা) করবে, আর এ ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়।''[৫৬]

প্রত্যেক মুমিনেরই দায়িত্ব অন্যায় দেখতে পেলে সাধ্য ও সুযোগ মত তার পরিবর্তন বা সংশোধন করা। যেমন মদপান একটি মুনকার বা অন্যায়। কেউ অন্য কাউকে মদপান করতে দেখলে সম্ভব হলে তা 'পরিবর্তন' করবেন। অর্থাৎ তিনি মদপান বন্ধ করবেন। তা সম্ভব না হলে তিনি মুখ দ্বারা তা নিষেধ করবেন। তাও সম্ভব না হলে তিনি অন্তর দিয়ে তা পরিবর্তন করবেন, অর্থাৎ তা পরিবর্তন করার পরিকল্পনা করবেন বা ঘৃণা করবেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই মুমিন 'মদপানের' অপরাধে উক্ত ব্যক্তিকে বিচার করতে বা শাস্তি দিতে পারবেন না। প্রয়োজনে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে আইনের হাতে সোপর্দ করবেন বা মদপানের ইসলামী শাস্তি প্রবর্তনের জন্য দাওয়াত অব্যাহত রাখবেন।

কাউকে কোনো অপরাধে লিপ্ত দেখে তাকে বিচারকের নিকট সোপর্দ করে যথাযথ প্রক্রিয়ায় আত্মপক্ষ সমর্থনের মাধ্যমে বিচার ছাড়া কেউ শাস্তি দিতে পারেন না। এ প্রক্রিয়ার বাইরে স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধান বিচারপতিও কাউকে শাস্তি দিতে পারেন না। খলীফা উমার (রা) আব্দুর রাহমান ইবনু আউফ (রা) -কে বলেন,

لَوْ رَأَيْتَ رَجُلا عَلَى حَدٍّ زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ وَأَنْتَ أَمِيرٌ فَقَالَ شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَالَ صَدَقْتَ

"আপনি শাসক থাকা অবস্থায় যদি কাউকে ব্যভিচারের অপরাধে বা চুরির অপরাধে রত দেখতে পান তাহলে তার বিচারের বিধান কী? (নিজের দেখাতেই কি বিচার করতে পারবেন?)" আব্দুর রাহমান (রা) বলেন, "আপনার সাক্ষ্যও একজন সাধারণ

মুসলিমের সাক্ষ্যের সমান।" উমার (রা) বলেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন।"[৫৭]

অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান নিজের হাতে বিচার তুলে নিতে পারবেন না। এমনকি তার সাক্ষ্যের অতিরিক্ত কোনো মূল্যও নেই। রাষ্ট্রপ্রধানের একার সাক্ষ্যে কোনো বিচার হবে না। বিধিমোতাবেক দুইজন বা চারজন সাক্ষীর কমে বিচারক কারো বিচার করতে পারবেন না।

অন্য ঘটনায় উমার (রা) রাত্রে মদীনায় ঘোরাফেরা করার সময় একব্যক্তিকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখতে পান। তিনি পরদিন সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করেন, যদি রাষ্ট্রপ্রধান কাউকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখতে পান তাহলে তিনি কি শাস্তি প্রদান করতে পারবেন? তখন আলী (রা) বলেন, কখনোই না। আপনি ছাড়া আরো তিনজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী যদি অপরাধের সাক্ষ্য না দেয় তাহলে আপনার উপরে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে।[৫৮]

৩. ৬. জিহাদ ও হত্যা

৩. ৬. ১. জিহাদ বিষয়ক অপপ্রচার

ইসলাম বিষয়ক বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারের মূলে রয়েছে "জিহাদ"। অনেক সময় বলা হয়, ধর্মই সকল হানাহানির মূল, ধর্মের নামেই রক্তপাত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। কী জঘন্য মিথ্যাচার!! এ কথা সত্য যে, অনেক সময় ধর্মকে হানাহানির হাতিয়ার বানানো হয়, আবার অনেক সময় ধর্ম সত্য ও ন্যায়ের স্বার্থে যুদ্ধের অনুমতি দেয়। কিন্তু কখনোই ধর্মের নামে সবচেয়ে বেশি রক্তপাত হয় নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কমুনিষ্ট চীনের সাথে কমুনিষ্ট ভিয়েতনামের যুদ্ধ, আমেরিকার সাথে ভিয়েতনামের যুদ্ধ ইত্যাদি যুদ্ধে কোটি কোটি মানুষ মরেছে। কম্পূচীয়ায় কমুনিষ্ট খেমার রূজের হাতে লক্ষলক্ষ মানুষের ভয়ঙ্কর মৃত্যু, জোসেফ স্টালিনের নির্দেশে প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষের হত্যা, মাওসেতুং-এর চীনে প্রায় দু কোটি মানুষের হত্যা, মুসোলিনির নির্দেশে ইটালির ৪ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ও এরূপ অগণিত মানুষের হত্যা সবই কি ধর্মের নামে হয়েছে?

কখনো বলা হয়, ইসলামই ধর্মের নামে "জিহাদ" বা "ধর্মযুদ্ধ" বৈধ করেছে। এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর কী হতে পারে? হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ মহাভারত ও রামায়ন পুরোটায় যুদ্ধ ও হানাহানি নিয়ে। গীতা ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে যুদ্ধের নির্দেশ রয়েছে। বাইবেলে বারংবার যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদে "বাইবেলীয় জিহাদ" ও "ইসালমের জিহাদ" বিষয়ে কিছু আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

জিহাদ বিষয়ক আরেকটি বিভ্রান্তি জিহাদকে "পবিত্র যুদ্ধ" বা "ধর্মযুদ্ধ" বলে আখ্যায়িত করা। জিহাদ অর্থ কখনোই "পবিত্র যুদ্ধ" (holy war) বা "ধর্মযুদ্ধ" (relegious war/crusade) নয়। পবিত্র যুদ্ধ, ধর্মযুদ্ধ, ক্রুসেড ইত্যাদি সবই খৃস্টান চার্চ ও যাজকদের আবিস্কৃত পরিভাষা। আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদে দেখব যে, ইসলামের পরিভাষায় জিহাদ অর্থ "রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ"। মুসলিম রাষ্ট্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় যুদ্ধকে ইসলামের জিহাদ বলা হয়েছে। সাধারণভাবে কাফির বা অমুসলিম রাষ্ট্রই মুসলিম রাষ্ট্রের শত্রুরাষ্ট্র; এজন্য জিহাদের ক্ষেত্রে শত্রুদেরকে "কাফির", "মুশরিক" বা অমুসলিম বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

জিহাদ বিষয়ে আরেকটি বিভ্রান্তি হলো, মুসলিমরা ধর্মপ্রচার বা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করে বা ইসলাম তরবারীর জোরে প্রচারিত হয়েছে বলে দাবি করা। এটি শুধু জঘন্য মিথ্যাই নয়, বরং প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত তথ্য। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, বাইবেলে ধর্মের কারণে মানুষ হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বারংবার বিধর্মীদের উপাসনালয় ভেঙ্গে ফেলার, দেশের বিধর্মী নাগরিকদের উৎসবে ডেকে এনে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করার ও নিরিহ বির্ধমীদের ধরে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৫৯] ৩২৫ খৃস্টাব্দে সম্রাট কনস্টানটাইন খৃস্টধর্মকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দেন। সেদিন থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত খৃস্টান চার্চ, পোপ, প্রচারক ও রাষ্ট্রগুলির ইতিহাস হলো রক্তের ইতিহাস। অধার্মিকতা বা heresy দমনের নামে অথবা ধর্ম প্রচারের নামে পরধর্ম অসহিষ্ণুতা, পরধর্মের প্রতি বিষোদ্গার, জোরপূর্বক ধর্মান্তর, অন্য ধর্মাবলম্বীদের হত্যা, নির্যাতন বা জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করা খৃস্টান ধর্মের সুপরিচিত ইতিহাস।

পক্ষান্তরে ইসলামে শুধু রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার জন্যই যুদ্ধ বৈধ করা হয়েছে, ধর্ম প্রচারের জন্য নয়। ইসলামে যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কখনোই অমুসলিম হওয়ার কারণে কাউকে হত্যা করা হয় নি বা জোরপূর্বক মুসলিম বানানো হয় নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদীনায় আগমনের পূর্বে তথাকার অনেকের সন্তান ইহূদী ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এরা ইসলাম গ্রহণের পরে তাদের সন্তানদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য চাপ প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে এরূপ চাপ প্রয়োগ থেকে নিষেধ করেন এবং তাদেরকে তাদের পছন্দের ধর্ম পালনের অধিকার প্রদান করেন।[৬০]

দীন প্রতিষ্ঠা বা দীন প্রচারের জন্য হত্যা, জিহাদ বা যুদ্ধ তো দূরের কথা কোনোরূপ শক্তিপ্রয়োগও নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেছেন:

لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Contents

"দীনে কোনো জবরদস্তি নেই। ভ্রান্তি থেকে সত্য সুস্পষ্ট হয়েছে। যে তাগূতকে অবিশ্বাস করবে এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করবে সে এমন এক মযবুত হাতল ধরবে যা কখনো ভাঙ্গবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা প্রজ্ঞাময়।"[৬১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

"যদি কোনো ব্যক্তি মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক বা মুসলিম দেশে অবস্থানকারী অমুসলিম দেশের কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে তবে সে জান্নাতের সুগন্ধও লাভ করতে পারবে না, যদিও জান্নাতের সুগন্ধ ৪০ বৎসরের দূরত্ব থেকে লাভ করা যায়।"[৬২]

বিধর্মীকে হত্যা তো দূরের কথা, বিধর্মীর সাথে অভদ্র আচরণ করতেও নিষেধ করা হয়েছে। তাদের ধর্মবিশ্বাস বা উপাস্যদেরকে গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে। মুসলিম তাঁর নিজের বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করবেন, তবে কারো গালি দিবেন না বা কারো অনুভূতি আহত করবেন না। কারণ এতে পারস্পারিক গালাগালিই বাড়বে। প্রত্যেকেই তো তার ধর্মকে ভালবাসে। আল্লাহ মানব প্রকৃতি এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। আর কারো ভক্তি ও ভালবাসা আহত করার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। মহান আল্লাহ বলেন:

وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না; কারণ এতে তারাও সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দিবে। এভাবেই আমি প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ সুশোভন করেছি; অতঃপর তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।"[৬৩]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

"তোমরা উত্তম পন্থায় ছাড়া অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের অনুসারীদের সাথে বিতর্ক করবে না, তবে তাদের মধ্যে যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তারা ব্যতিক্রম।"[৬৪]

জুইশ এনসাইক্লোপিডীয়া, অন্যান্য বিশ্বকোষ ও ইতিহাস প্রমাণ করে যে, বিগত দেড় হাজার বছরে ইউরোপের সকল খৃস্টান দেশে ইহূদীদের উপর বর্বর অত্যাচার করা হয়েছে, জোর পূর্বক তাদের ধর্মান্তরিত করা হয়েছে, তাদেরকে গণহারে হত্যা করা হয়েছে, তাদেরকে গণ-আত্মহত্যায় বাধ্য করা হয়েছে এবং নানভাবে তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। অথচ এ সময়ে মুসলিম দেশগুলিতে ইহূদীরা পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার নিয়ে বসবাস করেছেন।

প্রায় দেড় হাজার বৎসর ধরে মুসলিমগণ আরববিশ্ব শাসন করেছেন। সেখানে দেড় কোটিরও বেশি খৃস্টান ও কয়েক লক্ষ ইহূদী এখন পর্যন্ত বংশপরম্পরায় বসবাস করছে। ভারতে মুসলিমগণ প্রায় একহাজার বছর শাসন করেছেন, সেখানে প্রায় শতকরা ৮০ জন হিন্দু। অথচ খৃস্টানগণ যে দেশই দখল করেছেন, জোরযবরদস্তি করে বা ছলে-বলে সেদেশের মানুষদের ধর্মান্তরিত করেছেন অথবা হত্যা ও বিতাড়ন করেছেন।

ইসলাম যদি তরবারীর জোরেই প্রচারিত হবে তাহলে ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের সর্ববৃহৎ ইসলামী দেশ হলো কি করে? ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন্স, ব্রুনাই ও অন্যান্য দেশে তো কোনো মুসলিম বাহিনী কখনোই যায় নি। বিগত অর্ধ শতাব্দি যাবৎ ইসলাম The firstest growing religion বা সর্বাধিক বর্ধনশীল ধর্ম। ইউরোপ ও আমেরিকা-সহ সকল দেশের হাজার হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছেন। কোন্ তরবারীর ভয়ে তারা ইসলাম গ্রহণ করছেন?

৩. ৬. ২. ইসলামী শরীয়তে জিহাদ ও তার পূর্বশর্ত

'জিহাদ' অর্থ প্রচেষ্টা, সংগ্রাম, পরিশ্রম ইত্যাদি।[৬৫] আল্লাহর বিধান পালনের ও প্রচারের সকল শ্রম বা প্রচেষ্টাকেই কুরআন ও হাদীসে কখনো কখনো 'জিহাদ' বলা হয়েছে। যেমন, কাফির-মুনাফিকদের দাওয়াত দেওয়া ও তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদকে জিহাদ বলা হয়েছে।[৬৬] যালিম শাসকের সামনে সত্য ও ন্যায়ের কথা বলাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলা হয়েছে।[৬৭] হজ্জকে জিহাদ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলা হয়েছে।[৬৮] আল্লাহর আনুগত্য-মূলক বা আত্মশুদ্ধিমূলক যে কোনো কর্মের চেষ্টাকে জিহাদ বলা হয়েছে।[৬৯] তবে ইসলামী

পরিভাষায় ও ইসলামী ফিক্‌হে জিহাদ বলতে "কিতাল" বা মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় যুদ্ধকেই বুঝানো হয়। ফিকহের পরিভাষায় সর্বদা জিহাদ অর্থ কিতাল বলা হয়েছে।[৭০]

কতল অর্থ হত্যা করা। আর কিতাল অর্থ পরস্পরে যুদ্ধ। এজন্য জিহাদ বা কিতালের মূল শর্ত হলো সামনাসামনি 'যুদ্ধ'। পিছন থেকে হত্যা করা, না জানিয়ে হত্যা করা, গুপ্ত হত্যা করা এগুলি কখনোই ইসলামী কিতাল বা জিহাদ নয়। মদীনার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নেতৃত্বে মুসলিমগণ অনেক 'কিতাল' করেছেন। যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কাফিরদের দেশে যেয়ে গোপনে হত্যা, সন্ত্রাস, অগ্নি সংযোগ, বিষ প্রয়োগ ইত্যাদি কখনোই তিনি করেন নি বা করার অনুমতি প্রদান করেন নি।

দুই-একটি ক্ষেত্রে যুদ্ধরত সামরিক নেতা বা মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীকে যথাসম্ভব কম রক্তপাতে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে গোপন "কমান্ডো" অভিযান পারিচালনা করার অনুমতি দেন তিনি। কাব ইবনু আশরাফ ও আবূ রাফি সাল্লাম ইবনু আবিল হুকাইক-এর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে কমান্ডো অভিযান ছিল এ পর্যায়ের। এরূপ অভিযানের মাধ্যমে তিনি মুসলিম বাহিনী ও শত্রু বাহিনী উভয় পক্ষের হতাহতের সংখ্যা প্রায় শূন্যে আনতে সক্ষম হয়েছেন।[৭১] রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত এরূপ কমান্ডো হামলা ছাড়া অন্য কোনোভাবে যুদ্ধের ময়দান ও বিচার ছাড়া তিনি হত্যার অনুমতি দেন নি। এমনকি যুদ্ধের ময়দানেও অযোদ্ধাকে আঘাত করতে তিনি নিষেধ করেছেন।

কিতাল বা যুদ্ধের ক্ষেত্রে ইসলাম অনেক শর্ত আরোপ করেছে। সেগুলির অন্যতম (১) রাষ্ট্রের বিদ্যমানতা ও রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি, (২) রাষ্ট্র বা মুসলিমদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া, (৩) সন্ধি ও শান্তির সুযোগকে প্রাধান্য দেওয়া ও (৪) কেবলমাত্র যোদ্ধা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা।

(১) রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমোদন

ইসলামে জিহাদের বৈধতার সর্বপ্রথম শর্ত হলো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। কিতাল বা জিহাদ কখনোই ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যম নয়। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র মাধ্যম 'দা'ওয়াত' বা প্রচার। কিতাল হলো প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সংরক্ষণ, রাষ্ট্র ও নাগরিকদের নিরাপত্তার মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। দাওয়াতের বিরুদ্ধে অমানবিক বর্বরতা ও সহিংস প্রতিরোধকে তিনি পরিপূর্ণ অহিংস উত্তম আচরণ দিয়ে মুকাবিলা করেছেন। আবূ বাকর, উমার, উসমান, আব্দুর রাহমান ইবনু আউফ ও মক্কার আরো অনেক শীর্ষস্থানীয় সামাজিক নেতা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাদের সাথে সাধারণ অনেক মুসলিম ছিলেন। তাঁরা সর্বদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অনুমতি চেয়েছেন কাফিরদের সহিংস আচরণকে প্রতিরোধ করতে বা তাদের বর্বরতার প্রতিবাদে অস্ত্র তুলে নিতে। কিন্তু কখনোই সে অনুমতি দেওয়া হয় নি।

এক পর্যায়ে দাওয়াতের ভিত্তিতে মদীনার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ইসলামী জীবনব্যবস্থা মেনে নেন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তাঁদের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে গ্রহণ করেন। এভাবে দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুশরিকগণ এ নতুন রাষ্ট্রটিকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চেষ্টা করে। তখন রাষ্ট্র ও নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জিহাদের বিধান প্রদান করা হয়। রাষ্ট্রের বিদ্যমানতা ও রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি বা নির্দেশ জিহাদের বৈধতার শর্ত বলে উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ

"রাষ্টপ্রধান ঢাল, যাকে সামনে রেখে যুদ্ধ পরিচালিত হবে।"[৭২]

এজন্য আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবীগণ রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের বাইরে যুদ্ধ বা কিতালে লিপ্ত হন নি। আলী (রা)-এর সাথে মু'আবিয়া (রা)-এর যুদ্ধ ছিল রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ। ইয়াযিদের বিরুদ্ধে ইমাম হুসাইনের যুদ্ধ ও উমাইয়া শাসকদের সাথে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের যুদ্ধ ছিল একান্তই রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ। মুআবিয়ার (রা) মৃত্যুর পরে কূফাবাসীগণ ইমাম হুসাইনকে (রা) রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বাইয়াত করে পত্র লিখেন। তারা ইমাম হুসাইনকেই বৈধ রাষ্ট্রপতি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং ইয়াযিদের রাষ্ট্রক্ষমতার দাবি অস্বীকার করেন। এভাবে মুসলিম সমাজ দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের (রা) ক্ষেত্রেও বিষয়টি একইরূপ ছিল।

এ সকল বৈধ রাষ্ট্রীয় যুদ্ধও যেহেতু মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হতো, সেজন্য সাহাবীগণ সাধারণত এগুলিতে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতেন, যদিও তাঁরা মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক বিদ্রোহী মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বৈধতা স্বীকার করতেন। আমরা দেখেছি যে, আলী (রা)-এর সময়ের যুদ্ধে ৩০ জনেরও কম সাহাবী অংশ নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ইবনু সিরীন, যদিও তখন হাজার হাজার সাহাবী জীবিত ছিলেন।

৭৩ হিজরীতে হাজ্জাজ ইবনু ইউসূফ যখন মক্কা অবরোধ করে ইবনু যুবাইরের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক আক্রমন চালাতে থাকে, তখন দুই ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা)-এর নিকট এসে বলে,

إِنَّ النَّاسَ ضُيِّعُوا، وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ فَقَالَ يَمْنَعُنِي أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ دَمَ

أَخِي، وفي رواية: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَحُجَّ عَامًا وَتَعْتَمِرَ عَامًا وَتَتْرُكَ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ عَلِمْتَ مَا رَغَّبَ اللَّهُ فِيهِ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ إِيمَانٍ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالصَّلاةِ الْخَمْسِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَأَدَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ

মানুষেরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আপনি ইবনু উমার, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী, আপনাকে বেরিয়ে যুদ্ধে অংশ নিতে বাধা দিচ্ছে কিসে? তিনি বলেন, "আল্লাহ আমার ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছেন, এ-ই আমাকে যুদ্ধে অংশ নিতে বাধা দিচ্ছে।" অন্য বর্ণনায় তারা বলে, "কি কারণে আপনি এক বছর হজ্জ করেন আরেক বছর উমরা করেন এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ পরিত্যাগ করেন? অথচ আপনি জানেন যে, আল্লাহ জিহাদের জন্য কী পরিমাণ উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন?" তখন আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, "ভাতিজা, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাঁচটি বিষয়ের উপরঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রামাযানের সিয়াম, যাকাত প্রদান ও বাইতুল্লাহর হজ্জ।"[৭৩]

এখানে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) জিহাদের আদেশ ও হত্যার নিষেধাজ্ঞার মধ্যে তুলনা করছেন। ইসলামের মূলনীতি, আদেশ পালনের চেয়ে নিষেধ বর্জন অগ্রগণ্য।[৭৪] বিশেষত এ ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ কর্মটি কুরআন-হাদীসে বারংবার ভয়ঙ্করতম কবীরা গোনাহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়া জিহাদ আরকানে ইসলামের মত মুমিনের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয় বা উদ্দিষ্ট (Aimed at; intended) ইবাদত নয়; বরং তা উদ্দিষ্ট ইবাদতগুলি পালনের উপকরণ (accessory; equipment; apparatus) মাত্র। জিহাদের মাধ্যমে মূল ইবাদগুলি পালনের পরিবেশ রক্ষা করা হয়। পরিবেশ বিদ্যমান থাকলে আর জিহাদের প্রয়োজন থাকে না। উদ্দিষ্ট ইবাদত কখনো স্থগিত হয় না; উপকরণ স্থগিত হতে পারে। সালাত, সিয়াম ইত্যাদি ইবাদত সর্বদা সর্বাবস্থায় পালনীয়। পক্ষান্তরে "জিহাদ" কেবলমাত্র এ সকল ইবাদত পালনের বিঘ্ন ঘটলেই পালনীয়।

সালাত, সিয়াম, তিলাওয়াত, যিক্র ইত্যাদি কর্ম সরাসরি ইবাদত। মুমিন যত বেশি পালন করবেন ততবেশি সাওয়াব লাভ করবেন। পক্ষান্তরে জিহাদ হলো অপরাধীর শাস্তি দেওয়ার মত ইবাদত। এক্ষেত্রে যত বেশি অপরাধীর শাস্তি দেওয়া হবে তত বেশি সাওয়াব হবে বলে মনে করার কোনো সুযোগ নেই। যদি অপরাধ প্রমাণিত হয় তাহলে শরীয়ত অনুসারে শাস্তি প্রদান ইবাদত বা দায়িত্বে পরিণত হয়। এজন্য ইসলামে শাস্তি প্রদান প্রক্রিয়া কঠিন করা হয়েছে এবং সামান্যতম সন্দেহের ক্ষেত্রে শাস্তিপ্রদান থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। আর এজন্যই জিহাদ এড়ানোর জন্য ইসলামে সন্ধি ও শান্তিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদে তা আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, জিহাদ মূলত ইসলামী রাষ্ট্রের সংরক্ষণ ও ইসলামী দাওয়াতকে এগিয়ে নেওয়ার "উপকরণ"। প্রয়োজনে তা অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। তবে সর্বাবস্থায় চেষ্টা করতে হবে এ ব্যবস্থা এড়িয়ে সন্ধি বা শান্তির মাধ্যমে মূল উদ্দেশ্য সাধান করার।

জিহাদের বারংবার আদেশ করা হলেও তার জন্য অনেক শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, তাকে ফরয আইন বলে কোথাও উল্লেখ করা হয় নি এবং তা পরিত্যাগের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কাজেই পরিত্যাগযোগ্য একটি কম পালনের জন্য মুমিন কখনোই ভয়ঙ্করতম একটি হারামে লিপ্ত হতে পারেন না। এক্ষেত্রে তাঁদের মূলনীতি ছিল যে, ভুল জিহাদের মানুষ হত্যা বা মানুষের ক্ষতি করার চেয়ে সঠিক জিহাদ বর্জন করা অনেক শ্রেয়।

এভাবে আমরা দেখি যে, সাহাবীগণ সন্দেহের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে বৈধ জিহাদেও অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতেন। আর রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের বাইরে কখনোই কোনো যুদ্ধ তারা বৈধ বলে মনে করেন নি। খারিজীগণের আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক হাদীসগুলিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ খারিজীদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি তিনি বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে পাবে তারা যেন তাদেরকে হত্যা করে।" সাহাবীগণ এ থেকে কখনোই বুঝেন নি যে, খারিজীদেরকে পেলেই হত্যা করতে হবে। তাঁরা কখনোই যুদ্ধের ময়দান ছাড়া অন্যত্র কোনো সুপরিচিত খারিজী নেতাকেও হত্যা করেন নি।[৭৫]

(২) রাষ্ট্র বা মুসলিমের নিরাপত্তা

কিতালের অন্যতম শর্ত, শত্রুপক্ষ রাষ্ট্র আক্রমণ করবে বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হবে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا

"যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে।"[৭৬]

মুসলিম রাষ্ট্রের ও নাগরিকগণের নিরাপত্তা ছাড়াও অন্যদেশের নির্যাতিত মুসলিম নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়ানো মুসলিম রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আর এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও জিহাদের প্রয়োজনে হতে

পারে। যদি অন্য দেশের মুসলিম নাগরিকগণ কোনো মুসলিম দেশের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং সে দেশের সাথে মুসলিম দেশের কোনো চুক্তি বা কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকে তাহলে মুসলিম রাষ্ট্র প্রয়োজনে সে দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারে বা তাদেরকে নির্যাতন থেকে রক্ষার ব্যবস্থা নিতে পারে। আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“নিশ্চয় যারা ঈমন এনছে, হিজরত করেছে (অমুসলিম সমাজ পরিত্যাগ করে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে) এবং নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে তারা একে অপরের অভিভাবক-বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের অভিভাবকত্বের (সাহায্যের) কোনোরূপ দায়িত্ব তোমাদের নেই, যতক্ষণ না তারা হিজরত করে। আর যদি তারা দীনের বিষয়ে তোমাদের নিকট কোনো সাহায্য চায় তবে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। তবে এরূপ জাতির বিরুদ্ধে নয় যাদের সাথে তোমাদের পারস্পরিক চুক্তি রয়েছে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিমান।”[৭৭]

(৩) সন্ধি ও শান্তির সুযোগ গ্রহণ

আমরা দেখেছি যে, জিহাদ উদ্দিষ্ট ইবাদত নয়, উদ্দিষ্ট ইবাদত পালনের পরিবেশ রক্ষার উপকরণ। জিহাদের উদ্দেশ্য রাষ্ট্র, নাগরিক ও ইসলামী দাওয়াতের নিরাপত্তা রক্ষা করা। এ উদ্দেশ্য যদি জিহাদ ছাড়া অর্জিত হয় তবে তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এজন্য ইসলামে সন্ধি ও শান্তির সুযোগ গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“আর যদি তারা সন্ধির প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তবে তুমিও তার প্রতি ঝুঁকে পড়, আর আল্লাহর উপর নির্ভর কর, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।”[৭৮]

হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনা কুরআন ও হাদীসের আলোকে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে, ইসলামী রাষ্ট্রের সংরক্ষণ, দাওয়াতের প্রসার ও দীনের বিজয়ে জিহাদের চেয়েও সন্ধির অবদান ছিল অনেক বেশি। জাগতিক বিচারে এ সন্ধি ছিল অপমানজনক, অবমাননাকর এবং কাফিরদেরকে সকল ছাড় দেওয়া। যে কোনো আবেগী বিচারে এ ছিল “সব কিছু মেনে নেওয়া”। উমার (রা) ও অধিকাংশ সাহাবীই এরূপ ভেবেছেন। এ সময়ে মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সকল অধিকার তাদের ছিল এবং যুদ্ধে জয়ী হওয়ার সকল সুযোগ ও সম্ভাবনাও ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্ধিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং কাফিরদের সকল দাবি মেনে নিয়ে সন্ধি করেছেন। আর ইসলামের কোনো জিহাদ, গাযওয়া, যুদ্ধ, অভিযান বা বিজয়কে “ফাতহ মুবীন” বা সুস্পষ্ট বিজয় বলা হয় নি। কিন্তু এ “সব কিছু মেনে নেওয়ার” সন্ধিকে কুরআনে “ফাতহ মুবীন” বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সন্ধি ও শান্তি রক্ষায় রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। এর একটি প্রকাশ হুদায়বিয়ার সন্ধি রক্ষার্থে নির্যাতিত মুসলিমদেরকে কাফিরদের হাতে ছেড়ে দেওয়া। এ ছিল এমন একটি সিদ্ধান্ত যা প্রায় সকল সাহাবীকে বিক্ষুদ্ধ করেছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এ চুক্তি রক্ষায় অনড় ছিলেন। সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ে হুদাইবিয়ার ময়দানেই আবূ জানদাল (রা) নামক একজন নির্যাতিত মুসলিম শৃঙ্খলিত অবস্থাতেই মক্কা থেকে পালিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ শর্ত মেতাবেক তাকে মক্কাবাসীদের হাতে সমর্পন করেন। উপস্থিত সাহাবীগণ এ বিষয়ে খুবই আবেগী হয়ে উঠেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। এরপর আরেক নির্যাতিত মুসলিম আবূ বাসীর (রা) মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকেও ফিরিয়ে দেন।

একপর্যায়ে আবূ বাসীর (রা), আবূ জানদাল (রা) ও আরো অনেক নির্যাতিত মুসলিম মক্কা থেকে পালিয়ে সিরিয়ার পথে ‘ঈস’ নামক স্থানে সমবেত হন। সন্ধিচুক্তির কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে মদীনার নাগরিক হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন নি। আর মদীনা রাষ্টের সাথে মক্কাবাসীদের সন্ধি থাকলেও এ নতুন জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের সন্ধি ছিল না; বরং তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছি। এ অবস্থায় তাঁরা সিরিয়াগামী কুরাইশ কাফিলাগুলির উপর আক্রমন চালাতে থাকেন। মক্কাবাসীরা বুঝতে পারে যে, এদেরকে মদীনা রাষ্টের নাগরিক মেনে সন্ধিচুক্তির অন্তর্ভুক্ত করাই তাদের জন্য নিরাপদ। তাদেরই অনুরোধে রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্ধিচুক্তির সংশ্লিষ্ট শর্তটি বাতিল করে তাঁদেরকে মদীনায় আশ্রয় গ্রহণের ব্যবস্থা করেন।[৭৯]

এভাবে সকল প্রকার আবেগ ও বেদনা নিয়ন্ত্রণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্ধি ও শান্তি রক্ষার চেষ্টা করেছেন।

যুদ্ধ বা হত্যা এড়িয়ে শান্তির লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইসলামে রাষ্ট্রীয় যুদ্ধের ক্ষেত্রেও যুদ্ধ শুরুর পূর্বে শান্তির সুযোগ দানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শত্রুবাহিনীকে সন্ধি, আত্মসমর্পন, ইসলাম গ্রহণ, জিযিয়া বা কর প্রদান ইত্যাদির সুযোগ দিতে হবে। এছাড়া যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে, যুদ্ধ চলাকালে একেবারে অস্ত্রাঘাতের সময়ও যদি কোনো শত্রু সৈন্য নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে তবে

তাকে আর আঘাত করা যাবে না। বস্তুত একজন ডাক্তার যেমন সর্বাত্মক চেষ্টা করেন রোগীর অঙ্গচ্ছেদ না করে চিকিৎসা করার- একান্ত বাধ্য হলেই কেবল তার কোনো অঙ্গ কেটে প্রাণ বাচানোর চেষ্টা করেন; তেমনি ইসলামে সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে প্রতিটি মানুষের প্রাণ রক্ষা করার।

(৪) কেবলমাত্র যোদ্ধা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত

কিতালের অন্য শর্ত, শুধু যারা যুদ্ধ করতে অস্ত্রধারণ করে সামনে এসেছে তাদেরই সাথে যুদ্ধ করতে হবে।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর তাদের সাথে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে। কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করবে না, আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।"[৮০]

এ নির্দেশের মাধ্যমে ইসলাম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও যুদ্ধের নামে অযোদ্ধা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা, অযোদ্ধা মানুষদেরকে হত্যা করা ইত্যাদি সন্ত্রাসের পথ রোধ করেছে। যোদ্ধা ছাড়া কারো সাথে যুদ্ধ করা যাবে না এবং যুদ্ধের ক্ষেত্রেও সীমালঙ্ঘন, আগ্রাসন ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে হাদীসের নির্দেশঃ

لا تَغْدِرُوا وَلا تُمَثِّلُوا وَلا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَلا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ ... وَلاَ رَاهِباً...وَلاَ امْرَأَةً وَلاَ شَيْخاً كَبِيْراً... وَلاَ تَذْبَحُوْا بَعِيْراً وَلاَ بَقَرَةً إِلاَّ لِمَأْكَلٍ ... وَلاَ تُخَرِّبُوْا عِمْرَاناً وَلاَ تَقْطَعُوْا شَجَرَةً إِلاَّ لِنَفْعٍ... وَأَحْسِنُوْا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

"যুদ্ধে তোমরা প্রতারণা বা ধোঁকার আশ্রয় নেবে না, চুক্তিভঙ্গ করবে না, কোনো মানুষ বা প্রাণীর মৃতদেহ বিকৃত করবে না বা অসম্মান করবে না, কোনো শিশু-কিশোরকে হত্যা করবে না, কোনো মহিলাকে হত্যা করবে না, কোনো গীর্জাবাসী, সন্ন্যাসী বা ধর্মযাজককে হত্যা করবে না, কোনো বৃদ্ধকে হত্যা করবে না, কোনো অসুস্থ মানুষকে হত্যা করবে না, কোনো বাড়িঘর ধ্বংস করবে না, খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া গরু, উট বা কোনো প্রাণী বধ করবে না, যুদ্ধের প্রয়োজন ছাড়া কোনো গাছ কাটবে না...। তোমরা দয়া ও কল্যাণ করবে, কারণ আল্লাহ দয়াকারী- কল্যাণকারীদেরকে ভালবাসেন।[৮১]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর জীবনের সকল যুদ্ধে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন যথাসম্ভব কম প্রাণহানি ঘটাতে। শুধু মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক ও যোদ্ধাদের জীবনই নয়, উপরন্তু তিনি শত্রুপক্ষের নাগরিক ও যোদ্ধাদেরও প্রাণহানি কমাতে চেয়েছেন। বস্তুত ইসলাম যুদ্ধকে যে মানবিক রূপ প্রদান করেছে তা অন্য কোনো ধর্মেই পাওয়া যায় না।

উপর্যুক্ত শর্তাবলির বিদ্যমানতায় জিহাদ শরীয়ত সম্মত ইবাদতে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে জিহাদ আত্মরক্ষামূলক (defensive) হতে পারে। আবার তা আক্রমনাত্মক বা নিবৃত্তিমূলক (offensive/preemptive) হতে পারে। রাষ্ট্র প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

৩. ৬. ৩. জিহাদের ফযীলত ও বিধান

নিঃসন্দেহে জিহাদের মাধ্যমে জীবন ও সম্পদ কুরবানী দেওয়া অত্যন্ত বড় ত্যাগ এবং মানবীয় প্রকৃতির জন্য খুবই কষ্টকর। এজন্য এ ইবাদতের সাওয়াব ও পুরস্কারও অভাবনীয়। কুরআন ও হাদীসে জিহাদের অফুরন্ত সাওয়াব ও পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে এবং জিহাদের ইবাদত পালনের জন্য বিশেষ উৎসাহ ও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ সকল আয়াত ও হাদীসের অর্থ জিহাদ যখন বৈধ বা শরীয়ত সম্মত হবে তখন যে ব্যক্তি মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে উঠে জিহাদের দায়িত্ব পালন করবে তখন সে এ অভাবনীয় পুরস্কার লাভ করবে।

এছাড়া জিহাদের আবেগ ও আগ্রহ মুমিনের হৃদয়ে থাকবে। জিহাদের মাধ্যমে জীবন ও সম্পদের কুরবানীর প্রতি অনীহা ঈমানের দুর্বলতা প্রমাণ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

"যদি কেউ এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি এবং যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণের কোনো কথাও নিজের মনকে কখনো বলে নি, তবে সে ব্যক্তি মুনাফিকীর একটি শাখার উপর মৃত্যুবরণ করল।"[৮২]

আমরা দেখব যে, সাধারণভাবে জিহাদ ফরয কিফায়া এবং রাষ্ট্র শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে ফরয আইন। ফরয কিফায়া অবস্থায় যদি সকল মুসলিম তা পরিত্যাগ করে এবং ফরয আইন অবস্থায় যদি মুসলিমগণ তা পরিত্যাগ করে তবে তা তাদের জাগতিক লাঞ্ছনা বয়ে আনবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلا لا

يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

"যখন তোমরা অবৈধ ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত হবে, গবাদিপশুরু লেজ ধারণ করবে, চাষাবাদেই তুষ্ট থাকবে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ পরিত্যাগ করবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন, দীনে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত যা তিনি অপসারণ করবেন না।"[৮৩]

এ সকল আয়াত ও হাদীস থেকে অনেক সময় আবেগী মুমিন ভুল বুঝেন যে, জিহাদের বিষয়ে যেহেতু বেশি বেশি নির্দেশ ও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং বেশি বেশি পুরস্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে সেহেতু জিহাদ সালাত-সিয়ামের মতই ইবাদত অথবা সালাত সিয়ামের চেয়েও বড় ইবাদত। কারণ মহান আল্লাহ সালাত ও সিয়াম ফরয করেছেন এবং তিনিই জিহাদ ফরয করেছেন। আল্লাহ বলেছেন (كُتِبَ عليكم الصيام) তোমাদের উপর সিয়াম বিধিবদ্ধ করা হয়েছে"[৮৪] এবং তিনিই বলেছেন (كُتِبَ عليكم القِتَال) তোমাদের উপর কিতাল বা যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করা হয়েছে"।[৮৫] কাজেই সালাত, সিয়াম ও জিহাদ-কিতালের মধ্যে পার্থক্য করলে বা সালাত পালন করে জিহাদ-কিতাল পালন না করলে ইসলাম পালন করা হবে না। আব্দুল্লাহ ইবনু উমারের সাথে খারিজীগণের কথোপকথনে আমরা এর নমুনা দেখেছি।

আমরা ইতোপূর্বে বলেছি যে, কুরআনে কোনো ইবাদতেরই বিস্তারিত বিধান ও শর্তাবলি উল্লেখ করা হয় নি। কুরআন ও সুন্নাতের সামগ্রিক নির্দেশনার আলোকে তা জানতে হয়। কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, জিহাদ সালাত-সিয়াম ইত্যাদির মত 'ফরয আইন' বা দীনের রুকন নয়, বরং তা ফরয কিফয়া ইবাদত। জিহাদের শর্তগুলি পূরণ সাপেক্ষ জিহাদ বৈধ বা ফরয হলে উম্মাতের কিছু সদস্য তা পালন করবেন। এতে উম্মাতের সকলের দায়িত্ব পালিত হয়ে যাবে। অন্যরা পাপমুক্ত হবেন, তবে এ ইবাদত পালনের সাওয়াব তারা পাবেন না। যারা এ ইবাদত পালন করবেন তারা এ ইবাদত পরিত্যাগকরীদের চেয়ে অধিক মর্যাদা লাভ করবেন, তবে পরিত্যাগকারীরা পাপী হবেন না। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ...

মুমিনদের মধ্যে যারা কোনো অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও (জিহাদ না করে) ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর পথে নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান নয়। যারা নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। উভয় প্রকারের মুমিনকেই আল্লাহ কল্যাণের (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ....।"[৮৬]

এখানে মহান আল্লাহ সুস্পষ্টতই জানিয়েছেন যে, কোনোরূপ ওজর ও অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ জিহাদ পরিত্যাগ করে তবে সে পাপী হবে না, শুধু অতিরিক্ত সাওয়াব ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবে। এ অর্থে এক হাদীসে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন,

إِنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ (يا رسول الله)؟ فَقَالَ رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ مُؤْمِنٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنْ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللَّهَ رَبَّهُ (وفي رواية: يُقِيمُ الصَّلاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ) وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ

"একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আাগমন করে বলে, হে আল্লাহর রাসূল, সর্বোত্তম মানুষ কে? তিনি বলেন: যে মুমিন নিজের জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। লোকটি বলে, এরপর সর্বোত্তম কে? তিনি বলেন: যে মুমিন মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী বিজন উপত্যাকায় থেকে তার প্রতিপালকের ইবাদত করে (দ্বিতীয় বর্ণনায়: এভাবে নির্জনে একাকী সে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, মৃত্যু আগমন পর্যন্ত তার প্রতিপালকের ইবাদত করে) এবং মানুষের কোনো ক্ষতি করে না।"[৮৭]

এভাবে সমাজ ও জিহাদ পরিত্যাগ করে বিজনে নির্জনে একাকী বসবাস করে দীনের আরকান ও আহকাম পালনের কারণে দ্বিতীয় ব্যক্তি মর্যাদায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন, তবে পাপী বলে গণ্য হলেন না।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"মুমিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হবে। তাদের প্রতিটি দল থেকে একাংশ বের হয় না

কেন? যাতে তারা দীনের জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে, যেন তারা সতর্ক হয়।"[৮৮]

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ পিতামাতার খেদমত বা অনুরূপ দায়িত্বের কারণে জিহাদ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। এক হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা) বলেন:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَحَيٌّ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ (فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا)

"একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করে। তিনি বলেন: তোমার পিতামাতা কি জীবিত আছেন? সে বলে : হ্যাঁ। তখন তিনি বলেন : তোমার পিতামাতাকে নিয়ে তুমি জিহাদ কর। (অন্য বর্ণনায়: তাহলে তুমি তোমার পিতামাতার কাছে ফিরে যাও এবং সুন্দরভাবে তাঁদের খেদমন ও সাহচার্যে জীবন কাটাও।"[৮৯]

এ সকল আয়াত ও হাদীসের আলোকে মুসলিম উম্মাহর প্রসিদ্ধ ফকীহগণ একমত যে, জিহাদ ফরয কিফায়া বা সামষ্টিক ফরয, কিছু মুসলিম তা পালন করলে অন্যদের ফরয আদায় হয়ে যায়। তবে যারা পালন করবেন তারাই শুধু সাওয়াব লাভ করবেন, অন্যরা গোনাহ থেকে মুক্ত হবেন। বিশেষ পরিস্থিতিতে শত্রুবাহিনী যদি রাষ্ট্র দখল করে নেয়, বা রাষ্ট্র যদি বহির্শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়, সেনাবাহিনীর পক্ষে আগ্রাসন রোধ সম্ভব না হয়, এবং রাষ্ট্রপ্রধান সকল নাগরিককে যুদ্ধে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেন তবে এ অবস্থায় জিহাদ ফরয আইনে পরিণত হয়। আল্লামা কুরতুবী বলেন:

الذي استقر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين، إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين

" যে বিষয়ে ইজমা বা ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হলো, উম্মাতে মুহাম্মাদীর সকলের উপর জিহাদ ফরয কিফায়া। যখন কিছু মানুষ তা পালন করবে তখন অন্য সকলের দায়িত্ব অপসারিত হবে। তবে যখন শত্রুগণ ইসলামী রাষ্ট্রে অবতরণ করে তখন তা ফরয আইন হয়ে যায়।"[৯০]

তাফসীর, হাদীস-ব্যাখ্যা ও ফিকহের প্রায় সকল গ্রন্থেই বিভিন্ন শব্দে ও বাক্যে এ কথাই বলা হয়েছে।

৩. ৬. ৪. কাফির যোদ্ধা হত্যা বনাম কাফির হত্যা

কুরআনে যেমন কোথাও কোথাও কাফিরদের বা মুশরিকদের হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তেমনি অন্যত্র শুধু যুদ্ধরতদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ বলেছেন: "আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে এবং সীমালঙ্ঘন করো না।" অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন:

بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা মুশরিকদের মধ্য থেকে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে তাদের প্রতি। সুতরাং তোমরা যমীনে বিচরণ কর চার মাস, আর জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না, আর নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের অপদস্থকারী। আর মহান হজ্জের দিন মানুষের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে ঘোষণা, নিশ্চয় আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়মুক্ত এবং তাঁর রাসূলও। অতএব যদি তোমরা তাওবা কর, তাহলে তা তোমাদের জন্য উত্তম। আর

যদি তোমরা ফিরে যাও, তাহলে জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। আর যারা কুফরী করেছে তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। তবে মুশরিকদের মধ্য থেকে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছ, অতঃপর তারা তোমাদের সাথে কোনো ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি, তোমরা তাদেরকে দেওয়া চুক্তি তাদের নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন। অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো (ঘোষিত ৪ মাস) অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর, তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাটিতে বসে থাক। তবে যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। আর যদি মুশরিকদের কেউ তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তাহলে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনে, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দাও। তা এজন্য যে তারা অজ্ঞ সম্প্রদায়। কীভাবে মুশরিকদের জন্য চুক্তি-অঙ্গীকার থাকবে আল্লাহর কাছে ও তাঁর রাসূলের কাছে? অবশ্য মসজিদে হারামের কাছে যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছ তাদের কথা আলাদা। যতক্ষণ তারা তোমাদের জন্য ঠিক থাকে, ততক্ষণ তোমরাও তাদের জন্য ঠিক থাক। নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন।"[৯১]

এখানে আল্লাহ বলেছেন: "যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো (ঘোষিত ৪ মাস) অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর ..." অনেক সময় অমুসলিম লেখকগণ এবং কখনো আবেগী মুজাহিদগণ কুরআনের অন্যান্য আয়াত বাদ দিয়ে এবং এ আয়াতগুলি আগের ও পরের বক্তব্য বাদ দিয়ে শুধু এ কথাগুলি উদ্ধৃত করে দাবি করেন যে, ইসলামে সকল কাফির বা অমুসলিমকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ অন্যান্য আয়াত বাদ দিলেও এখানের আয়াতগুলি খুবই স্পষ্ট। এখানে সুস্পষ্টতই বলা হয়েছে, যে সকল কাফির জনগোষ্ঠীর সাথে- তৎকালীন প্রেক্ষাপটে যে সকল কবীলা বা গ্রাম রাষ্টের সাথে- তোমাদের চুক্তি রয়েছে তাদের মধ্যে যারা চুক্তি ভঙ্গ করে নি তাদের চুক্তি বহাল থাকবে। আর যারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে তাদেরকে তোমাদের পক্ষ থেকে চুক্তি বাতিল ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিয়ে চার মাসের সময় দাও। এ সময়ের মধ্যে তার যদি দীন গ্রহণ করে বা বশ্যতা গ্রহণ করে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে তবে তাদেরকে নিরাপত্তা দিবে। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ঘোষিত চারমাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করবে। তাদের বাহিনীকে যেখানে পাওয়া যাবে আক্রমন করা হবে এবং হত্যা বা বন্দী করা হবে।

এখানে অযোদ্ধা মুশরিকদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয় নি। এ আয়াতের নির্দেশ পালনে কখনোই রাসূলুল্লাহ ﷺ অযোদ্ধা মুশরিকদেরকে পথে প্রান্তরে ধরে হত্যা করতে নির্দেশ দেন নি। এখানে মুশরিকগণ বলতে যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হলো সে সকল চুক্তিভঙ্গকারী মুশরিক জনগোষ্ঠী বা কবীরা রাষ্ট্রের যোদ্ধাদেরকে বুঝানো হয়েছে। এখানে প্রথমে, শেষে ও মাঝে বারংবার চুক্তিরক্ষাকারীদের চুক্তি রক্ষা করতে ও নিরাপত্তাপ্রার্থীদের নিরাপত্তা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বাকি সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতর্কিত বা গোপন আক্রমন না করে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে চার মাসের সময় দেওয়া হয়েছে।

এ ঘোষণার উদ্দেশ্য যথাসম্ভব বেশি জিহাদ করে বেশি মুশরিক হত্যা করা নয়, বরং এ ঘোষণার উদ্দেশ্য জিহাদের প্রয়োজনীয়তা সীমিত করা এবং যত বেশি সম্ভব মানুষকে বাঁচানো। আধুনিক যুগেও আগ্রহী অযোদ্ধাদের সুযোগ দেওয়ার জন্য বা যুদ্ধরত রাষ্ট্র বা জনগোষ্ঠীর মনোবল দুর্বল করে যুদ্ধ এড়ানোর জন্য এরূপ ঘোষণা দেওয়া হয়। যে কোনো আন্তর্জাতিক ও মানবিক বিচারে যুদ্ধের জন্য এর চেয়ে মানবিক ও যৌক্তিক ঘোষনা হতে পারে না। আমরা পরে দেখব যে, বাইবেলীয় জিহাদের ক্ষেত্রে এরূপ কোনো নৈতিকতা রক্ষা করা হয় নি; বরং যে কোনোভাবে প্রতারণার মাধ্যমে যত বেশি সম্ভব শত্রু হত্যাই সেখানে মূল লক্ষ্য বলে গণ্য করা হয়েছে।

এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের প্রায়োগিক সুন্নাত থেকে আমরা নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারি যে, কাফির-মুশরিককে হত্যার নির্দেশের অর্থ যুদ্ধের ময়দানে কাফির যোদ্ধা হত্যা। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনোই বিচারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বা যুদ্ধরত 'কাফির' ছাড়া অন্যদেরকে হত্যা করেন নি। তার রাষ্ট্রে অগণিত কাফির সকল নাগরিক অধিকার নিয়ে বসবাস করেছেন। তিনি কখনোই তাদের হত্যা করেন নি বা হত্যার অনুমতি দেন নি। ঈমানের দাবিদার মুনাফিকগণকে তিনি চিনতেন। তাদেরকেও হত্যার অনুমতি তিনি দেন নি। উপরন্তু তিনি অযোদ্ধা সাধারণ অমুসলিম নাগরিককে হত্যা কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "যদি কোনো ব্যক্তি মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক বা অমুসলিম দেশের অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে তবে সে জান্নাতের সুগন্ধও লাভ করতে পারবেন না, যদিও জান্নাতের সুগন্ধ ৪০ বৎসরের দুরত্ব থেকে লাভ করা যায়।"

আমরা পূর্ববর্তী হাদীসে দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খারিজীদেরকে যখন যেখানে পাওয়া যায় হত্যা করতে নির্দেশ নির্দেশ দিয়েছেন। এ থেকে সাহাবীগণ কখনোই ঢালাওভাবে "খারিজী" মতাবলম্বীদের যেখানে পাওয়া যায় হত্যা করার অনুমতি বুঝেন নি। বরং এ থেকে তাঁরা যুদ্ধের ময়দানে খারিজী যোদ্ধাদেরকে হত্যার নির্দেশনা বুঝেছেন। খারিজীগণ অযোদ্ধা সাহাবী-তাবিয়ীগণ বা সাধারণ মুসলিমদের হত্যা করলেও সাহাবীগণ কখনোই যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কোনোভাবে খারিজীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন নি বা তাদেরকে হত্যা করেন নি। সমাজে তারা খারিজীদের সাথেএকত্রে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করেছেন।[৯২]

৩. ৬. ৫. ইসলামের ইতিহাসে জিহাদ ও সন্ত্রাস

ইসলামের ইতিহাসে আমরা অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখতে পাই, যেগুলি যুদ্ধের ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত শর্তগুলি পুরোপুরি পূরণ করে না। এগুলি মানবীয় দুর্বলতার ফল। ইসলামের দৃষ্টিতে মূলত এগুলি অবৈধ। তবে কোনো ক্ষেত্রেই যুদ্ধের ময়দানের বাইরে গুপ্ত হত্যা, নির্বিচার হত্যা ইত্যাদিতে উপর্যুক্ত কয়েকটি বিভ্রান্ত দল ছাড়া কেউ জড়িত হন নি।

পরবর্তীকালের দুটি 'জিহাদ' আমাদের আগ্রহ সৃষ্টি করে: (১) উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে (১৮১৮-১৮৩১খৃ) ভারতে বৃটিশ দখলদারদের বিরুদ্ধে সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর জিহাদ ও (২) আফগান জিহাদ। সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী জিহাদের শর্তগুলি পূরণ করেছিলেন। তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের সীমানার বাইরে ভারতের ইসলামী রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঘোষণার মাধ্যমে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপ্রধানের শর্ত পূরণ করেছিলেন। তিনি বৃটিশদেরকে আক্রমণকারী ও দখলদার বাহিনী হিসেবে গণ্য করে জিহাদের বৈধতা প্রমাণ করেন।

আফগান জিহাদও শুরু হয়েছিল প্রায় একইভাবে। সোভিয়েট বাহিনীর আক্রমণ ও জবরদখলের মুখে আফগান জনগণ আলিমদের নেতৃত্বে জিহাদ শুরু করেছিলেন। সাধারণভাবে মুসলিম বিশ্বে এ জিহাদ বৈধ জিহাদ বলেই মনে করা হয়। ফলে বিভিন্ন দেশের অনেক মুসলিম যুবক এ জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। সোভিয়েট বাহিনীর পরাজয়ের পরে এ জিহাদ আন্তঃদলীয় ও আন্তঃগোত্রীয় রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়। দীর্ঘদিন যুদ্ধে অভ্যস্ত আফগান জনগণ অস্ত্রের ভাষাতেই কথা বললেন স্বদেশীয় ও স্বধর্মীয় বিরোধীদের সাথে। প্রত্যেকেই নিজের কাজকে জিহাদ এবং প্রতিপক্ষকে ইসলামের শত্রু বলে দাবি করলেন। বাইরে থেকে আফগান যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদগণ স্বভাবতই কোনো না কোনো আফগান পক্ষে থেকে একই কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েন। অনেকে আফগান ত্যাগ করে নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এসব যুদ্ধ ফেরত সৈনিকদের অনেকের জন্য 'অস্ত্রের ভাষা' পরিত্যাগ করা কষ্টকর হয়ে যায়। এদের অধিকাংশই জিহাদের শর্তের চেয়ে জিহাদের ফযীলতের বিষয়েই বেশি জানতেন ও ভাবতেন। তারা নিজ দেশেও 'জিহাদী' পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করেন।

৩. ৬. ৬. বাইবেলীয় জিহাদ বনাম ইসলামের জিহাদ

উপরে আমরা ইসলামী শরীয়তে জিহাদের পরিচয়, তার উদ্দেশ্য ও শর্তাবলি সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আমরা জানি যে, ইসলাম বিরোধী সকল প্রচারণার মূল দাবি যে, ইসলামই ধর্মের নামে যুদ্ধ বৈধ করেছে। বিশেষত খৃস্টান ধর্মগুরুগণ খৃস্টধর্মকে "ভালবাসা ও মানবতার ধর্ম" ও ইসলামকে যুদ্ধ, সহিংসতা ও সন্ত্রাসের ধর্ম বলে চিত্রিত করেন। ইউরোপে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে সন্ত্রাসী রূপে চিত্রিত করে কার্টুন ছাপা হচ্ছে এবং "কুরআন"-কে সন্ত্রাসী গ্রন্থ বলে দাবি করে তা নিষিদ্ধ করতে দাবি জানানো হচ্ছে। ক্যাথলিক খৃস্টান জগতের বর্তমান ধর্মগুরু পোপ ১৬শ বেনিডিক্ট (Benedict XVI) ২০০৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর জার্মানির রিগেনসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক আলোচনায় বাইজানটাইন সম্রাট ম্যানুয়েল-২ এর ইসলামের প্রতি চরম বিদ্বেষমূলক নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন: "Show me just what Mhuammad brought that was new and there you will find things only evil and inhuman, such as his command to spread by the sword the faith he preached." "তুমি আমাকে দেখাও তো, মুহাম্মাদ (ﷺ) নতুন কি এনেছেন? তরবারীর মাধ্যমে তার ধর্ম প্রচার করার নির্দেশের মত অমানবিক ও অশুভ বিষয় ছাড়া আর কিছুই তুমি পাবে না।"

মানবতার জন্য মুহাম্মাদ (ﷺ) সত্যিই কী নতুন শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন সে বিষয়ে বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের সাথে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর শিক্ষার তুলনামূলক পর্যালোচনা করে **"কী নতুন নিয়ে এলেন মুহাম্মাদ (ﷺ)"** নামে একটি গ্রন্থ রচনার একান্ত ইচ্ছা রয়েছে। মহান আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করছি। এখানে "জিহাদ" পরিভাষার অপব্যবহার বিষয়ে আলোচনার পূর্বে আমরা জিহাদের বিষয়ে বাইবেলের নির্দেশাবলি পর্যালোচনা করতে চাই, যেন আমরা অন্তত জিহাদ বিষয়ে মুহাম্মাদ (ﷺ) নতুন কী নিয়ে এসেছিলেন তা আমরা জানতে পারি।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইহূদী-খৃস্টানগণের মধ্যে প্রচলিত বাইবেলের "ভার্সনগুলির" মধ্যে ব্যাপক বৈপরীত্য ও অমিল রয়েছে। ইহূদী বাইবেলের সাথে খৃস্টান বাইবেলের অমিল রয়েছে। তেমনি ক্যাথলিক খৃস্টানগণের বাইবেলের সাথে প্রটেস্ট্যান্ট খৃস্টানগণের বাইবেলের অমিল রয়েছে। সর্বাবস্থায় আমরা মুসলিমগণ বিশ্বাস করি যে, প্রচলিত বাইবেল কখনোই আল্লাহর কিতাব নয়। এর মধ্যে তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জিল ইত্যাদি আসমানী গ্রন্থের কিছু অংশ থাকলেও তা পুরোহিতদের সংযোজন, বিয়োজন ও বিকৃতির সাথে সংমিশ্রিত হয়ে রয়েছে। যে সকল অমানবিক ও অশুভ বিষয় রয়েছে তা সবই এরূপ বিকৃত তথ্য।[৯৩] তবে ইহূদী ও খৃস্টানগণ প্রচলিত এ বাইবেলকেই তাদের ধর্মগ্রন্থ ও আসমানী গ্রন্থ হিসেবে বিশ্বাস করেন।

ইহদীগণ শুধু 'পুরাতন নিয়ম'কেই ধর্মগ্রন্থ বলে বিশ্বাস করেন। আর খৃস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, প্রচলিত বাইবেলের পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের প্রতিটি শব্দ, বাক্য ও কথাই আল্লাহর বাণী।[৯৪] উপরন্তু তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরের বাণী বা বিধান কখনো রহিত হতে পারে না। কাজেই বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের প্রতিটি বাণী ও বিধান কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য পালনীয় অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ।[৯৫]

বাইবেল থেকে জানা যায় যে, জিহাদ বা যুদ্ধের জন্যই যীশুখৃস্ট আগমন করেছিলেন। তিনি বলেন: Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword "মনে করিও না যে, আমি

পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসিয়াছি; শান্তি দিতে আসি নাই, কিন্তু খড়্গ দিতে আসিয়াছি।"[৯৬]

উপরন্তু যীশুখৃস্ট তার রাজত্বের বিরোধীদেরকে তাঁর সামনে জবাই করতে নির্দেশ দিয়ে বলেন: "But those mine enemies, which would not that I should reign over them, bring hither, and slay them before me", "পরন্তু আমার এই যে শত্রুগণ ইচ্ছা করে নাই যে, আমি তাহাদের উপরে রাজত্ব করি, তাহাদিগকে এই স্থানে আন, আর আমার সাক্ষাতে বধ কর।"[৯৭]

বাইবেলে সুস্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, নেককার সাধু-সন্তদের মূল কাজ হলো আল্লাহর প্রশংসা করা এবং সর্বদা দু-ধারি তরবারী সাথে নিয়ে কাফির-বিধর্মীদের কতল করা ও শাস্তি দেওয়া। আর এভাবে কাফির-বিধর্মীদের হত্যা, বন্দী ও বিচার করাই সাধুদের মূল কর্ম ও মর্যাদা:

"Let the saints be joyful in glory... Let the high praises of God be in their mouth, and a twoedged sword in their hand; To execute vengeance upon the heathen, and punishments upon the people; To bind their kings with chains, and their nobles with fetters of iron; To execute upon them the judgment written: this honour have all his saints. "সাধুগণ গৌরবে উল্লাসিত হউক। ... তাহাদের কণ্ঠে ঈশ্বরের উচ্চ প্রশংসা, তাহাদের হস্তে দ্বি-ধার খড়্গ থাকুক; যেন তারা বিধর্মী-কাফিরদের[৯৮] প্রতিফল দেয়, লোকবৃন্দকে শাস্তি দেয়; যেন তাহাদের রাজাগণকে, তাহাদের মান্যগণ্য লোকদিগকে লৌহ-নিগড়ে বদ্ধ করে; যেন তাহাদের বিরুদ্ধে লিখিত বিচার নিষ্পন্ন করে; ইহাই সমস্ত সাধুর মর্যাদা।"[৯৯]

বাইবেলের বিভিন্ন নির্দেশনা থেকে নারী, শিশু ও নিরস্ত্র মানুষদেরকে হত্যার ঢালাও অনুমোদন বুঝা যায়। যেমন বলা হয়েছে: "Kill every male among the little ones, and kill every woman that hath known man by lying with him. But all the women children, that have not known a man by lying with him, keep alive for yourselves." "অতএব তোমরা বালক-বালিকাদের মধ্যে সমস্ত বালককে বধ কর, এবং শয়নে পুরুষের পরিচয়প্রাপ্ত সমস্ত স্ত্রীলোককেও বধ কর; কিন্তু যে বালিকারা শয়নে পুরুষের পরিচয় পায় নাই, তাহাদিগকে আপনাদের জন্য জীবিত রাখ।"[১০০]

অন্যত্র বলা হয়েছে: "And when the LORD the God hath delivered it tnto thine hands, thou shalt smite every male thereof with the edge of the swore; but the women, and the little ones, and the cattle, and all that is in the city, even all the spoil thereof, shalt thou take unto thyself; and thou shalt eat the spoil of thine enemies, which the LORD thy God hath given thee. Thus shalt thou do unto all the cities which are very far from thee, which are not of the cities of these nations. But of the cities of these which the LORD thy God doth give thee for an inheritance, thou shalt save alive nothing that breatheth; but thou shalt utterly destroy them."

"পরে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহা তোমার হস্তগত করিলে তুমি তাহার সমস্ত পুরুষকে খড়্গধারে আঘাত করিবে, কিন্তু স্ত্রীলোক, বালক-বালিকা ও পশুগণ প্রভৃতি নগরের সর্বস্ব সমস্ত লুটদ্রব্য আপনার জন্য লুট-স্বরূপে গ্রহণ করিবে, আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর দত্ত শত্রুদের লুট ভোগ করিবে। এই নিকটবর্তী জাতিদের নগর ব্যতিরেকে যে সকল নগর তোমা হইতে অতি দূরে আছে, তাহাদেরই প্রতি এইরূপ করিবে। কিন্তু এই জাতিদের যে সকল নগর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে তোমাকে দিবেন, সেই সকলের মধ্যে শ্বাসবিশিষ্ট কাহাকেও জীবিত রাখিবে না।"[১০১]

এরূপ অনেক নির্দেশ রয়েছে যা বাহ্যত অমানবিক ও গণহত্যার নির্দেশ বলে মনে হবে। যুদ্ধের সম্ভাবনা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। রাষ্ট্র থাকলেই যুদ্ধের সম্ভাবনা স্বীকার করতে হবে এবং যুদ্ধের জন্য নিয়ম, আইন ও বিধান রাখতে হবে। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্র বা নাগরিকদের নিরাপত্তা রক্ষা করতে অনেক সময় রাষ্ট্রকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। কিন্তু সকল শান্তিকামী মানুষই চেষ্টা করেন যুদ্ধকে যথাসম্ভব কম ধ্বংসাত্মক করতে এবং অযোদ্ধ মানুষদেরকে হত্যা না করতে। অযোদ্ধা মানুষদেরকে হত্যা করা বর্তমানে 'যুদ্ধ অপরাধ' বলে গণ্য। অথচ বাইবেলে এরূপই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধু অযোদ্ধা মানুষই নয়, উপরন্তু গরু, ছাগল, উট, ভেড়া ইত্যাদি অবলা প্রাণীও নির্বিচারে হত্যা করে নিশ্চিহ্ন করতে নির্দেশ দিয়েছে বাইবেল।

বিধর্মী বা অন্য দেবতার উপাসকদের হত্যা করার ঢালাও নির্দেশ দিয়ে বাইবেলে বলা হয়েছে: "He that sacrificeth unto any god, save unto the LORD only, he shall be utterly destroyed" "যে ব্যক্তি কেবল সদাপ্রভু ব্যতিরেকে কোন দেবতার কাছে বলিদান করে, সে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবে।"[১০২]

ঈশ্বরের নির্দেশের সামান্য বিরোধিতা করলেই মৃত্যুদণ্ড: "Thou shalt not suffer a witch to live.

Whosoever lieth with a beast shall surely be put to death". "তুমি মায়াবিনীকে জীবিত রাখিও না। পশুর সহিত শৃঙ্গারকারী ব্যক্তির প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে।"[১০৩]

বিধর্মীদের ধর্মালয় ভাঙ্গার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে: "Thou shalt not bow down to their gods, nor serve them, nor do after their works: but thou shalt utterly overthrow them, and quite break down their images." "But ye shall destroy their altars, break their images, and cut down their groves".

"তুমি তাহাদের দেবগণের কাছে প্রণিপাত করিও না, এবং তাহাদের সেবা করিও না ও তাহাদের ক্রিয়ার ন্যায় ক্রিয়া করিও না; কিন্তু তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটন করিও, এবং তাহাদের স্তম্ভ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিও।"[১০৪] "কিন্তু তোমরা তাহাদের বেদি সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, তাহাদের স্তম্ভ সকল খণ্ড খণ্ড করিবে, ও তথাকার আশেরা-মূর্তি সকল কাটিয়া ফেলিবে।"[১০৫]

বাইবেল থেকে জানা যায় যে, নির্বিচার গণহত্যার উপর্যুক্ত নির্দেশাবলি সুন্দরভাবে পালন করেছেন বাইবেলীয় ভাববাদীগণ। আমরা মুসলিমগণ কখনোই বিশ্বাস করি না যে, কোনো ভাববাদী (নবী) এরূপ গণহত্যা করতে পারেন। তবে বাইবেল তাদের বিষয়ে এরূপই লিখেছে এবং ইহূদী-খৃস্টানগণ এরূপই বিশ্বাস করেন। বস্তুত, লক্ষ-লক্ষ মানব সন্তানকে নির্বিচারের হত্যার অগণিত কাহিনীর সমন্বয় বাইবেল। পবিত্র ভাববাদীগণ, মহাযাজকগণ বা বিচারকর্তৃগন কিভাবে যুদ্ধ, ছলচাতুরি বা প্রবঞ্চনার মাধ্যমে নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়েছেন তার অগণিত বিবরণ বাইবেলে রয়েছে।

অযোদ্ধা ও যুদ্ধবন্দী নারী, পুরুষ ও শিশুদের নির্বিচারে ও গণহারে হত্যার বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এছাড়া নিরীহ যুদ্ধবন্দীদের কত বেশি কষ্ট দিয়ে হত্যা করা যায় সে বিষয়েও তাদের আগ্রহ লক্ষণীয়। লোহার মইয়ের নিচে রেখে, লোহার কুড়ালির নিচে রেখে এবং ইটের পাঁজার মধ্যে ঢুকিয়ে বা অনুরূপভাবে বর্ণনাতীত যন্ত্রণা দিয়ে নিরস্ত্র মানুষদেরকে হত্যার কাহিনী বাইবেলে প্রচুর। এরূপ কর্মের জন্য "ভাববাদিগণকে" বাইবেলে বিশেষভাবে প্রশংসা করা হয়েছে।

যদি কেউ কষ্ট করে বাইবেলে যিহোশূয়ের পুস্তক (Joshua), বিচারকর্তৃগণের বিবরণ (Judges), শমুয়েলের পুস্তক (Samuel), রাজাবলি (The Kings), বংশাবলি (The Chronicles) ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করেন তবে বর্বর গণহত্যা, কল্পনাতীত নিপীড়ন, উন্মাদ ধ্বংসযজ্ঞের লোমহর্ষক ঘটনাবলি দেখবেন। এগুলি পাঠ করলে একজন সাধারণ পাঠক অনুভব করবেন যে, বাইবেলের নির্দেশ অনুসাসের যুদ্ধ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য নয়, এমনকি অন্যের দেশ দখলের জন্যও যুদ্ধ নয়, যুদ্ধ মূলত হত্যা ও ধ্বংসের মাধ্যমে আনন্দলাভের জন্য। বাইবেলের নতুন নিয়মেও এ সকল কর্মের জন্য ভাববাদীগণকে বিশেষভাবে প্রশংসা করা হয়েছে।[১০৬]

আমরা বলেছি যে, রাষ্ট্র থাকলেই যুদ্ধের ব্যবস্থা থাকতে হবে। তবে যুদ্ধকে যথাসম্ভব কম ধ্বংসাত্মক করতে হবে এবং সকল অযোদ্ধা মানুষ, দ্রব্য ও বস্তুকে যুদ্ধের আওতা থেকে মুক্ত রাখতে হবে। ইসলামে এ কাজটিই সর্বোত্তমভাবে করা হয়েছে। তাত্ত্বিকভাবে যেমন, তেমনি প্রায়োগিকভাবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন যথাসম্ভব কম প্রাণহানি ঘটাতে। শুধু সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও আগ্রাসন প্রতিরোধের জন্য বাধ্য হয়ে তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছে এবং তার সারাজীবনের সকল যুদ্ধে মুসলিম ও কাফির মিলে সর্বমোট প্রায় এক হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। যে দেশে প্রতি মাসেই শতশত মানুষ মারামারি করে খুন হতো, সে দেশে মাত্র সহস্র মানুষের জীবনের বিনিময়ে সকল আগ্রাসন রোধ করে তিনি বিশ্বব্যাপী চিরস্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। পক্ষান্তরে বাইবেলের একেক যুদ্ধেই হাজার হাজার "কাফির" হত্যার গৌরবময় বিবরণ লেখা হয়েছে। মহাভারত, গীতা বা রামায়ণের যুদ্ধেরও কাছাকাছি অবস্থা।

সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় যে, বাইবেলে যুদ্ধ, হত্যা ও প্রতিশোধের ক্ষেত্রে কোনোরূপ নীতি নৈতিকার প্রতি লক্ষ রাখা হয় নি। ইসলামে যুদ্ধের জন্য গোপনীয়তা ও শত্রুপক্ষকে বোকা বানানোর জন্য কৌশল অবলম্বন বৈধ করেছে। কিন্তু চুক্তিভঙ্গ করা, প্রবঞ্চনা করা, নিরস্ত্রকে আক্রমন করা, অযোদ্ধা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা, আহতদের হত্যা করা, মৃতদেহ অপমান করা ইত্যাদি কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এরূপ সকল কর্মই বাইবেলীয় জিহাদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই।

বিধর্মী ও বিজাতীয়দের সাথে ইহূদীদের যুদ্ধ, ইহূদীদের সাথে ইহূদীদের যুদ্ধ, ইস্রায়েল রাজ্যের ইহূদীদের সাথে জুডাই রাজ্যের ইহূদীদের যুদ্ধ, একই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই আমরা চুক্তিভঙ্গ, মিথ্যাচার, অযোদ্ধাদেরকে হত্যা, মৃতদেহের অবমাননা ইত্যাদি অগণিত বিষয় দেখতে পাই। বাইবেলে এ সকল বিষয় অত্যন্ত গৌরবের সাথে প্রশংসনীয় কর্ম হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে।

সম্ভবত এজন্যই ইস্রায়েলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক শামির ১৯৪৮ সালে তার পরিচালিত সন্ত্রাসী বাহিনী 'দি স্টার্ন গ্যাং" কর্তৃক জেরুজালেমে জাতিসংঘ মধ্যস্থতাকারী কাউন্ট বার্ণাডোটকে গোপনে হত্যার পক্ষে সাফাই গেয়ে বলেন: "ইহূদী নৈতিকতা ও ইহূদী ঐতিহ্য কোনটিই সন্ত্রাসকে রণনীতির পরিপন্থী মনে করে না। জাতীয় সংগ্রাম নিয়ে ব্যস্ততার মূহূতে আমরা নৈতিক দ্বিধাগ্রস্ততা বহু দূরে ছুঁড়ে ফেলে রাখি। সর্বাগ্রে, আমাদের জন্য সন্ত্রাস হল রাজনৈতকি যুদ্ধের অংশ যা বর্তমান পরিস্থিতিতে খুবই যথার্থ।"[১০৭]

এখানে লক্ষণীয় যে, ইহূদী নৈতিকতার আর খৃস্টান নৈতিকতা একই হওয়ার কথা; কারণ তাদের নৈতিকার ভিত্তি ধর্মগ্রন্থ এক।

খৃস্টান পাদরি-প্রচারকগণ অনেক সময় মুসলিমদেরকে বলেন যে, যুদ্ধ, গণহত্যা ও বিধর্মী হত্যার উপর্যুক্ত নির্দেশাবলি বাইবেলের পুরাতন নিয়মের কথা বা তাওরাতের কথা, ইঞ্জিলের কথা নয়। আমরা আগেই বলেছি যে, খৃস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, পুরাতন ও নতুন নিয়মের প্রতিটি শব্দই আল্লাহর বাণী এবং কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য পালনীয়। তাঁরা আরো বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর কোনো নির্দেশ বা বাণী কখনো "নসখ" বা রহিত হতে পারে না।

সর্বোপরি স্বয়ং যীশু খৃস্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে পুরাতন নিয়মের সকল নির্দেশ চিরন্তন, অপবির্তনীয় ও অলঙ্ঘনীয় ঐশ্বরিক নির্দেশ যা কিয়ামত পর্যন্ত সকল খৃস্টানের জন্য পালনীয় এবং এগুলি পালন না করলে কেউ পরকালে মুক্তি লাভ করতে পারবে না। তিনি বলেন: "For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven". "আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সেই পর্যন্ত ব্যবস্থার (তাওরাত বা পুরাতন নিয়মের বিধিবিধান) এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে। অতএব যে কেহ এই সকল ক্ষুদ্রতম আজ্ঞার মধ্যে কোন একটি আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, ও লোকদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গরাজ্যে অতি ক্ষুদ্র বলা যাইবে; কিন্তু যে কেহ সেই সকল পালন করে ও শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গ-রাজ্যে মহান বলা যাইবে।"[১০৮]

এছাড়া আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, বাইবেলের নতুন নিয়মেও যীশু তাঁর রাজত্বের প্রতি অনীহা পোষণকারীদের তার সামনে হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, তরবারী বা যুদ্ধের জন্যই তাঁর আগমন।

বাইবেলে অন্য ধর্ম বা বর্ণের মানুষদেরকে শূকর, কুকুর ইত্যাদি বলে গালি দেওয়া হয়েছে। অ-ইস্রায়েলীয়দেরকে কুকুর ও শূকর আখ্যায়িত করে তাদেরকে খৃস্টান ধর্মের দীক্ষা দিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে যীশু বলেন: "Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine...", "পবিত্র বস্তু কুকুরদিগকে দিও না, এবং তোমাদের মুক্তা শূকরদের সম্মুখে ফেলিও না"[১০৯]

অ-ইস্রায়েলীয়দেরকে কুকুর আখ্যায়িত করে তাদের জন্য দুআ করতে বা তাদেরকে ঝাড়-ফুঁক দিতেও আপত্তি করেন যীশু খৃস্ট। মথি তাঁর সুসমাচারে লিখেছেন: "And, behold, a woman of Canaan came out of the same coasts, and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou Son of David; my daughter is grievously vexed with a devil. But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away; for she crieth after us. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, It is not meet to take the children's bread, and to cast it to dogs."

"আর দেখ, ঐ অঞ্চলের এক জন কনানীয় স্ত্রীলোক আসিয়া এই বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল, হে প্রভু, দায়ূদ-সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন, আমার কন্যাটি ভূতগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছে। কিন্তু তিনি তাহাকে কিছুই উত্তর দিলেন না। তখন তাঁহার শিষ্যেরা নিকটে আসিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, ইহাকে বিদায় করুন, কেননা এ আমাদের পিছনে পিছনে চেঁচাইতেছে। তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, ইস্রায়েল-কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই। কিন্তু স্ত্রীলোকটি আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, প্রভু, আমার উপকার করুন। তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, সন্তানদের খাদ্য লইয়া কুকুরদের কাছে ফেলিয়া দেওয়া ভাল নয়।"[১১০]

প্রথম দৃষ্টিতেই যে কোনো পাঠকের কাছে কথাগুলি খুবই আপত্তিকর মনে হবে। জন্ম, বংশ বা ধর্মের কারণে মানুষকে কুকুর বলে অভিহিত করা! শুধুমাত্র বংশ বা ধর্মের কারণে তাকে মানবিক সাহায্য করতে অস্বীকার করা!! একজন খৃস্টধর্ম বিরোধী পাঠক দাবি করতে পারেন যে, এ বক্তব্য দ্বারা জাতিগত বৈষম্য ও জাতিগত বিদ্বেষ চিরস্থায়ী করা হয়েছে। তিনি দাবি করতে পারেন যে, বাইবেলের উপর্যুক্ত সকল গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের মূল দর্শন যীশুর এ কথার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

কেউ এ দাবীও করতে পারেন যে, বর্তমান যুগে ফিলিস্তিন, ইরাক ও অন্যান্য দেশে গণহতা ও ধ্বংসযজ্ঞের বিষয়ে পোপ কোনো প্রতিবাদ না করে ইসলামের নবীর সমালোচনা করছেন এর কারণও এ 'কুকুর' দর্শন। যে দর্শনের মূল হলো, ইহূদী-খৃস্টানগণ ঈশ্বরের সন্তান। অন্য সকল মানুষ কুকুরের মতই মানবেতর প্রাণী। কুকুরকে যেমন পচা বা ছেড়া রুটির টুকরো ছুড়ে দেওয়া যায়, তেমনি এদেরকে মাঝে মাঝে কিছু সাহায্য করা যেতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের সন্তানদের স্বার্থের ক্ষতি করে তাদের কোনো উপকার করা যাবে না। যদি ঈশ্বরের সন্তানদের স্বার্থের ক্ষতি হয় তবে লক্ষকোটি সারমেয় সন্তানকে নির্বিচারে হত্যা করতে কোনো অসুবিধা নেই। এছাড়া ঈশ্বরের সন্তানগণ যদি কিছুটা আনন্দ ও তৃপ্তি লাভের জন্য দুচার হাজার বা দুচার লক্ষ সারমেয় সন্ত

নকে হত্যা করে ফেলেন তাতেও অসুবিধা কী?

বাইবেলে অন্যধর্মের অনুসারীদের ঠাণ্ডামাথায় হত্যার নির্দেশনা, এমনকি প্রতারণামূলকভাবে ডেকে এনে হত্যা করার নির্দেশনা রয়েছে। একটি ঘটনা দেখুন। ইহূদীদের প্রাচীন রাষ্ট্র "ইসরায়েলের" কিছু নাগরিক "বাল" দেবতার উপাসনা করত। ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র ইস্রায়েলের সম্রাট যেহূ (Jehu, the son of Jehoshaphat) ঈশ্বরের সঠিক ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য "বাল" দেবতার উপাসকদের ঠাণ্ডা মাথায় গণহত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ঘোষণা দেন যে, সম্রাট যেহূ বাল দেবতার সেবা করবেন। এ জন্য তিনি বাল দেবতার উপাসকদের এক মহা- সমাবেশের আয়োজন করেন। সেখানে তিনি দেবতার উদ্দেশ্যে ভেট ও উৎসর্গের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু গোপনে উৎসবকেন্দ্র ও মন্দিরের চারিপাশে সেনাবাহিনী নিয়োগ করে উৎসবরত সকল "বিধর্মী"-কে তরবারীর আঘাতে হত্যা করতে নির্দেশ দেন। এমনকি তিনি তাঁর সৈন্যদের বলেন, যদি একজন বিধর্মীও জীবন নিয়ে পালায় তবে তার বিনিময়ে একজন সৈন্য হত্যা করা হবে। এভাবে হাজার হাজার নিরীহ নিরস্ত্র নারী-পুরুষকে কেবলমাত্র ধর্মীয় বিরোধিতার কারণে কোনোরূপ সুযোগ না দিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেন।[১১১]

অন্য ঘটনায় বাইবেলীয় নবী এলিজাহ (Prophet Elijah) বাল দেবতার ৪৫০ জন উপাসককে ধরে ঠাণ্ডা মাথায় জবাই করেন।[১১২]

এ সকল ঘটনা থেকে খৃস্টান পোপ, পাদরী ও বিশপগণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, খৃস্টান দেশে বসবাস রত সকল অখৃস্টান নাগরিক এবং ভিন্নমতাবলম্বী খৃস্টানদেরকে হত্যা ও নির্মূল করা তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব ও অধিকার। প্রসিদ্ধ আরব প্রটেস্ট্যান্ট পাদরি আইজাক বাদারকান ১৮৪৯ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত তার লেখা "পুস্তিকা ত্রয়োদশ" গ্রন্থে লিখেছেন: রোম থেকে আরবী ভাষায় প্রকাশিত বাইবেল ইনডেক্সের "হা" অক্ষরের মধ্যে "হারতাকা" (heresy) বিষয়ে লেখা হয়েছে: "ধর্মীয় ভিন্নমতাবলম্বী বা বিদআতী ফিরকার (heretics) বিষয়ে আমাদের দায়িত্ব হলো তাদের নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করা; কারণ সম্রাট যেহূ প্রতারণার মাধ্যমে বাল দেবতার অনুসারীদের জমায়েত করে হত্যা করেছেনো এবং নবী এলিজাহ বাল দেবতার অনুসারীদের জবাই করেছেন। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, বিধর্মীদের এভাবে হত্যা ও নির্মূল করা আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব।

খৃস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার প্রেরণায় "পোপ" নিষ্পাপ, নির্ভুল ও অভ্রান্ত (infallible)। তাঁর সিদ্ধান্তই ঈশ্বরের সিদ্ধান্ত। আর এরূপ অভ্রান্ত পোপগণের নেতৃত্বে খৃস্টধর্ম ও খৃস্টীয় চার্চ বিধর্মী নির্মূলের এ মহান দায়িত্ব সর্বোত্তমভাবেই পালন করেছেন। ৩২৫ খৃস্টাব্দে বাইজান্টাইন সম্রাট কন্সটানটাইন (Constantine) খৃস্টধর্মকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান করেন। সেদিন থেকে প্রায় দেড় হাজার বৎসর পর্যন্ত খৃস্টধর্মের ইতিহাস ধর্মীয় সহিংসতা, হত্যা, অত্যাচার ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরের ইতিহাস। "শূন্য সহনশীলতা" (Zero tolerance) প্রদর্শন করে কঠোর বর্বরতার সাথে খৃস্টান চার্চ সকল বিধর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বীকে নির্মূল করেছে।

আর এজন্যই নোবেল বিজয়ী প্রসিদ্ধ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল (Bertrand Russell: 1872-1970) বলেন: "You find as you look around the world that every single bit of progress in human feeling, every improvement in the criminal law, every step towards the diminution of war, every step towards better treatment of coloured races, or every mitigation of slavery, every moral progress that there has been in the world, has been consistently opposed by the organized Churches of the world. I say quite deliberately that the Christian religion, as organized in the churches, has been and still is the principal enemy of moral progress in the world."

"বিশ্বের চারিদিকে তাকালে আপনি দেখবেন যে, বিশ্বের যেখানেই মানবীয় অনুভবের যে কোনো ক্ষুদ্রতম অগ্রগতি, অপরাধ-আইনের যে কোনো উন্নয়ন, যুদ্ধহ্রাসে যে কোনো পদক্ষেপ, কাল বা অ-সাদা বর্ণের মানুষদের সাথে উন্নততর আচরণের ক্ষেত্রে যে কোনো পদক্ষেপ, দাসপ্রথা বিলুপ্তির যে কোনো প্রচেষ্টা এবং নৈতিক উন্নয়ন যে কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তারই বিরোধিতা করেছে খৃস্টীয় চার্চ নিরবিচ্ছিন্নভাবে। আমি পরিপূর্ণ সতর্কতা ও সুচিন্তিতভাবে বলছি যে, চার্চ পরিচালিত খৃস্টধর্মই বিশ্বের নৈতিক উন্নয়নের প্রধান শত্রু ছিল এবং এখনো আছে।"[১১৩]

Vlasis Rassias নামক একজন গবেষক (Demolish Them) নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেছেন গ্রীক ভাষায় ২০০০ খৃস্টাব্দে (ISBN ৯৬০-৭৭৪৮-২০-৪)। এ পুস্তকে খৃস্টধর্মের সহিংসতার অনেক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ সকল সহিংসতার তালিকায় রয়েছে:

Emperor Constantine began a centuries-long run of torture, destruction and extermination of all things not Christian like eradicating ancient Greek temples and stealing their treasures. Subsequent Roman Emperors in Constantinople executed everyone that did not accept the new Christian faith. Then libraries were burned and all contrary teachings

outlawed....

For another thousand years, the primary occupation of state-sanctioned Christians was to exterminate those who would not accept the documents constructed into a Bible at the Council of Nicea. In 1493, Spanish monarchs Ferdinand and Isabella issued an edict demanding death for all those who would not accept 'the true faith'. Christopher Columbus and others began slaughtering natives of the Western Hemisphere by the millions, not because the would not accept the faith, but because they could not understand the question, because they could not speak Spanish!"

"খৃস্টান বিশ্বাসের পরিপন্থী সকল কিছুর বিরুদ্ধে সম্রাট কনস্টান্টাইন এক নিপীড়ন, ধ্বংসযজ্ঞ ও নির্মূল অভিযানের শুরু করেন যা শতাব্দীর পর শতাব্দী স্থায়ী হয়। যেমন প্রাচীন গ্রীক মন্দিরগুলি ধ্বংস করা হয় এবং সেগুলির ভাণ্ডার লুণ্ঠন করা হয়। নতুন খৃস্টীয় ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করতে রাজি নয় এমন সকলকে নির্মূল করেন কন্সটান্টিনোপলের পরবর্তী রোমান শাসকগণ। এরপর লাইব্রেরীগুলি পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং খৃস্টীয় বিশ্বাসের বিপরীত সকল কিছু নিষিদ্ধ করা হয়। ...নিকীয়া কাউন্সিলে যে বাইবেল তৈরি করা হয় সে বাইবেল যারা মানে না তাদেরকে নির্মূল করাই ছিল পরবর্তী হাজার বৎসর যাবৎ রাষ্ট্র পরিচালিত খৃস্টানগণের মূল কর্ম। ১৪৯৩ খৃস্টাব্দে স্পেনের সম্রাট ফার্ডিনান্ড ও রাণী ইসাবেলা এক আদেশ জারি করেন যে, যারা 'সঠিক ধর্ম বিশ্বাস' (খৃস্টধর্ম) গ্রহণ করবে না তাদেরকে হত্যা করতে হবে। (এ আজ্ঞার ভিত্তিতে) ক্রিস্টোফার কলম্বাস ও অন্যান্যরা আমেরিকায় যেয়ে সেখানকার মিলিয়ন মিলিয়ন বাসিন্দাকে (রেড ইন্ডিয়ান) হত্যা করেন। খৃস্টধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করার কারণে তারা তাদেরকে হত্যা করেন নি। বরং স্প্যানিশ ভাষা না জানায় তারা খৃস্টধর্মের বিশ্বাস বুঝতে পারছিল না। এ অপরাধে তারা তাদেরকে হত্যা করেন।"[১১৪]

শুধু মুসলিম, ইহূদী বা অখৃস্টানদের বিরুদ্ধেই নয়, ভিন্নমতাবলম্বী খৃস্টানদের বিরুদ্ধেও ক্রুসেড চালিয়েছেন খৃস্টান ধর্মগুরু পোপগণ এবং একেক যুদ্ধে লক্ষাধিক মানুষ হত্যা করেছেন। আপনারা যে কোনো এনসাইক্লোপীডিয়াতে ক্রুসেড (Crusade), এ্যালবিজেনসিয়ান ক্রুসেড (the Albigensian Crusade), সেন্ট বার্থলমিউস দিবসের গণহত্যা (Massacre of Saint Bartholomew's Day), ইনকুইজিশন (Inquisition), ধর্মের যুদ্ধ (The Wars of Religion), ইহূদী বিরোধিতা (Anti-Semitism) ইত্যাদি আর্টিকেল পড়লেই অনেক তথ্য জানতে পারবেন। যদিও আধুনিক গ্রন্থগুলিতে বিষয়গুলিকে খুবই হালকা করা হয়, নিহতদের সংখ্যা কম করা হয় এবং "ধর্ম" ও "চার্চ"-কে বাঁচিয়ে অন্যদের উপর দায় চাপানোর চেষ্টা করা হয়। তারপরও যেটুক সত্য দেখবেন তাতেই গায়ের লোম শিউরে উঠবে! একেক যুদ্ধ বা হত্যাকাণ্ডে ১০/২০ হাজার থেকে লক্ষাধিক মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। কখনো যুদ্ধ করে এবং কখনো যুদ্ধ ছাড়াই অতর্কিত হামলা চালিয়ে।

এ হলো ইহূদী-খৃস্টানদের একেকটি ধর্মযুদ্ধের বা ধর্মীয় হত্যাকাণ্ডের অবস্থা। এ সকল বর্বরতা কখনো খৃস্টান সম্রাট-শাসকগণের নেতৃত্বে ঘটেছে এবং পোপগণ তা সমর্থন করেছেন। কখনো স্বয়ং পোপের নেতৃত্বে এরূপ বর্বর নিধনযজ্ঞ শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আমি পাঠককে আমার লেখা (Jihad of the Holy Bible and Jihad of Muhammad ﷺ) গ্রন্থটি পাঠ করতে অনুরোধ করছি।

আধুনিক যুগের ধর্মনিরপেক্ষ (!) ও উদার (!) খৃস্টান বুদ্ধিজীবি ও রাজনৈতিক নেতাদের কথবার্তার মধ্যেও আমরা উপরের মানসিকতার ছায়া দেখতে পাই। আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধ্বংসের জন্য আল-কায়েদাকে দায়ী করা হলেও এখন পর্যন্ত মার্কিন প্রশাসন নিজের দেশের আদালতেও তা প্রমাণ করতে পারেন নি। তা সত্ত্বেও "আল-কায়েদার" অপরাধের জন্য সকল মুসলিম দেশ দখল করে নেতাদের হত্যা ও মুসলমানদের জোরপূর্বক খৃস্টান বানানোর দাবিদাওয়া জানাচ্ছেন তাদের অনেকেই। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ মার্কিন সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবী কলামিস্ট অ্যান কাল্টার (Ann Coulter)-এর বক্তব্য আমরা ইতোপূর্বে উদ্ধৃত করেছি।

'দ্যা সেভেইজ ন্যাশনস' নামক রেডিও শোতে (১২ মে ২০০৩) প্রচারিত মাইকেল সেভেইজের মতামত পশ্চিমা দেশে বিশেষ করে আমেরিকায় প্রতিদিন পুনরাবৃত্তি করা হয়। তিনি তার শোতে বলেন: "আমার মনে হয় এই লোকগুলোকে (আরব ও মুসলমানদেরকে) জোর করে খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা উচিত। শুধুমাত্র এভাবেই সম্ভবত তাদেরকে মানুষে পরিণত করা যাবে।"[১১৫]

এভাবে আরো অনেক প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য উদার, পরমতসহিষ্ণু ও ধর্মনিরপেক্ষ (?!) রাজনীতিবিদ, ধর্মপ্রচারক ও গবেষক মুসলমানদেরকে জোরপূর্বক খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছেন!

আরেক মার্কিন সিনেটর দাবি করলেন যে, আমেরিকায় যে কোনো সন্ত্রাসী হামলা হলে বুঝতে হবে যে, তা মুসলিমগণ করেছে এবং কোনো প্রমাণ ছাড়ায় সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশোধ হিসেবে মুসলিমদের পবিত্র স্থান মক্কা ও মদীনা ধ্বংস করে দিতে হবে। আর এধরনের বুদ্ধিজীবি ও রাজনীতিবিদগণ ক্রমান্বয়ে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব লাভ করছেন।

অথচ মুসলিম মানস এমনভাবেই তৈরি যে, সে কখনোই অন্য মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার বা কাউকে জোর পূর্বক ধর্মান্তরিত করার কথা চিন্তাও করতে পারে না। আমরা দেখছি যে, সবচেয়ে সহিংস মুসলিম সন্ত্রাসীও অন্যের ধর্মকে অবমাননা

করার চেষ্টা করছে না বা অন্য ধর্মের মানুষকে জবরদস্তিকরে মুসলিম বানানোর আহ্বান করছে না। সুসভ্য, মানবতাবাদী ও যুক্তিবাদী 'ধর্মনিরপেক্ষ' খৃস্টানগণ মুসলিমদের পবিত্র কুরআনকে অপবিত্র করেছে। মানবতাবাদী ও ভালবাসার প্রচারক (?!) খৃস্টান পাদরিগণ কুরআনকে টয়লেটে নিক্ষেপ করার দাবি সম্বলিত ফলক চার্চের সামনে টানিয়ে রাখছেন।[১১৬] তারা মুসলিমদের পবিত্র নবীকে (ﷺ) নিয়ে ঘৃণ্য কার্টুন তৈরি করেছে।

সারা বিশ্বের মুসলিমগণ এ ঘৃণ্য বর্বরতার প্রতিবাদ করেছেন। তাঁরা মার্কিন বা ডেনিশ পতাকায় অথবা এ সব দেশের রাজনীতিবিদদের কুশপুত্তলিকায় অগ্নিসংযোগ করেছেন। কিন্তু কখনোই কোনো মুসলিম খৃস্টানদের ধর্মগ্রন্থের অবমাননা করেন নি। বাজার থেকে একটি বাইবেল কিনে তাতে পেশাব করেন নি বা তাতে অগ্নি সংযোগ করেন নি বা যীশু খৃস্টের অবমাননাকর কার্টুন প্রচার করেন নি। পাশ্চাত্যের সুসভ্য ধর্মনিরপেক্ষ মানুষদের দৃষ্টিতে একেবারে অশিক্ষিত, অসভ্য ও উগ্র কোনো মোল্লাও কখনো খৃস্টানদের ধর্মগ্রন্থকে অপবিত্র করতে বা যীশু নামে কার্টুন তৈরি করতে আহ্বান করেন নি।

পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসী ও উগ্র মৌলবাদীদের একজনকেও আমরা দেখছি না যে, সে খৃস্টানদেরকে জোরপূর্বক মুসলিম বানানোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। তারা হয়ত মি. বুশকে হত্যার আহ্বান করছে। কিন্তু তা তার খৃস্টান হওয়ার কারণে নয়, আমেরিকান হওয়ার কারণে নয় বা গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের সেবক হওয়ার কারণে নয়, বরং তাকে আগ্রাসক, জালিম ও হত্যাকারী বলে মনে করার কারণে। একই কারণে তারা হয়ত আমেরিকা বা ইস্রাইলের ধ্বংসের জন্য আহ্বান করছে। কিন্তু কখনোই তারা কোনো ইহূদী বা খৃস্টানকে জোরপূর্বক মুসলিম বানানোর জন্য আহ্বান করছে না।

৩. ৭. জিহাদ বিষয়ক বিভ্রান্তি

খারিজী, বাতিনী ও অন্যান্যদের ভুলভ্রান্তির একটি মৌলিক বিষয় জিহাদ। জিহাদ বিষয়ক ভুলভ্রান্তিগুলির কয়েকটি দিক রয়েছে:

৩. ৭. ১. জিহাদ শব্দের অতি-ব্যবহার

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, জিহাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রচেষ্টা বা সংগ্রাম। আর ইসলামী শরীয়তের পারিভাষায় জিহাদ অর্থ "কিতাল" বা রাষ্ট্র ও ইসলামী দাওয়াতের নিরাপত্তার রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ। আল্লাহর নির্দেশ ও হুকুম-আহকাম পালনের সকল প্রচেষ্টাকেই শাব্দিক অর্থে জিহাদ বলা যায়, কিন্তু আভিধানিক অর্থের অতিব্যবহার পারিভাষিক অর্থের বিকৃতির সুযোগ করে দেয়। যেমন 'সালাত'-এর আভিধানিক অর্থ প্রার্থনা। যে কোনো প্রার্থনাকেই সালাত বলা যায় এবং কুরাআন-হাদীসে কখনো কখনো তা বলা হয়েছে। কিন্তু ইসলামের পরিভাষায় 'সালাত' একটি নির্দিষ্ট ইবাদাতের নাম। সকল প্রার্থনাকেই সালাত বলে নামকরণ করলে তা দ্বিমুখি বিভ্রান্তির জন্ম দিতে পারে। প্রথমত কেউ হয়ত যে কোনোভাবে প্রার্থনা করেই 'সালাত' কায়েম হয়ে গিয়েছে বলে দাবি করবেন। দ্বিতীয়ত, কেউ সালাতের ফযীলত বা আহকামের আয়াত ও হাদীসগুলি সকল প্রার্থনার ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করবেন।

কেউ যদি নিজের জীবনে দীন পালন, আত্মশুদ্ধির চেষ্টা, ইলম শিক্ষা, হালাল উপার্জন, আল্লাহর পথে দাওয়াত, অত্যাচারীর সামনে সত্য-ভাষণ, হজ্জ পালন বা দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে কোনো প্রচেষ্টাকে জিহাদ বলেন তবে তা দূষণীয় নয়, বরং তা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে এগুলিকে পারিভাষিক "জিহাদ" মনে করা হলে তা বহুমুখি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। কারণ সেক্ষেত্রে জিহাদের ফযীলত ও আহকামসমূহ এ সকল ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রবণতা দেখা দেবে।

কোনো কোনো আধুনিক গবেষক ও চিন্তাবিদ ইসলামী রাজনীতি বা রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব বুঝাতে "জিহাদ" বলে অভিহিত করেছেন। "জামাআতুল মুসলিমীন" এরূপ ব্যবহারকে তাদের বিভ্রান্তির সমর্থনে ব্যবহার করেছে। "ইসলামী রাজনীতি" বা "ইসলামী আন্দোলন"-এর মাধ্যমে "দীন প্রতিষ্ঠা" নামে মুমিন যে ইবাদতটি পালন করেন সে ইবাদতটির পারিভাষিক নাম হলো "আল্লাহর পথে দাওয়াত" বা "ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ"। এ কর্মকে "জিহাদ" বলায় অসুবিধা নেই। তবে এ কর্মই কুরআন-হাদীস নির্দেশিত পারিভাষিক জিহাদ বা বলে মনে করার মধ্যে রয়েছে সমূহ বিপদ।

আমরা বলেছি যে, ইসলামের পরিভাষায় "জিহাদ" অর্থই "কিতাল" বা যুদ্ধ। সাহাবী-তাবিয়ীগণ ও ইমামগণের ব্যবহারে এবং ফিকহ, তাফসীর বা ইসলামী জ্ঞানের যে কোনো প্রাচীন গ্রন্থে "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ" শব্দের পারিভাষিক অর্থ তালাশ করলেই পাঠক তা জানতে পারবেন। বর্তমানে অনেক আধুনিক গবেষক "ইসলামী রাজনীতি" বা "ইসলামী আন্দোলন"-কে "জিহাদ" নামে আখ্যায়িত করেন এবং একেই ইসলামী শরীয়তের পারিভাষিক জিহাদ বলে গণ্য করেন। অনেকে পারিভাষিকভাবে "জিহাদ" ও "কিতাল"-এর মধ্যে পার্থক্য করেন। কিতালকে যুদ্ধ এবং জিহাদকে আন্দোলন বলে মনে করেন। এরূপ মতামত গবেষণা বা ব্যাখ্যা হিসেবে কেউ পেশ করতে পারেন। কিন্তু ইসলামী শরীয়তের পারিভাষা বলে গণ্য করার কারণে এবং রাজনীতি, দাওয়াত, আন্দোলন ইত্যাদিকে সদা-সর্বদা জিহাদ বলে আখ্যায়িত করার কারণে ত্রিমুখি বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে:

প্রথমত, দাওয়াত, রাজনীতি, আন্দোলন ইত্যাদি কর্মে লিপ্ত মানুষ শরীয়ত নির্দেশিত "জিহাদ" ইবাদতটি পালন করছেন বলে ধারণা করছেন এবং হাদীসে ও ফিকহে জিহাদের যে সকল বিধান, সুন্নাত ও আদব বর্ণনা করা হয়েছে তা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও পালনীয় বলে মনে করছেন।

দ্বিতীয়ত, প্রচলিত রাজনীতি, আন্দোলন বা দলবদ্ধ দাওয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট না হয়ে যারা ব্যক্তিগতভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে

ওয়ায, লিখনী, শিক্ষাদান ইত্যাদি পদ্ধতিতে "আল্লাহর পথে দাওয়াত" বা "ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের" ইবাদতটি পালন করছেন তারা শরীয়তের পারিভাষিক "জিহাদ" নামক ইবাদতটি পালন করছেন না বলে মনে করা হচ্ছে।

তৃতীয়ত, প্রচলিত রাজনীতি, আন্দোলন বা দীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে শরীয়তের পারিভাষিক জিহাদ বলে বিশ্বাস করে এ জন্য বলপ্রয়োগ, অস্ত্রধারণ ও অনুরূপ বিধানকে বৈধ বলে মনে করা হচ্ছে। আমি **"এহইয়াউস সুনান"** গ্রন্থে এ সকল বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[১১৭]

বিশেষত তৃতীয় বিভ্রান্তিটি উগ্রতার জন্ম দিচ্ছে। যে সকল আলিম বা গবেষক এ সকল কর্মকে জিহাদ নামে আখ্যায়িত করছেন তাঁরা মূলত এগুলির গুরুত্ব বুঝাতে বিভিন্ন হাদীসের আলোকে আভিধানিক অর্থে তা করছেন। কোনো আলিম যখন দাওয়াত, দ্বীন প্রতিষ্ঠা, আন্দোলন, রাজনীতি, মিছিল ইত্যাদিকে জিহাদ বলে আখ্যায়িত করেন, তখন তিনি বুঝান না যে, এ কর্মের জন্য অস্ত্র ধারণ করা যাবে, অথবা এর বিরোধীদেরকে আঘাত করা যাবে। কিন্তু তিনি না বুঝালেও শ্রোতা, পাঠক বা সংশ্লিষ্ট অনেকেই তা বুঝছেন। জামাআতুল মুসলিমীন ও উগ্রতায় লিপ্ত অন্যান্য মানুষের লিখনি ও বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, সমকালীন আলিম ও গবেষকদের এ সকল বক্তব্য থেকে তারা এরূপই বুঝেছেন। এ সকল বক্তব্য থেকে তারা বুঝেছেন যে, মানুষদেরকে আল্লাহর পথে নিয়ে আসার ও ইসলাম প্রতিষ্ঠা বা ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হলো জিহাদ। আর জিহাদ হলে তো মারামারি, অস্ত্রধারণ, যুদ্ধ ও হত্যা হবেই।

বস্তুত, উগ্রতার ভিত্তি দুটি বিষয়ের উপর:

প্রথমত, জিহাদই ইসলাম প্রচার বা প্রতিষ্ঠার পথ বলে দাবি করা।

দ্বিতীয়ত, জিহাদের জন্য অস্ত্রধারণ, হত্যা, মৃত্যুবরণ ইত্যাদিকে বৈধ বা আবশ্যকীয় বলে দাবি করা।

কুরআন-হাদীস ও ইসলামের ইতিহাস থেকে দ্বিতীয় বিষয়টি প্রমাণ করা তাঁদের জন্য খুবই সহজ বিষয়। এজন্য তাঁদের বিভ্রান্তির মূল উৎস প্রথম বিষয়ের মধ্যে নিহিত। আমরা দেখেছি যে, পারিভাষিক 'জিহাদ' কখনোই ইসলাম, ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যম নয়। জিহাদ প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও নাগরিক ও দীনী দাওয়াতের নিরাপত্তা রক্ষার মাধ্যম। কিন্তু জিহাদ শব্দের অতি-ব্যবহারে ফলে অনেকের মনেই বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে, জিহাদই দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথ বা একমাত্র পথ এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করা সকলের জন্য ফরয।

জঙ্গিদের প্রচারকর্ম এতে অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। তারা কিছু সরলপ্রাণ আবেগী যুবককে সহজেই একথা বুঝাতে পারছে যে, জিহাদই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রথম ফরয, জিহাদ ছাড়া ইসলাম কায়েম হবে না। আর জিহাদ মানেই তো অস্ত্র, যুদ্ধ ও হত্যা, কাজেই এখনই আমাদের সে কাজে নেমে পড়তে হবে। এভাবেই গুরুত্বারোপের জন্য একটি পরিভাষার আভিধানিক অর্থের অতিব্যহার বিভিন্ন বিভ্রান্তির পথ উন্মুক্ত করছে।

পক্ষান্তরে দীন প্রতিষ্ঠার এ সকল কর্মকে "আল্লাহর পথে দাওয়াত" নামে আখ্যায়িত করলে একদিকে যেমন সঠিক ইসলামী পরিভাষার ব্যবহারের মাধ্যমে উপর্যুক্ত ত্রিবিধ অস্পষ্টতা বা বিভ্রান্তির পথ রুদ্ধ হবে, তেমনি অন্যদিকে এ সকল ইবাদত পালনের সঠিক সুন্নাত ও ইসলামী আদব জানা সহজ হবে। কারণ দীন প্রতিষ্ঠার এ সকল কর্মকে সর্বদা জিহাদ বলে আখ্যায়িত করার ফলে আগ্রহী মুমিন এ সকল কর্মের ইসলামী নির্দেশনা, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাত ও ইসলামী আদব জানার জন্য হাদীস ও ফিকহের "জিহাদ" অধ্যায় অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করেন, "আল্লাহর পথে দাওয়াত" বা "ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ" অধ্যায় অধ্যয়নের কথা তার মনে আসে না।

আমরা আশা করি যে, দীনী দাওয়াতের এ সকল ময়দানে যারা কর্মরত এবং এ সকল বিষয়ে যারা গবেষণা করছেন, তারা এ সকল কর্মকাণ্ডের পারিভাষিক পরিচয় নিশ্চিত করবেন। এগুলিকে "ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ" বা "আল্লাহর পথে দাওয়াত" নামে আখ্যায়িত করলে ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী দাওয়াতের আবেগ ও জযবাকে বিপথগামী করার বা সহিংসতায় পর্যবসিত করার একটি বড় পথ রুদ্ধ হবে বলে আশা করা যায়। মহান আল্লাহই ভাল জানেন এবং তিনিই তাওফীক দাতা।

৩. ৭. ২. জিহাদ ফরয আইন এবং বড় ফরয

নিজের জীবনের চেয়ে অন্যের জীবনে দীন প্রতিষ্ঠার আবেগে প্রাচীন ও আধুনিক খারিজীগণ "জিহাদ" নামক ইবাদতকে "ফরয আইন" বা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয বলে দাবি করেছেন। উপরন্তু তারা "জিহাদ"-কে মুমিনের জীবনের সবচেয়ে বড় ফরয বলে দাবি করেছে। প্রাচীন খারিজীগণের মতামত বর্ণনায় একজন গবেষক লিখেছেন:

"The second principle that flowed from their aggressive idealism was militancy, or jihād, which the Khawārij considered to be among the cardinal principles, or pillars, of Islām. Contrary to the orthodox view, they interpreted the Qurānic command about 'enjoining good and forbidding evil' to mean the vindication of truth through the sword"... "To these five, the Khawārij sect added a sixth pillar, the jihād". "খারিজীদের আগ্রাসী আদর্শবাদের দ্বিতীয় ভিত্তি ছিল জিহাদ। খারিজীগণ জিহাদকে ইসলামের মূল ভিত্তি বা রুকন বলে মনে করে। সাধারণ মুসলিমদের মতের বিপরীতে খারিজীগণ কুরআন নির্দেশিত 'সৎকাজে আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ' বলতে তরবারীর জোরে সত্য প্রতিষ্ঠা বুঝাতো।... তারা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের

সাথে জিহাদকে ষষ্ঠ স্তম্ভ হিসেবে যুক্ত করে... ।"[১১৮]

আবেগী খারিজীগণ সর্বদা জিহাদের অতুলনীয় সাওয়াব ও গুরুত্ব বিষয়ক আয়াতগুলিকে তাদের মতের পক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করত। তাদের উদ্ধৃত আয়াত ও হাদীস জিহাদের গুরুত্ব প্রমাণ করে। কিন্তু কখনোই তাকে সর্বোচ্চ বা সর্বশ্রেষ্ঠ ফরয বলে প্রমাণ করে না। প্রকৃত কথা যে, ইসলামে মুসলিমের উপর অনেক কর্ম ফরয করা হয়েছে। সকল ফরয কর্মই গুরত্বপূর্ণ। তবে সেগুলির মধ্যে কোনোটির চেয়ে কোনোটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। গুরুত্বের বেশিকম সাধারণভাবে সকলের জন্য হতে পারে আবার ব্যক্তিগত অবস্থার কারণে হতে পারে। সর্বাবস্থায় গুরুত্বের কমবেশি আবেগ বা যুক্তি দিয়ে নয়, বরং 'সুন্নাতের' আলোকে বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আজীবনের কর্ম, শিক্ষা ও আচরণের মধ্য থেকে বুঝতে হবে। আর কুরআন, হাদীস এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের আচরিত প্রায়োগিক সুন্নাতের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, জিহাদ সবচেয়ে ফরয নয়, দীনের রুকনও নয় এবং ফরয আইনও নয়। বরং জিহাদ ফরয কিফায়া ইবাদত। আমরা ইতোপূর্বে বিষয়টি আলোচনা করেছি।

৩. ৭. ৩. খারিজীগণের বিভ্রান্তি অপনোদনে সাহাবীগণ

হাদীসের গ্রন্থগুলিতে সাহাবী-তাবিয়ীগণের সাথে খারিজীগণের বিভিন্ন সংলাপ উদ্ধৃত করা হয়েছে। এগুলি থেকে আমরা খারিজীগণের মতামত ও তাদের বিভ্রান্তি অপনোদনে সাহাবীগণের প্রচেষ্টার বিষয়ে জানতে পারি। সাহাবীগণের বক্তব্য থেকে নিম্নের বিষয়গুলি প্রতীয়মান হয়:

(১) আরকানে ইসলাম ও এ জাতীয় ইবাদতই মুমিনের মূল দায়িত্ব। এগুলি 'উদ্দিষ্ট' ইবাদত বা এগুলি পালন করাই মুমিন জীবনের উদ্দেশ্য। এগুলি পালনের আবশ্যকতা কখনোই কমে না বা থামে না। পক্ষান্তরে 'জিহাদ' উদ্দিষ্ট ইবাদত নয়; বরং উদ্দিষ্ট ইবাদত পালনের অধিকার রক্ষার জন্যই জিহাদ। এ অধিকার বিদ্যমান থাকলে জিহাদের আবশ্যকতা থাকে না।

(২) ফিতনা দূরীকরণ জিহাদের উদ্দেশ্য। তবে ফিতনা দূরীকরণ বলতে সমাজের সকল অন্যায়, অনাচার, কুফর, শিরক ইত্যাদি দূর করা নয়, বরং মুমিনকে জোরপূর্বক কুফরে লিপ্ত হওয়ার পরিস্থিতি দূরীকরণ বা দীনপালন ও দীনী দাওয়াতের স্বাধীনতা রক্ষা করা। এরূপ পরিস্থিতি ছাড়া জিহাদ মূলত ফিতনা দূর করে না, বরং ফিতনা সৃষ্টি করে।

(৩) জিহাদ করা আল্লাহর নির্দেশ এবং মানুষ হত্যা করা আল্লাহর নিষেধ। নিষেধের পাল্লাকে ভারী রাখতে হবে এবং হারামে নিপতিত হওয়ার ভয় থাকলে জিহাদ পরিত্যাগ করতে হবে।

(৪) কাফির রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাধ্যমে রাষ্ট্র, নাগরিক ও দীনী দাওয়াতের স্বাধীনতা ও বিজয় সংরক্ষণই মূলত জিহাদ। মুসলিম ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা হত্যা জিহাদ নয়। যে ব্যক্তি নিজেকে মুমিন বলে দাবি করে বা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' মুখে স্বীকার করে তাকে জিহাদের নামে হত্যা করা পারলৌকিক ধ্বংসের অন্যতম কারণ।

এ প্রসঙ্গে খারিজীদের সাথে ইবনু উমারের (রা) কিছু কথোপকথন আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি। খারিজীগণের দাবি ছিল, মানুষ যখন অন্যায় অনাচারে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তখন জিহাদ বাদ দিয়ে হজ্জ-উমরায় রত থাকা আপত্তিকর। এর উত্তরে ইবনু উমার (রা) বলেন যে, ফযীলত, পুরস্কার ইত্যাদি কখনোই কোনো ইবাদতের শ্রেষ্টত্ব প্রমাণ করে না, বরং এ জন্য কুরআন বা হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রয়োজন। কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা থেকে জানা যায় যে জিহাদ আরকানে ইসলামের মত কোনো ফরয ইবাদত নয়। যেখানে জিহাদের নামে মুসলিম হত্যা বা ভাতৃহত্যার সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে ফযীলত অর্জনের চেয়ে হারাম বর্জন মুমিনের দায়িত্ব। পক্ষান্তরে হজ্জ ইসলামের পাঁচ রুকনের একটি, কাজেই সর্বাবস্থায় এ ইবাদত মুমিন পালন করতে পারে।

অন্য হাদীসে দুব্যক্তি ইবনু উমারের (রা) কাছে এসে বলেন:

إِنَّ النَّاسَ ضُيِّعُوا، وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ فَقَالَ يَمْنَعُنِي أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِي فَقَالا أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ) فَقَالَ قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ وَكَانَ الدِّينُ لِلَّهِ وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللَّهِ

মানুষেরা (অন্যায় অনাচার ও পাপে) ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আপনি ইবনু উমার, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী, আপনি কেন বেরিয়ে যুদ্ধে অংশ নিচ্ছেন না? তিনি বলেন, 'আল্লাহ আমার ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছেন এ-ই আমাকে যুদ্ধে বেরোতে নিষেধ করছে। তারা বলে, আল্লাহ কি বলেন নি, 'এবং তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাবৎ ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়'? তখন তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধ করেছিলাম এবং ফিতনা দূরীভূত হয়েছিল এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর তোমরা চাচ্ছ যে, তোমরা যুদ্ধ করবে যেন ফিতনা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দীন আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য হয়।"[১১৯]

এখানেও আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) **প্রথমত,** জিহাদের আদেশ ও হত্যার নিষেধাজ্ঞার মধ্যে তুলনা করছেন, যা আমরা পূর্বের কথোপকথনেও দেখেছি। জিহাদের আদেশ করা হলেও তার পরিত্যাগের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে মানুষের রক্তপাত ভয়ঙ্করতম হারাম। কাজেই পরিত্যাগযোগ্য একটি দায়িত্ব পালনের জন্য মুমিন কখনোই ভয়ঙ্করতম একটি হারামে লিপ্ত হতে পারেন না।

দ্বিতীয়ত, তিনি 'জিহাদ-কিতাল' ও 'ফিতনা' বা সন্ত্রাসের মধ্যে পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, সাহাবীগণ যে কিতাল করেছিলেন তা ছিল ফিতনা রোধ করতে, আর খারিজীগণ যে কিতাল করছে তা ফিতনা প্রতিষ্ঠার জন্য। তিনি এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্যের কারণ উল্লেখ করেন নি। আমরা দেখেছি যে, ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ ও ফিতনা বা সন্ত্রাসের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য যে, জিহাদ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত যুদ্ধ যা শুধু শত্রু যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এবং ফিতনা-সন্ত্রাস ব্যক্তি বা গোষ্ঠি পরিচালিত যুদ্ধ যা সাধারণত যোদ্ধা-অযোদ্ধা সকলের বিরুদ্ধে পরিচালিত।

কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা অনুসারে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশে ও নেতৃত্বেই জিহাদ-কিতাল পরিচালিত হবে। খারিজীগণ বিষয়টিকে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠিগত পর্যায়ে নিয়ে এসে সন্ত্রাসের জন্ম দেয়। বস্তুত, হত্যা, বিচার, শক্তিপ্রয়োগ ইত্যাদি বিষয় যদি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত না হয় তবে তা ফিতনার মহাদ্বার উন্মোচন করে। পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষই অন্য কোনো না কোনো মানুষের দৃষ্টিতে অন্যায়কারী ও অপরাধী। প্রত্যেক ব্যক্তি বা গোষ্ঠি যদি নিজের মত অনুসারে বিচার, যুদ্ধ ও শক্তিপ্রয়োগ করতে থাকে তবে তার চেয়ে বড় ফিতনা আর কিছুই হতে পারে না।

অন্য হাদীসে তাবিয়ী নাফি বলেন, এক খারিজী নেতা আব্দুল্লাহ ইবনু উমারের (রা) নিকট এসে বলেন:

يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَحُجَّ عَامًا وَتَعْتَمِرَ عَامًا وَتَتْرُكَ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ عَلِمْتَ مَا رَغَّبَ اللَّهُ فِيهِ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ إِيمَانٍ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالصَّلاةِ الْخَمْسِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَأَدَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ قَالَ يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ أَلا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ) (قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ) قَالَ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى ﷺ وَكَانَ الإِسْلامُ قَلِيلا فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ إِمَّا قَتَلُوهُ وَإِمَّا يُعَذِّبُونَهُ حَتَّى كَثُرَ الإِسْلامُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ

হে আবূ আব্দুর রাহমান, কি কারণে আপনি এক বছর হজ্জ করেন আরেক বছর উমরা করেন এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ পরিত্যাগ করেন? অথচ আপনি জানেন যে, আল্লাহ জিহাদের জন্য কী পরিমাণ উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন? তখন ইবনু উমার (রা) বলেন, ভাতিজা, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাঁচটি বিষয়ের উপর: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) প্রতি ঈমান, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রামাযানের সিয়াম, যাকাত ও বাইতুল্লাহর হজ্জ। উক্ত ব্যক্তি বলে, হে আবূ আব্দুর রাহমান, আল্লাহ তাঁর কিতাবে কী বলেছেন তা কি আপনি শুনছেন না? তিনি বলেছেন: 'মুমিনগণের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর তাদের একদল অপর দলের উপর সীমলঙ্ঘন করলে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।' (তিনি আরো বলেছেন): 'এবং তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাবৎ ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়'[১২০]। তখন ইবনু উমার বলেন, আমরা তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে তা করেছিলাম। ইসলাম দুর্বল ও স্বল্প ছিল, ফলে মুসলিম ব্যক্তি তার দীনের কারণে ফিতনাগ্রস্থ হতেন। কাফিররা তাকে হত্যা করত অথবা তার উপর অত্যাচার করত। যখন ইসলাম বিস্তৃত হয়ে গেল তখন তো আর ফিতনা থাকল না।"[১২১]

এখানেও খারিজীগণ কুরআনের দু-একটি আয়াতের উপর ভিত্তি করে ইবনু উমার (রা)-এর জিহাদ পরিত্যাগ করে হজ্জ উমরা পালনকে আপত্তিকর বলে দাবি করেছে। ইবনু উমার (রা) তাদের বিভ্রান্তি অপনোদনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর বক্তব্য থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় বুঝতে পারি:

প্রথমত, শুধু ফযীলত, নির্দেশনা বা প্রেরণামূলক আয়াত ও হাদীসের ভিত্তিতে কোনো ইবাদতের গুরুত্ব নির্ধারণ করা যায় না। কুরআন কারীম ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামগ্রিক শিক্ষার আলোকেই তা নির্ধারণ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, কুরআন কারীমে সালাত, সিয়াম, যাকাত, জিহাদ, দাওয়াত, আদেশ, নিষেধ ইত্যাদি অনেক ইবাদতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এগুলির মধ্যে কোন্টি অধিকগুরুত্বপূর্ণ এবং কোনটি কম গুরুত্বপূর্ণ, কোনটি ব্যক্তিগত এবং কোনটি কোনটি সামষ্টিক, কোনটি রাষ্ট্রীয়, কোন্টি সকলের জন্য সার্বক্ষণিক পালনীয়, কোন্টি বিশেষ অবস্থায় পালনীয় ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয় নি। এ সকল কুরআনী নিদেশ যিনি গ্রহন করেছেন, তাঁর বাস্তব প্রয়োগ ও নির্দেশনা থেকেই এ সকল বিষয় বিস্তারিত জানা যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ থেকে জানা যায় যে, কুরআনে উল্লিখিত সকল নির্দেশের মধ্যে এ পাঁচটি কর্ম সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপর্ণ এবং এগুলির উপরেই দীনের ভিত্তি। জিহাদ, দাওয়াত, আদেশ-নিষেধ, দীন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ইবাদতের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তবে সেগুলির পালনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অবস্থার আলোকে যে ছাড় বা সুযোগ আছে তা আরকানে ইসলামের ক্ষেত্রে নেই। তাঁরা বুঝতেন যে, জিহাদ আরকানে ইসলামের মত ব্যক্তিগত ফরয ইবাদত নয় যে, তা পরিত্যগ করলে গোনাহ হবে। বরং

বিভিন্ন হাদীসে শুধুমাত্র আরকানে ইসলাম পালনকারীকে পূর্ণ মুসলিম ও জান্নাতী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১২২] অন্যান্য হাদীসে জিহাদের গুরুত্ব বর্ণনার সাথে সাথে জিহাদ পরিত্যাগকারী আরকান পালনকারী মুমিনেরও প্রশংসা করা হয়েছে।[১২৩]। অনেক হাদীসে বিশৃঙ্খলা, ফিতনা বা হানাহানির সময়ে, আদেশ, নিষেধ, দাওয়াত ও জিহাদ পরিত্যাগের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।[১২৪] অন্যত্র পিতামাতার খেদমত বা আনুষঙ্গিক প্রয়োজনের জন্য জিহাদ পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[১২৫]

ইবনু উমার নিজেও কাফির রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন। তবে জিহাদের অনেক শর্ত রয়েছে, সেগুলির অন্যতম যে, জিহাদ শুধু যুদ্ধরত কাফিরের বিরুদ্ধেই হবে। মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক মুসলিম বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যদিও বৈধ করা হয়েছে, কিন্তু ইবনু উমার (রা) ও অন্যান্য অধিকাংশ সাহাবী এক্ষেত্রে দূরে থাকাই পছন্দ করতেন, কারণ ভুল জিহাদে কোনো মুসলিমকে হত্যা করার চেয়ে, সঠিক জিহাদ থেকে বিরত থাকা উত্তম।

তৃতীয়ত, তাঁরা ফিতনা দূরীকরণ ও আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মুসলিমের দীন পালনের নিরাপত্তাটিই মূল বলে মনে করেছেন। মুসলিম যতক্ষণ দীন পালনের নিরাপত্তা ভোগ করছেন ততক্ষণ ফিতনা দূরীভূত করার নামে যুদ্ধ করার সুযোগ নেই। বরং দাওয়াত, আদেশ, নিষেধ ইত্যাদির মাধ্যমে সমস্যা দূর করার চেষ্টা করতে হবে।

চতুর্থত, তিনি আদেশ ও নিষেধের মধ্যে তুলনা করেছেন। খারিজীদের দাবি ছিল, আল্লাহ ফিতনা দূর করার জন্য যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। বিশেষত মুমিনদের পারস্পারিক যুদ্ধের সময় জালিম মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ। এরূপ সুস্পষ্ট নির্দেশের পরেও যুদ্ধ না করে বসে থাকা কোনো মুমিনের পক্ষে কিভাবে সম্ভব হয়?

ইবনু উমার (রা) বুঝালেন যে, এখানে আদেশের বিপরীতে নিষেধ রয়েছে, আর এক্ষেত্রে নিষেধের পাল্লাই ভারী থাকবে। এ সকল আয়াতে যেমন কিতালের নির্দেশ দেওয়া তেমনি অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

"যে ব্যক্তি কোনো একজন মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার প্রতিফল জাহান্নাম, তথায় সে চিরস্থায়ী থাকবে এবং আল্লাহ তার উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তাকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তার জন্য ভয়ঙ্কর আযাব প্রস্তুত করেছেন।"[১২৬]

বস্তুত কুরআন কারীমে এর চেয়ে কঠিনতর ভাষায় কোনো পাপের শাস্তি বর্ণনা করা হয় নি। ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো একজন মুমিনকে হত্যা করার জন্য ৫ পর্যায়ের শাস্তির কথা বলা হয়েছে, যার একটি আরেকটির চেয়ে ভয়ঙ্করতর: জাহান্নাম, তথায় চিরস্থায়িত্ব, আল্লাহর ক্রোধ, আল্লাহর অভিশাপ এবং ভয়ঙ্কর শাস্তি। এর বিপরীতে শতভাগ নিশ্চিত ফরয জিহাদ পরিত্যাগ করলে এরূপ বা এর কাছাকাছি কোনো শাস্তির কথা বলা হয় নি।

মুমিন হত্যা তো দূরের কথা মুসলিম সমাজে বসবাসরত কোনো অমুসলিম নাগরিক, অথবা শত্রু রাষ্ট্র থেকে আইনানুগ নিরাপত্তা নিয়ে মুসলিম দেশে আগত অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করলেও সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধি লাভ করতে পারবে না বলে হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই কোনো মুমিনই জিহাদ, কিতাল বা যুদ্ধের নামে এরূপ কঠিন পাপের মধ্যে নিজেকে নিপতিত করতে পারে না।

সাহাবী জুনদুব ইবনু আব্দুল্লাহ (৬০ হি)। একবার খারিজীদের কতিপয় নেতাকে ডেকে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُقْ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ... وَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لا يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفِّهِ مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ (كَأَنَّمَا يَذْبَحُ دَجَاجَةً، كُلَّمَا تَقَدَّمَ لِبَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ)

"যে ব্যক্তি কাঠিন্য বা উগ্রতার পথ অবলম্বন করবে আল্লাহও কিয়ামতের দিন তার জন্য কাঠিন্যের পথ অবলম্বন করবেন। কেউ যদি কোনো মানুষের হাতের তালুতে রাখার মত সামান্য রক্তও প্রবাহিত করে (যেন যে মুরগী জবাই করছে) তবে সে রক্ত তার ও জান্নাতের মধ্যে বাধা হবে। (যখনই সে জান্নাতের কোনো দরজার দিকে অগ্রসর হবে, তখনই ঐ রক্ত তার জান্নাতে প্রবেশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে)। কাজেই যদি কেউ পারে তবে সে যেন এরূপ রক্তপাত থেকে আত্মরক্ষা করে।"

এ কথা শুনে উপস্থিত লোকগুলি খুব ক্রন্দন করতে লাগল। তখন জুনদুব (রা) বলেন, এরা যদি সত্যবাদী হয় তবে এরা মুক্তি পেয়ে যাবে।.. কিন্তু পরে আবার তারা উগ্রতার পথে ফিরে যায়।[১২৭]

জুনদুব (রা) দুটি বিষয়ের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন:

প্রথমত, উগ্রতার ভয়াবহতা। উগ্রতার দুটি দিক রয়েছে। প্রথম দিক, নিজের ব্যক্তিগত জীবনে দীন পালনের জন্য নফল-মুস্ত াহাব ইত্যাদি বিষয়ে অতি কষ্টদায়ক রীতি অনুসরণ করা। দ্বিতীয় দিক, অন্য মানুষদের ভুলভ্রান্তি সংশোধনকে নিজের অন্যতম বোঝা

বলে গ্রহণ করা এবং সেজন্য উগ্রতার পথ অবলম্বন করা। দুটি বিষয়ই সুন্নাতের পরিপন্থী কর্ম যা মুমিনের জীবনে দীন পালনকে কঠিন করে তোলে।

দ্বিতীয়ত, তিনি জিহাদের নামে হত্যা বা রক্তপাতের ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সালাত, সিয়াম, যিক্‌র ইত্যাদি ইবাদতের মত ইবাদত নয় জিহাদ। এ সকল ইবাদত যদি কোনো কারণে ভুল হয় তবে তাতে ইবাদতকারী কঠিন পাপের মধ্যে নিপতিত হয় না। পক্ষান্তরে জিহাদ বিচারের মত বান্দার হক জড়িত ইবাদত। আমরা দেখেছি যে, বিচারকের ভুলে নিরপরাধীর সাজা হওয়ার চেয়ে অপরাধীর বেঁচে যাওয়া বা সাজা কম হওয়া ভাল। অনুরূপভাবে জিহাদের নামে ভুল মানুষকে হত্যা করার চেয়ে জিহাদ না করা অনেক ভাল। জিহাদের নামে ভুল মানুষকে হত্যা করলে শত পুন্য করেও জান্নাত থেকে বঞ্চিত হতে হবে। পক্ষান্তরে জিহাদ বর্জনের কারণে এরূপ শাস্তিলাভের সম্ভাবনা নেই।

এখানে লক্ষণীয় যে, জ্ঞান ও অনুভূতি আসার পরেও তারা উগ্রতা পরিত্যাগ করতে পারল না। এর কারণ সম্ভবত এদের মধ্যে সকলেই সৎ ও আন্তরিক ছিল না। এ সকল সন্ত্রাসী কর্মের মাধ্যমে ক্ষমতা, সম্পদ ও অন্যান্য জাগতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যও অনেকের ছিল। অথবা উগ্রতার উন্মাদনা ও সঙ্গীসাথীদের অপপ্রচার তাদেরকে আবারো বিপথগামী করে।

খারিজীগণের বিভ্রান্তি অন্যতম ছিল ঈমানের দাবিদারকে বিভিন্ন যুক্তিতে কাফির বলে গণ্য করে তাকে হত্যা করা। আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদে এ বিষয়টি আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। তাদের এ বিষয়ক বিভ্রান্তি অপনোদনের জন্য সাহাবীগণ বিভিন্নভাবে তাদেরকে হত্যার ভয়াবহতা বুঝাতেন। তাঁরা তাদেরকে বুঝাতেন যে, জিহাদের বা যুদ্ধের সকল শর্ত পূরণ হলেও যদি কেউ যুদ্ধের ময়দানে নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে তাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ।

এ বিষয়ে এক হাদীসে তাবিয়ী সাফওয়ান ইবনু মুহরিয বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের ফিতনার সময়ে সাহাবী জুনদুব ইবনু আব্দুল্লাহ বাজালী (রা) এ সকল সংঘাতের বিষয়ে আগ্রহী কতিপয় ব্যক্তিকে ডেকে একত্রিত করে তাদেরকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠকারী ঈমানের দাবিদার কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করার পরিণতি থেকে সাবধান করার জন্য বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফিরদের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। যুদ্ধের মাঠে একজন কাফির সৈনিক দুর্দমনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করে এবং মুসলিম বাহিনীর অনেক সৈনিককে হত্যা করে। এক পর্যায়ে উসামা ইবনু যাইদ (রা) উক্ত কাফির সৈনিককে আক্রমন করেন। তিনি যখন তাকে হত্যা করতে উদ্যত হন তখন উক্ত কাফির সৈনিক 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে। উসামা সে অবস্থাতেই তাকে হত্যা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উসামাকে বলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলার পরেও তুমি তাকে কেন হত্যা করলে? তিনি বলেন, লোকটি মুসলিম বাহিনীকে অনেক কষ্ট দিয়েছে অমুক, অমুককে হত্যা করেছে, আমি যখন তরবারী উঠালাম সে তরবারীর ভয়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তুমি তার হৃদয় চিরে দেখে নিলে না কেন, সে ভয়ে বলেছে না স্বেচ্ছায় বলেছে! কেয়ামতের দিন যখন এ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' উপস্থিত হবে তখন তুমি কী করবে? কেয়ামতের দিন যখন এ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' উপস্থিত হবে তখন তুমি কী করবে? এভাবে তিনি বারবারই বলতে লাগলেন, কেয়ামতের দিন যখন এ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' উপস্থিত হবে তখন তুমি কী করবে?[১২৮]

এভাবে বিভিন্ন হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবীগণ ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলা ও তাকে হত্যা করার কঠিন পরিণতি সম্পর্কে এদেরকে সাবধান করছেন।

৩. ৮. তাকফীর বা কাফির কথন

৩. ৮. ১. কুফর ও তাক্‌ফীর

কুফর অর্থ অবিশ্বাস। আর তাক্‌ফীর অর্থ কাউকে অবিশ্বাসী বা ধর্মত্যাগী বলে আখ্যায়িত করা। যে ব্যক্তি নিজেকে মুমিন বলে দাবি করেন তাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করাকে "তাক্‌ফীর" বলা হয়।

কোনো কাজকে কুফরী বলে গণ্য করা এবং এ কাজের জন্য কোনো মুসলিমকে কাফির বলার মধ্যে আসমান-যমীনের পার্থক্য রয়েছে। ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, খারিজীগণের পূর্বসূরী যুল খুওয়াইসিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্মের কঠিন সমালোচনা করে, যা ছিল সুস্পষ্ট কুফরী। আমরা যে কেউ বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্যায় করেছেন বলে ধারণা করা বা তাঁর প্রতি অবিশ্বাস ও কুধারণা পোষণ করা কুফরী। কিন্তু খালিদ ইবনু ওয়ালিদ যখন ধর্মত্যাগের শাস্তি হিসেবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "না। হয়তবা লোকটি সালাত আদায় করে।" খালিদ (রা) বলেন, "কত মুসল্লীই তো আছে যে মুখে যা বলে তার অন্তরে তা নেই।" তখন রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয় নি যে, আমি মানুষের অন্তর খুঁজে দেখব বা তাদের পেট ফেড়ে দেখব।"

অর্থাৎ লোকটি নিজেকে মুসলিম দাবি করে এবং ইসলামের ব্যাহ্যিক কিছু কর্ম করে। কাজেই লোকটি যে কুফরী কথা বলেছে তার কোনো ওযর আছে বলে ধরে নিতে হবে।

পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যক্তির অনুগামীদের বিষয়ে জানান যে, এরা শিকারের দেহভেদকারী তীরের ন্যায় ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। তারা ইসলামে অনুসারীদের হত্যা করবে এবং প্রতিমা-পাথরের অনুসারীদের ছেড়ে দেবে। শেষে তিনি বলেন: "আমি যদি তাদেরকে পাই তবে সামূদ সম্প্রদায়কে যেভাবে নির্মুল করা হয়েছিল সেভাবেই আমি তাদেরকে হত্যা করে নির্মুল করব।"

এ বিষয়টিও লক্ষণীয়। এ সকল মানুষ যখন মুসলিমদের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হবে তখন তিনি তাদেরকে হত্যা করবেন বলে জানালেন। কিন্তু এরূপ পাপে লিপ্ত হওয়ার আগে তাদেরকে ধর্মত্যাগের অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দিতে রাজি হলেন না। কারণ যে ব্যক্তি নিজেকে মুমিন দাবি করছে তার কথার ওজর পাওয়া গেলে তা গ্রহণ করে তাকে মুসলিম বলে গণ্য করতে হবে। তবে সে যদি হত্যা, সন্ত্রাস বা অনুরূপ মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার মত কোনো অপরাধে লিপ্ত হয় তখন তাকে এ অপরাধের জন্য শাস্তি দিতে হবে।

আমরা দেখেছি যে, পাপের কারণে মুমিনকে কাফির বলা খারিজী সন্ত্রাসের মূল ভিত্তি ছিল। পক্ষান্তরে সাহাবীগণ এবং তাঁদের পরে মুসলিম উম্মাহর ইমাম ও আলিমগণ একমত যে, পাপের কারণে মুমিনকে কাফির বলা যায় না। কারণ, কুরআন ও হাদীসে যেমন বিভিন্ন পাপকে 'কুফরী' বলা হয়েছে, তেমনি কঠিন পাপে লিপ্ত ব্যক্তিকেও মুমিন বলা হয়েছে। এ সকল আয়াত ও হাদীসের আলোকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহচার্যে লালিত সাহাবীগণ বলতেন যে, কুরআন কারীমে ব্যবহৃত কুফর, নিফাক, ফিসক ও জুলম দু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে: কখনো তা অবিশ্বাস, ঈমানের অনুপস্থিতি ও চূড়ান্ত অন্যায় অর্থে এবং কখনো তা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতার পাপ, মুনাফিকের গুণ ও সাধারণ পাপ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এ বিষয়ক আয়াত, হাদীস ও বিভিন্ন মতামত **"কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা"** গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।[১২৯]

উক্ত গ্রন্থে বিভিন্ন হাদীসের আলোকে আমরা দেখেছি যে, ওযর, ব্যাখ্যা, অজ্ঞতা বা না-বুঝার কারণে সুস্পষ্ট কুফরী কর্ম বা কথা বলা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কাফির বলে গণ্য করা হয় নি। এ দ্বারা উক্ত কর্ম বা কথাকে বৈধতা দেওয়া হয় নি, কিন্তু ব্যক্তির ওযর গ্রহণ করা হয়েছে। অজ্ঞতার ওযর সম্পর্কে এক হাদীসে হুযাইফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

يَدْرُسُ الإِسْلامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ حَتَّى لا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلا صَلاةٌ وَلا نُسُكٌ وَلا صَدَقَةٌ وَلَيُسْرَى (وَيسْرِي النسيان) عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ فَلا يَبْقَى فِي الأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنْ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَنَحْنُ نَقُولُهَا. فَقَالَ لَهُ صِلَةُ مَا تُغْنِي عَنْهُمْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَهُمْ لا يَدْرُونَ مَا صَلاةٌ وَلا صِيَامٌ وَلا نُسُكٌ وَلا صَدَقَةٌ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ ثَلاثًا كُلَّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ يَا صِلَةُ تُنْجِيهِمْ مِنْ النَّارِ ثَلاثًا

"কাপড়ের নকশি যেমন মলিন হয়ে মুছে যায় তেমনি মলিন ও বিলীন হয়ে যাবে ইসলাম। এমনকি মানুষ জানবে না যে, সালাত কী? সিয়াম কী? হজ্জ কী, যাকাত কী? এক রাতে কুরআন অপসারিত হবে (বিস্মৃতি কুরআনকে আবৃত করবে) ফলে পৃথিবীতে কুরআনের কোনো আয়াত অবশিষ্ট থাকবে না। অনেক বয়স্ক নারীপুরুষ রয়ে যাবে যারা বলবে, আমার আমাদের পিতা-পিতামদেরকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" কালিমাটি বলতে শুনতাম কাজেই আমরা তা বলি।" তখন সিলাহ নামক এক শ্রোতা বলেন, "তারা সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত কিছুই জানে না, কাজেই তাদের জন্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কোনো কাজে লাগবে না।" তখন হুযাইফা মুখ ফিরিয়ে নেন। সিলাহ তিনবার কথাটি বলেন এবং তিনবারই হুযাইফা মুখ ফিরিয়ে নেন। তৃতীয়বারে তিনি বলেন: "হে সিলাহ, এ কালিমাটি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবে।" তিনি তিনবার একথাটি বললেন।"[১৩০]

ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলা সন্ত্রাস ও অশান্তির প্রথম পদক্ষেপ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়ে তার উম্মাতকে সতর্ক করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلا رَجَعَتْ عَلَيْهِ

"যদি কোনো ব্যক্তি তার ভাইকে কাফির বলে, তবে এ কথা দু জনের একজনরে উপর প্রযোজ্য হবে। যদি তার ভাই সত্যিই কাফির হয় তবে ভাল, নইলে যে তাকে কাফির বলল তার উপরেই কুফরী প্রযোজ্য হবে।"[১৩১]

কোনো ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলা তাকে হত্যা করার মতই কঠিনতম অপরাধ। সাবিত ইবনু দাহহাক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ

"যদি কেউ কোনো মুমিনকে কুফরীতে অভিযুক্ত করে তবে তা তাকে হত্যা করার মতই অপরাধ।"[১৩২]

এ অর্থে ৮/১০ জন সাহাবী থেকে বিভিন্ন সহীহ সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কুরআন-হাদীসের এ সকল নির্দেশনার আলোকে এবং কুরআন-হাদীসের সকল বক্তব্যের সামগ্রিক ও সমন্বিত অর্থের উপর নির্ভর করে সাহাবীগণ এবং তাদের অনুসারী পরবর্তী সকল যুগে মুসলিম উম্মাহর মূলধারার, অর্থাৎ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুসলিমগণ ঈমানের দাবিদার কাউকে কাফির বলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন।

তাদের মুলনীতি এ-ই যে, মুমিন নিজের ঈমানের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকবেন। সকল কুফর, শিরক, পাপ, অন্যায়, অবাধ্যতা ও ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী চিন্তাচেতনা থেকে সতর্কতার সাথে আত্মরক্ষা করবেন। কিন্তু অন্যের ঈমানের দাবি গ্রহণ করার বিষয়ে বাহ্যিক দাবির উপর নির্ভর করবেন। কোনো ঈমানের দাবিদারকেই কাফির না বলার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করবেন। ভুল করে কোনো মু'মিনকে কাফির মনে করার চেয়ে ভুল করে কোনো কাফিরকে মুসলিম মনে করা অনেক ভাল ও নিরাপদ। প্রথম ক্ষেত্রে কঠিন পাপ ও নিজের ঈমান নষ্ট হওয়ার ভয় রয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কোনোরূপ পাপ বা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ এক্ষেত্রে মানুষের মুখের দাবির উপর নির্ভর করতেই হাদীসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পেট চিরে মনের কথা বের করার নির্দেশ দেওয়া হয় নি।

এ নীতির ভিত্তিতে তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করছেন, তাকে কোনো পাপের কারণে 'অমুসলিম', কাফির বা ধর্মত্যাগী বলে গণ্য করা যাবে না, তিনি তার পাপ থেকে তাওবা করুন, অথবা নাই করুন, যতক্ষণ না তিনি সুস্পষ্টভাবে ইসলামী বিশ্বাসের পরিপন্থী কোনো বিশ্বাস পোষণ করার ঘোষণা দিবেন। ইসলামী আইন লঙ্ঘনকারী, বা আল্লাহর নির্দেশ অমান্যকারী মুসলিম পাপী মুসলিম বলে গণ্য হবেন। কখনোই তাকে পাপের কারণে 'অমুসলিম' বা ধর্মত্যাগী বলে গণ্য করা হবে না। তবে যদি তার এ পাপ বা অবাধ্যতাকে তিনি বৈধ মনে করেন বা ইসলামী বিধানকে বাজে, ফালতু, অচল বা অপালনযোগ্য বলে মনে করেন, তবে তা কুফরী বা ধর্মত্যাগ বলে গণ্য হবে।

তিনি যদি এমন কোনো মতবাদ, বিশ্বাস, আকীদা বা মতাদর্শ গ্রহণ করার সুস্পষ্ট ঘোষণা দেন যা ইসলামী বিশ্বাসের সাথে বাহ্যত সাংঘর্ষিক হলেও তার একটি ইসলাম গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদান সম্ভব তবে তাকে তার এ মতবাদ বা আকীদার কারণে কাফির বলা হবে না, বরং বিভ্রান্ত বলা হবে। কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী বিশ্বাস পোষণ করা বা কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত বিশ্বাস বা কর্ম অস্বীকার করার ক্ষেত্রে জেনে বুঝে সরাসরি অস্বীকার করা, ব্যাখ্যা সাপেক্ষ অস্বীকার করা এবং না জেনে অস্বীকার করার মধ্যে পার্থক্য করেছেন মুসলিম উম্মাহর ইমাম ও আলিমগণ।[১৩৩]

ঈমানের দাবিদার জেনে শুনে কুফরী করবেন না বলেই ধরে নিতে হবে। কারো কথা, মতামত বা কর্ম বাহ্যত কুফরী হলেও যদি তার কোনোরূপ ইসলাম সম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় তবে দূরবর্তী হলেও ইসলামী ব্যাখ্যা গ্রহণ করে তাকে মুমিন বলে মেনে নিতে হবে। সর্বোপরি ঈমানের দাবিদার কোনো ব্যক্তি যদি সুস্পষ্ট কোনো কুফরী বা শিরকী কাজে লিপ্ত হয়, তবে তার কর্মকে কুফরী বলা হলেও ব্যক্তিগতভাবে তাকে কাফির বলার আগে এ বিষয়ে তার কোনো ওযর আছে কিনা তা জানতে হবে। সে ব্যক্তি অজ্ঞতা, ভয়, ব্যাখ্যা বা অন্য কোনো ওজরের কথা উল্লেখ করলে তা গ্রহণ করা হবে। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বা মূলধারার মুসলিম উম্মাহর দৃষ্টিতে এ হলো ইসলামের অন্যতম মূলনীতি।[১৩৪]

এ মূলনীতির কারণেই সাহাবীগণ কখনো খারিজীদেরকে কাফির বলেন নি। খারিজীগণ কুরআন-সুন্নাহর সাথে ব্যাহত সাংঘর্ষিক মতবাদ গ্রহণ করেছে, সাহাবীগণকে কাফির বলেছে, নির্বিচারে মুসলিমদেরকে হত্যা করেছে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, তারা ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে আবার তা থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে যাবে, তিনি এদের সাথে যুদ্ধ করতে ও এদেরকে হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন, সাহাবীগণ তাদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু কখনো আলী (রা) বা অন্য কোনো সাহাবী তাদেরকে কাফির বলে ফাতওয়া দেন নি। বরং তাঁরা এদের সাথে মুসলিম হিসেবেই মিশেছেন, কথাবার্তা বলেছেন, আলোচনা করেছেন। এমনকি এদের ইমামতিতে সালাত আদায় করেছেন। যুদ্ধের ময়দানে বা বিচারের কাঠগড়ায় ছাড়া কখনোই এদেরকে হত্যা করার অনুমতি দেন নি।[১৩৫]

৩. ৮. ২. খারিজীগণের মতামত

কুরআন ও হাদীসের দুএকটি নির্দেশনাকে পুঁজি করে খারিজীগণ ও বাতিনীগণ পাপীকে কাফির বলে গণ্য করে। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, অনেক কর্ম আছে যা কুরআন হাদীসের আলোকে স্পষ্টতই পাপ। যেমন, চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, মিথ্যাচার ইত্যাদি। খারিজীগণ শুধু এগুলিকেই কুফরী বলে গণ্য করেনি। উপরন্তু, তাদের মতের বিপরীত রাজনৈতিক কর্ম বা সিদ্ধান্তকে ব্যাখ্যার মাধ্যমে 'পাপ' বলে গণ্য করেছে, এরপর তারা সে পাপকে কুফরী বলে গণ্য করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কাফির আখ্যা দিয়েছে। প্রকৃত পক্ষে খারিজীগণের কাফির-কথনের মূল ভিত্তি 'পাপ' নয়, বরং 'রাজনৈতিক মতাদর্শ'। তারা তাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী নয় এরূপ সকল মুসলিমকে কাফির বলে গণ্য করত।

আলী (রা) ও তাঁর পক্ষের মানুষেরা কেউ চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার বা কুরআন নির্দেশিত অনুরূপ কোনো পাপ বা অপরাধে লিপ্ত হন নি। আলী (রা) তাঁর রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে রক্তপাত বন্ধ করতে সালিসের বা আপোসের চেষ্টা করেছেন। তাঁর কর্মের পক্ষে কুরআন ও হাদীসের সমর্থন রয়েছে। অন্য অনেকে তার সাথে তার কর্মে অংশগ্রহণ না করলেও তাঁর কর্মের যৌক্তিকতা অনুভব করেছেন। খারিজীগণ তাদের মনগড়া ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এদের সকলকেই কাফির বলে আখ্যায়িত করেছে। এতেই তারা খান্ত হয় নি, তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করে এবং তাদের ধনসম্পদ লুটতরাজ করে ইসলাম বা সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেছে। পক্ষান্তরে তাদের অনেকেই তাদের মধ্যকার অনেক পাপীকেই কাফির মনে করত না।[১৩৬]

"জামা'আতুল মুসলিমীন" ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলার এ নীতি গ্রহণ করেন। মুমিনকে কাফির বলার ক্ষেত্রে তারা কোনোরূপ কৃপণতা করেন নি। তাদের কাফির কথনের পর্যায় নিম্নরূপ:

১. কবীরা গোনাহ বা পাপে লিপ্ত মুমিনকে কাফির বলা।
২. তাদের মতের বিরোধী সকল আলিম ও মুসলিমকে কাফির বলা।
৩. তাদের মতের সমর্থক কেউ কোনো বিষয়ে মতভেদ করলে বা দলত্যাগ করলে তাকে কাফির বলা।
৪. সমকালীণ সকল মুসলিম দেশ, রাষ্ট্র ও সমাজকে কাফির বলা ও জাহিলী সমাজ বলে আখ্যায়িত করা।
৫. যে সকল মুসলিম এরূপ "জাহিলী সমাজ" থেকে হিজরত করে তাদের নেতার হাতে বাইয়াত করে তাদের "জামাআতে" বা দলে যোগ দেয় নি তাদের সকলকে কাফির বলা।
৬. তাদের মতে যারা কাফির তাদেরকে যারা কাফির বলে গণ্য না করে তাদেরকেও কাফির বলা।[১৩৭]

অনেক পাঠকের কাছে বিষয়টি হাস্যকর মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃত বিষয় হলো, মুমিনকে কাফির বলাই সকল উগ্রতা ও সন্ত্রাসের মূল। এ জন্য বিশেষভাবে "জামাআতুল মুসলিমীনের" কাফির কথন নীতি বিষয়ে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ যে কোনো মুসলিম সমাজে যারা দীনের নামে উগ্রতা, সন্ত্রাস বা শক্তিপ্রয়োগে লিপ্ত তারা জেনে অথবা না জেনে এদের মতামতগুলি দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন। এছাড়া সমকালীন অনেক সুপ্রসিদ্ধ ও প্রাজ্ঞ আলিম ও গবেষকের লিখনির মধ্যে কিছু কথা ও মতামত অনেক সময় তাদের বিভ্রান্তির পক্ষে বলে বাহ্যত মনে হয় এবং তারা তাদের বিভ্রান্তির পক্ষে এগুলিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে। এ সকল আলিমের বক্তব্য যেন এভাবে ভুল বুঝা না হয় এবং অনুরূপ বিভ্রান্তির শিকার অন্যরা না হয় সেজন্য বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

তাদের দলের বাইরে সকল মুমিনকে কাফির বলার ক্ষেত্রে তাদের মতবাদের কয়েকটি দিক নিম্নরূপ:

৩. ৮. ৩. আইন, শাসন, বিধান ও মতবাদ

জামাআতুল মুসলিমীনও প্রাচীন খারিজীদের মত দাবি করে যে, মুসলিম দাবিদার যদি ইসলামের কোনো অনুসাশন লঙ্ঘন করে তবে সে কাফির হয়ে যায়। এক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ্য করি যে, তারা মূলত রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বীকেই কাফির বলেন। বড় ফরয ও ছোট ফরযে তত্ত্ব দিয়ে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে বড় ফরয বলে দাবি করে সে অযুহাতে ছোট ফরয নাম দিয়ে তারা অনেক ফরয ইবাদত বর্জন করত এবং হারাম কর্মে লিপ্ত হতো, যেগুলি কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টতই পাপ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ পাপের কারণে তারা অনেক আলিম ও ইসলামী ব্যক্তিত্বকে কাফির-মুরতাদ ফতওয়া প্রদান করে তাদের হত্যা করেছে। যেমন "ধর্মনিরপেক্ষ" বা "তাগূতী" সরকারকে সহযোগিতা করে বা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে কাফির হয়ে গিয়েছেন বলে দাবি করে তারা সুপ্রসিদ্ধ আলিম ও গবেষক ড. যাহাবীকে হত্যা করে।

খারিজীগণ "হুকম" বা বিধান প্রদানকে তাদের মতবাদের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করে। তারা তাদের মতবাদ প্রমাণের জন্য (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لله), অর্থাৎ "হুকুম কেবলমাত্র আল্লাহরই জন্য"- কুরআনের এ বাণীটিকেই মূলত পেশ করে। এ বাণীর ভিত্তিতে কখনো তারা (لا حاكم إلا الله) "আল্লাহ ছাড়া কোনো হাকিম (হুকমদাতা, আইনদাতা বা ফয়সালাকারী) নেই" কথাটিকে (لا إله إلا الله): "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ (মাবূদ বা উপাস্য) নেই" কথাটির মত তাওহীদ ও ঈমানের মূল ভিত্তি হিসাবে গণ্য করেছে। কখনো তারা (لا إله إلا الله): আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই" কালিমাটির অর্থ করেছে "আল্লাহ ছাড়া কোনো হাকিম বা হুকুমদাতা নেই"। অর্থাৎ তার ইলাহ মানেই "হাকিম" বা "হুকুমদাতা" বলে দাবি করেছে।

এভাবে তারা দাবি করত যে, আল্লাহ ছাড়া কারো হুকম দানের অধিকার নেই এ কথা বিশ্বাস করাই ঈমান। আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম দেওয়ার অধিকার প্রদান করা বা কারো বিধান মানাই কুফর। আর পাপ মানেই তো আল্লাহ ছাড়া অন্যের হুকুম মানা। কারণ মানুষ শয়তান, নিজ প্রবৃত্তি বা অন্য কারো হুকুমেই আল্লাহর হুকুম অমান্য করে।

তাদের এ সকল দাবি সত্য ও মিথ্যার সংমিশ্রন। এজন্য এ বিষয়ে আলী (রা) বলতেন: (كلمة حق أريد بها الباطل) "একটি সত্য কথাকে বাতিল অর্থে পেশ করা হচ্ছে"।[১৩৮]

বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য আল্লাহর তাওহীদ বা একত্ববাদের রুবূবিয়্যাত ও উলূহিয়্যাতের দুটি দিক আমাদের ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। তাওহীদুর রুবূবিয়্যাত (প্রতিপালনের একত্ব) ও তাওহীদুল উলূহিয়্যাত (ইবাদতের একত্ব) বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি **"কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা"** গ্রন্থে।[১৩৯] এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, আল্লাহর তাওহীদের দুটি দিক রয়েছে: রব্ব বা প্রতিপালক হিসেবে তার একত্ব এবং ইলাহ বা উপাস্য হিসেবে তার একত্ব। রব্ব বা প্রতিপলক হিসেবে তার একত্বের মধ্যে রয়েছে তাঁর মহান গুণাবলির একত্ব।

উক্ত গ্রন্থে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে "রব্ব" বলা যায়, কিন্তু "ইলাহ" বলা যায় না। 'ইলাহ' অর্থ উপাস্য বা মাবূদ। যাকে উপাসনা, আরাধনা বা অলৌকিকভাবে ভক্তি করা হয় তাকেই ইলাহ বলা হয়। এজন্য আরবের মানুষেরা সূর্যকে 'ইলাহাহ' বলত। এছাড়া কুরআনে মুর্তি ও প্রতিমাসমূহকে ইলাহ বলা হয়েছে। মুশরিকগণ এগুলির আনুগত্য করত না বা এগুলিকে হুকুমদাতা, আইনদাতা বা বিধানদাতা বলে বিশ্বাস করত না। বরং এগুলিকে আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিত্ব ও আল্লাহর সাথে

বিশেষ সম্পর্কের কারণে মানুষের মঙ্গল-অমঙ্গলে বিশেষ ক্ষমতা বা সুপারিশের মালিক বলে বিশ্বাস করে সাজদা, প্রণতি, মানত, প্রার্থনা ইত্যাদি কর্মের মাধ্যমে এগুলির ইবাদত, বন্দনা বা পূজা করত।

হুকুম বা নির্দেশ প্রদান আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের অংশ। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ 'আল্লাহর মত হাকিম' হতে পারেন না, কিন্তু হাকিম হতে পারেন। কিন্তু কেউ আল্লাহর মত বা আল্লাহর চেয়ে নিম্নমানের মাবূদ হতে পারে না। কুরআন কারীমে অনেক স্থানে বলা হয়েছে যে, "হুকুম শুধু আল্লাহরই"[১৪০] এবং একমাত্র আল্লাহকেই "হাকিম" বা "হাকাম" বা হুকুমদাতা বা ফয়সালাকারী হিসেবে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[১৪১] আবার অনেক স্থানে আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে হুকুম, নির্দেশ, বিধান ও ফয়সালা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং মানুষকে হাকিম বা হাকাম অর্থাৎ হুকুমদাতা, বিধানদাতা বা ফয়সালাদাতা হিসেবে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি নবী-রাসূলগণকে "হুকম" বা বিধান ও রায় প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করেছেন।[১৪২] আল্লাহ বলেন:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

"আর তোমরা যদি তাদের (স্বামী-স্ত্রীর) উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কর তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন হুকুমদাতা (বিচারক) এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন হুকুমদাতা (বিচারক) পাঠাও। যদি তারা মিমাংসা চায় তাহলে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে মিল করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সম্যক অবগত।"[১৪৩]

এখানে মহান আল্লাহ মানুষের মধ্য থেকে বিধানদাতা নিয়োগের নির্দেশ প্রদান করেছেন, যারা নিজেদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেকের আলোকে এ বিষয়ে বিধান প্রদান করবেন। এছাড়া অন্যান্য স্থানে জাগতিক বিষয়াদিতে মানুষদেরকে বিধান প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[১৪৪]

এভাবে আমরা দেখছি যে, "হাকিম" বা "হাকাম" মহান আল্লাহর পবিত্র গুণবাচক নামসমূহের অন্যতম। এগুলি তাঁর রুবূবিয়্যাতের গুণাবলির অন্যতম। তবে ইলাহ অর্থ 'হাকিম' বা 'বিধানদাতা' নয়। ইলাহ অর্থ মাবূদ। আমরা একটু পরে ইবাদত ও আনুগত্যের পার্থক্য আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। ইবাদত বিষয়ক শিরক-কুফর আর হুকুম বিষয়ক শিরক-কুফর এক নয়। হুকুম বিষয়ক শিরক-কুফর সম্পর্কে আমি **"কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা"** গ্রন্থে আলোচনা করেছি।[১৪৫]

ইসলামে আল্লাহ ছাড়া কাউকে কোনোভাবে ইবাদত করার বা ইবাদত গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয় নি। আল্লাহর পক্ষ থেকে, আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে, অধস্তন হিসেবে বা অন্য কোনোভাবে কেউ ইবাদত পেতে পারে না বা মাবূদ হতে পারে না। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে বা নিজের স্বকীয়তার সাথে অন্য কেউ "হাকিম" হতে পারে বা হুকুম দিতে পারে।

মানুষকে হুকুম দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান, রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, বাইতুল মালের সম্পদে শাসকের যথেচ্ছ অধিকার প্রদান ইত্যাদি কুরআন বিরোধী বা 'মানব রচিত' আইনের কারণে খারিজীগণ আলী (রা), মু'আবিয়া (রা) ও পরবর্তী শাসকদেরকে কাফির বলেছে। অনুরূপভাবে শুকরী ও তার অনুসারীরা উপনিবেশ-উত্তর মুসলিম দেশগুলির শাসকদেরকে 'ইসলাম-বিরোধী' আইন প্রচলনের জন্য কাফির বলে ঘোষণা করে।

মিশরের সকল প্রসিদ্ধ আলিম এদের এ সকল কথার বিভ্রান্তি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করেন। তাঁদের অন্যতম ছিলেন ইখওয়ানুল মুসলিমীন সংগঠনের নেতা হাসান হুদাইবী। তাদের বক্তব্যের সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ[১৪৬]:

প্রথমত: মানুষের জন্য আইন রচনা নিষিদ্ধ নয়। আল্লাহর দীন সকল যুগের সকল দেশের সকল মানুষের জন্য। এজন্য এর মধ্যে ব্যাপক প্রশস্ততা দান করেছেন আল্লাহ। সুনির্দিষ্ট কিছু বিধিবিধান ও মূলনীতি ছাড়া বাকি সকল ক্ষেত্রে দেশ, জাতি ও যুগের প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় আইনকানুন ও বিধিবিধান তৈরির সুযোগ ও নির্দেশ আল্লাহ মানুষদেরকে প্রদান করেছেন।

দ্বিতীয়ত: 'মানব রচিত' সকল আইনই ইসলাম বিরোধী নয়। মুসলিম দেশগুলিতে কিছু ঔপনিবেশিক আইন-কানুন রয়েছে যেগুলি ইসলাম বিরোধী, এছাড়া অধিকাংশ আইন ও বিচারপদ্ধতি ইসলাম সম্মত।

তৃতীয়ত: আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান মত ফয়সালা না করাকে কুফরী বলা হলেও কুরআনে আল্লাহর বিধানের বিপরীত ফয়সালাকারীকেও মুমিন বলা হয়েছে। সাহাবীগণ ও মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ বলেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি ইসলামী বিধানানুসারে বিচার করা অপ্রয়োজনীয় অথবা ইসলামী আইনকে অচল বা বাতিল মনে করেন তবে তিনি কাফির বলে গণ্য হবেন। পক্ষান্তরে তিনি যদি ইসলামের নির্দেশকে সঠিক জেনেও অজ্ঞতা, ভয়, লোভ, বাধ্যবাধকতা বা অনুরূপ কোনো জাগতিক কারণে ইসলাম বিরোধী ফয়সালা দেন তবে তা কুফরী বলে গণ্য হবে না।

যেমন, মদ ইসলামে হারাম ও মদপান প্রমাণিত হলে বেত্রাঘাতের বিধান দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি ইসলামের বিধান জানার পরেও মদ বৈধ মনে করেন অথবা মদপানের জন্য শাস্তি প্রদানকে আপত্তিকর বা অমানবিক মনে করেন তবে তিনি কাফির বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ মদের অবৈধতা বিশ্বাস করেন এবং মদপানের জন্য শাস্তি দেওয়াই সঠিক বলে মনে করেন, কিন্তু প্রচলিত আইনে সুযোগ না থাকায় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মদপানকারীকে শাস্তি দিতে অপারগ হন, অথবা জাগতিক কোনো প্রাপ্তি, লোভ বা স্বার্থের জন্য শাস্তি না দেন তবে তিনি পাপী বলে গণ্য হবেন।

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও বিষয়টি একই রকম। কেউ যদি ইসলামের বিধানকে অচল, আপত্তিকর বা অমানবিক মনে করে তা রহিত করে আইন প্রণয়ন করে তবে তা কুফরী। অথবা কেউ যদি মনে করেন যে, আল্লাহ যে বিধানই প্রদান করুন না কেন, আমাদের অধিকার আছে আল্লাহর হারামকে হালাল করা বা হালালকে হারাম করা, তবে তিনিও কাফির বলে গণ্য হবেন। আর যদি কেউ ইসলামের বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে, বা ইসলামের বিধানকে সঠিক বিশ্বাস করা সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক শাসনামলে প্রচলিত ইসলম বিরোধী আইনগুলি ব্যক্তিগত বা দলগত অসুবিধা বা স্বার্থে পরিবর্তন না করেন তবে তিনি পাপী বলে গণ্য হবেন।

চতুর্থতঃ আধুনিক বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ- যেমন সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সাম্যবাদ, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদির মধে ইসলামী বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়াদি রয়েছে। আবার এ সকল মতবাদের মধ্যে ইসলাম সমর্থিত অনেক বিষয় আছে।

অজ্ঞতা ও আবেগের কারণে আধুনিক রাজনৈতিক মতবাদকে "কুফরী" বলার একটি উদাহরণ "গণতন্ত্র"-কে কুফরী মতবাদ বলে আখ্যায়িত করা। ইসলাম ও গণতন্ত্র উভয় বিষয়ের প্রগাঢ় অজ্ঞতাই এরূপ মতপ্রকাশের কারণ। গণতন্ত্রের প্রয়োগ বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন রকম হলেও গণতন্ত্রের মূল প্রেরণা ইসলামের। গণতন্ত্র ইসলামের শূরা বা পরামর্শ ব্যবস্থার বাস্তব প্রয়োগের একটি পথ। তবে ইসলামের নির্দেশ বাতিল বা পরিবর্তন করার ক্ষমতা গণপ্রতিনিধিদের আছে বলে বিশ্বাস করা কুফর। আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব যে, ইসলাম যে রাষ্ট্রব্যবস্থা দিয়েছে তাকে আধুনিক পরিভাষায় "গণতান্ত্রিক" বলা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

আল্লাহ মানবজাতিকে জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছেন পরিচয়ের জন্য। জাতির প্রতি প্রেম, দায়িত্ববোধ ও জাতীয় পরিচয়ের গৌরব অর্থে জাতীয়তাবাদ ইসলমের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। মানুষ পিতামাতাকে যেমন ভালবাসে, তেমনি ভালবাসে নিজের দেশ ও জাতিকে। পিতামাতা বা দেশজাতির প্রতি ভালবাসা আল্লাহ, তাঁর রাসূল (ﷺ) ও ইসলামের প্রতি ভালবাসার অন্তরায় নয়। তবে যদি যদি কেউ পিতামাতা বা দেশজাতির ভালবাসা ও পরিচয়কে আল্লাহ, তাঁর রাসূল (ﷺ) ও ইসলামের প্রতি ভালবাসা ও ইসলামী পরিচয়ের চেয়ে বড় মনে করে তবে তা তার ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক।

ধর্মরিপেক্ষতার দুটি দিক রয়েছে। প্রথমত, সকল ধর্মের মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও বৈষম্যহীন নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত, ধর্মকে সকল রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং ন্যায়বিচার, প্রশাসন, অর্থ ও রাষ্ট্রসংশ্লিষ্ট ধর্মীয় বিধানগুলি বাতিল, অচল বা প্রয়োগঅযোগ্য বলে বিশ্বাস করা। প্রথম বিষয়টি ইসলাম নির্দেশিত ও ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলনীতি ও দ্বিতীয় বিষয়টি ইসলামী বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক ও কুফর।

এভাবে আমরা দেখছি যে, বিভিন্ন আধুনিক রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় মতবাদের মধ্যে ভাল ও মন্দ রয়েছে। এগুলির মধ্যে বিদ্যমান ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী বিষয়াদির সমালোচনা করা মুমিনের দায়িত্ব। কিন্তু এগুলির কারণে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে কাফির বলা মুমিনের জন্য ভয়ঙ্কর বিষয়। মুসলিম উম্মাহর দীর্ঘ ইতিহাসে এ ধরনের মতবাদের চেয়েও সুস্পষ্ট কুফরী মতবাদে বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তি বা ফিরকাকেও সাহাবী-তাবিয়ীগণ ও মূলধারার আলিমগণ কাফির বলে গণ্য করেন নি। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করে হলেও কাউকে মুমিন বলা সুযোগ রয়েছে বা ব্যাখ্যা করে হলেও তার কুফরী কথা বা মতকে কুফরী নয় বলে গণ্য করার সুযোগ রয়েছে ততক্ষণ তারা কাউকে কাফির বলেন নি।[১৪৭]

সকল ক্ষেত্রে যিনি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করছেন, তার ইসলাম বিরোধী কাজের কারণে তাকে কাফির বলা যায় না। তিনি যদি এমন কাজ করেন, কথা বলেন বা মত গ্রহণ করেন যা কুফরী হতে পারে আবার পাপও হতে পারে, তবে কাজটিকে পাপ বলেই মনে করতে হবে, কুফরী মনে করা যাবে না, যতক্ষণ না তিনি নিজে স্পষ্টভাবে তার কুফরীর কথা ঘোষণা করবেন। এমনকি তার 'মুনাফিকী' বা মিথ্যাচার বুঝা গেলেও সেই বুঝ দ্বারা তার সম্পর্কে বিধান প্রদান করা যাবে না, বরং তার বাহ্যিক কথার উপরেই নির্ভর করতে হবে।[১৪৮]

সর্বোপরি, রাষ্ট্র, সরকার, শাসক, বিচারক বা কোনো ব্যক্তিকে কাফির বলা বা তার কর্মকে কুফরী বলা এক কথা আর তাকে শাস্তি দেওয়া, বিচার করা বা কোনোভাবে আইন হাতে তুলে নেওয়া অন্য কথা। দুএর মধ্যে আসমান ও যমিনের দূরত্ব। একমাত্র রাষ্ট্র ছাড়া কেউ বিচার করতে পারে না বা শাস্তি দিতে পারে না। রাষ্ট্র তার এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে ব্যক্তি বা দল সে জন্য রাষ্ট্রকে আহ্বান করবে, দাবি করবে ও পরিবর্তনের চেষ্টা করবে, কিন্তু কখনোই আইন হাতে তুলে নিতে পারবে না।

৩. ৮. ৪. আনুগত্য বনাম ইবাদত

ইলাহ অর্থ হুকুমদাতা বলে দাবি করার অপর দিক হলো হুকুম মানা বা আনুগত্য করাকেই ইবাদত বলে দাবি করা। প্রাচীন ও আধুনিক খারিজীগণ দাবি করেন যে, হুকুম প্রদানই উলূহিয়্যাত এবং হুকুম মানাই ইবাদত। কাজেই আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম মানা

ও আনুগত্য করা শিরক। এজন্য এ সকল কাফির সরকারের আনুগত্যকারী সকল নাগরিকই কাফির।

তারা দাবি করেন যে, আনুগত্যই যে ইবাদত তা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে জানা যায়। যেমন আল্লাহ বলেছেন:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

"তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে এবং সংসার-বিরাগীগণকে রব্ব-মালিক রূপে গ্রহণ করেছে, এবং মরিয়ম তনয় মাসীহকেও। কিন্তু তারা শুধু এক ইলাহের ইবাদত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তারা যা শরিক করে তা থেকে তিনি কত পবিত্র!"[১৪৯]

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, ইহূদী-খৃস্টানগণ তাদের পণ্ডিত ও দরবেশগণকে আল্লাহ ছাড়া রব্ব হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাদের ইবাদত করে। হাদীসের আলোকে জানা যায় যে, তারা পণ্ডিত-দরবেশদের পূজা-অর্চনা বা সাজদা-প্রার্থনা করে নি। বরং তারা তাদের আনুগত্য করেছে।

গুতাইফ ইবনু আইউন নামক দ্বিতীয় শতকের একজন প্রায় অজ্ঞাত- পরিচয় তাবি-তাবিয়ী বলেন, প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুসআব ইবনু সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (১০৩ হি) তাকে বলেছেন, সাহাবী আদী ইবনু হাতিম (রা) বলেন,

سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ

"আমি শুনলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা তাওবায় পাঠ করছেন: 'তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে এবং সংসার-বিরাগীগণকে রব্ব-মালিক রূপে গ্রহণ করেছে'। তিনি বললেন, ইহূদী-খৃস্টানগণ তাদের (আলিম-দরবেশদের) ইবাদত করত না বটে, কিন্তু তারা যখন তাদের জন্য কোনো কিছু হালাল করে দিত, তখন তারা তাকে হালাল বলে মেনে নিত। আর তারা যখন তাদের উপর কোনো কিছু হারাম করে দিত, তখন তারা তা হারাম বলে মেনে নিত।"[১৫০]

ইমাম তাবারী তাঁর তাফসীরে গুতাইফের সূত্রে হাদীসটি সংকলন করেছেন। তার বর্ণনায় হাদীসটির ভাষা নিম্নরূপ:

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ فَقَالَ أَلَيْسَ يُحَرِّمُوْنَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُوْنَهُ وَيُحِلُّوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّوْنَهُ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উক্ত আয়াতটি পাঠ করতে শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা তো তাদের ইবাদত করি না! তিনি বলেন, আল্লাহ যা হালাল করেছেন তারা তা তোমাদের জন্য হারাম করলে তোমরা কি তা হারাম বলে বিশ্বাস কর না? আর আল্লাহ যা হারাম করেছেন তারা তা হালাল করলে তোমরা কি তা হালাল বলে মেনে নাও না? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন, এ-ই তাদের ইবাদত করা।"[১৫১]

তারা বলেন, এ থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে আনুগত্যই ইবাদত। আল্লাহর আইনের ব্যতিক্রম বা বিপরীত আইন প্রদানকারীর আনুগত্য করলেই শিরক হবে।

এখানে লক্ষণীয় যে, হাদীসটির সনদ দুর্বল। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেন, "এ হাদীসটি গরীব, ... গুতাইফ ইবনু আইউন হাদীস বর্ণনায় পরিচিত নয়।"[১৫২]

এ অর্থে সাহাবীগণ থেকে তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। হুযাইফা (রা), ইবনু আব্বাস (রা) প্রমুখ সাহাবী বলেছেন, ইহূদী-খৃস্টানদের পণ্ডিত-দরবেশগণ যখন আল্লাহর বিধান উল্টে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করত তখন তারা তা মেনে নিত। আর এ আনুগত্যই ছিল তাদের রব্ব মানা।[১৫৩]

মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন:

وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

"যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় নি তার কিছুই ভক্ষণ করো না। তা অবশ্যই পাপ। শয়তান তার বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়; যদি তোমর তাদের আনুগত্য কর তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হবে।"[১৫৪]

Contents

তাদের মতে এ আয়াত প্রমাণ করে যে, আনুগত্যই শিরক; কারণ আল্লাহ বলেছেন, তোমরা তাদের আনুগত্য করলে মুশরিক হয়ে যাবে।

তাদের এ সকল প্রমাণের বিভ্রান্তি বুঝতে হলে কুরআনের আলোকে ইবাদতের অর্থ বুঝতে হবে। এখানে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষণীয়:

(ক) কুরআনে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইবাদত এমন একটি কর্ম যা কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য করা যাবে না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন বলে বিশ্বাস করাই শিরক। পরবর্তী অনুচ্ছেদে 'তাগূত' বিষয়ক আয়াতগুলি থেকে আমরা জানতে পারব যে, ঈমানের ভিত্তিই হলো একমাত্র আল্লাহকেই ইবাদতের যোগ্য বলে বিশ্বাস করা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতা আছে তা অস্বীকার করা। সকল যুগে সকল নবী-রাসূল তার উম্মাতকে এ তাওহীদের দা'ওয়াত দিয়েছেন। এজন্য বিভিন্ন শরীয়তে বিধি-বিধানের পার্থক্য থাকলেও এ বিষয়ে কোনো পার্থক্য ছিল না। কোনো শরীয়তেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদতের অনুমতি দেওয়া হয় নি। আল্লাহ ছাড়া কারো সম্মানে সালাত আদায়, অন্য কারো উদ্দেশ্যে কুরবানী, উৎসর্গ বা বলি দেওয়া, অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করা, অন্য কারো উপর নির্ভর করা, পূজা-অর্চনা করা ইত্যাদি সকল শরীয়তেই নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে আল্লাহ ছাড়া অন্যের আনুগত্যের অনুমতি ও নির্দেশ সকল শরীয়তেই প্রদান করা হয়েছে। আর যে কর্ম আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য পালনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে তা সরাসরি ইবাদত হতে পারে না। তবে বিশেষ অবস্থায় বা বিশেষ বিশ্বাসের সাথে তা 'ইবাদত' বলে গণ্য হতে পারে।

(খ) ইবাদত শব্দটি আভিধানিকভাবে 'আবদ' বা 'দাস' শব্দ থেকে গৃহীত। দাসত্ব বলতে 'উবূদিয়্যাত' ও 'ইবাদত' দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। উবূদিয়্যাত ব্যবহৃত হয় লৌকিক বা জাগতিক দাসত্বের ক্ষেত্রে। আর 'ইবাদত' বুঝানো হয় অলৌকিক ও অজাগতিক দাসত্বের ক্ষেত্রে। সকল যুগে সকল দেশের মানুষই জীবন, মৃত্যু ইত্যাদি অতিপরিচিত শব্দের মতই 'ইবাদত' শব্দের অর্থ স্বাভাবিকভাবেই বুঝে। মানুষ অন্য মানুষের দাস হতে পারে বা দাসত্ব করতে পারে, তবে সে অন্য যে কোনো সত্তার 'ইবাদত' করে না। শুধু মাত্র যার মধ্যে চূড়ান্ত ক্ষমতা, ইচ্ছা করলেই মঙ্গল করার বা অমঙ্গল করার বা তা রোধ করার সর্বময় বা বিশেষ শক্তি বা অলৌকিক অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা কল্পনা করে তারই ইবাদত করে।

প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ রাগিব ইসপাহানী (৫০২ হি) বলেন:

العبودية إظهار التذلل والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل ولا يستحقها إلا من له غاية الأفعال (الإفضال)

'উবূদিয়াত (slavery, serfdom, bondage) হলো বিনয়-ভক্তি বা নিজের হীনত্ব-ছোটত্ব প্রকাশ করা। আর ইবাদত (worship, veneration) এর চেয়েও অধিক গভীর অর্থজ্ঞাপক। কারণ ইবাদত হলো চূড়ান্ত ভক্তি-বিনয় বা হীনত্ব প্রকাশ, যিনি চূড়ান্ত কর্ম-ক্ষমতা ও দয়ার মালিক তিনি ছাড়া কেউ এ চূড়ান্ত ভক্তি-বিনয় পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন না।"[১৫৫]

অন্যান্য আলিমও অনুরূপ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাদের ভাষায়:

العبادة على المعنى اللغوي غاية التذلل والافتقار والاستكانة

"ইবাদতের আভিধানিক অর্থ হলো, চূড়ান্ত ভক্তি-বিনয়, অসহায়ত্ব ও মুখাপেক্ষিত্ব।"[১৫৬]

(গ) চূড়ান্ত বিনয়, অসহায়ত্ব ও ভক্তি প্রকাশ করে চূড়ান্ত ক্ষমতা ও করুণার অধিকারীর জন্য যে কর্ম করা হয় তা বিভিন্ন পর্যায়ের। তার কাছে যেমন প্রার্থনা করা হয় তেমনি তার প্রশংসাও করা হয়। সবই ইবাদত। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানুষ যা কিছু করে সবই ইবাদত বলে গণ্য। এজন্য ইবাদতের ব্যাখ্যায় বলা হয়:

اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة

"আল্লাহ ভালবাসেন এরূপ সকল কথা, বাহ্যিক কর্ম ও হার্দিক বা মানসিক কর্ম সব কিছুই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।"[১৫৭]

তবে সব কর্ম এক পর্যায়ের নয়। কিছু কর্ম আছে যা মানুষ 'ইবাদত' হিসেবেই করে। যে সত্ত্বার এরূপ চূড়ান্ত ক্ষমতা ও আধিপত্য আছে তাকেই তা প্রদান করে। সকল সমাজের সকল ভাষার মানুষই এগুলি জানেন। পূজা, অর্চনা, বলি, কুরবানী, মানত, প্রার্থনা ইত্যাদি এ জাতীয় কর্ম। এগুলি শুধু "আস্তিকগণ"-ই করেন, নাস্তিকগণ করেন না। "আস্তিক" ব্যক্তি তার বিশ্বাস অনুসারে যে সত্ত্বার মধ্যে "অলৌকিক" বা 'ঐশ্বরিক' ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করেন তার জন্যই করেন। এগুলি সবই "চূড়ান্ত ভক্তি" বা ইবাদত।

পাশাপাশি কিছু কর্ম আছে যা মানুষ ইবাদত হিসেবে করে, আবার জাগতিকভাবেও করে। যেমন প্রশংসা করা, ভয় করা, আনুগত্য করা ইত্যাদি। এগুলি মানুষ জাগতিকভাবে অন্য মানুষের জন্য করে। আবার তার 'মা'বূদ' বা পূজিত সত্তার জন্যও করে। এ সকল কর্ম আস্তিক ও নাস্তিক সকলেই করেন। আস্তিক ব্যক্তি তার "উপাস্য"-কে উদ্দেশ্য করেও করেন আবার জাগতিক বন্ধুবান্ধব ও গুরুজনদের উদ্দেশ্যেও করেন। নাস্তিক ব্যক্তি তার বন্ধুবান্ধব ও গুরুজনদের উদ্দেশ্যে এ সকল কর্ম করেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রথম প্রকারের কর্ম আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য করাই শিরক। যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য সাজদা, মানত, বলি, উৎসর্গ, জবাই ইত্যাদি করা। এগুলি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য করলে তা শিরক বলে গণ্য হবে।

কারণ কারো ভিতরে ঈশ্বরত্ব (divinity, holiness, sacredness, sanctity) ঐশ্বরিক ক্ষমতা, চূড়ান্ত আধিপত্য, অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা, অলৌকিক শক্তি ইত্যাদি কল্পনা না করলে কেউ তার জন্য এরূপ কর্ম করে না। তবে ঈমানের দাবিদার কেউ তা করলে তার কাজকে শিরক বা কুফর বলা হলেও তাকে সরাসরি কাফির বা মুশরিক বলা হবে না। বরং সে অজ্ঞতার কারণে, ভুল করে বা বাধ্য হয়ে করেছে কিনা জানতে হবে এবং তার ব্যাখ্যাই গৃহীত হবে।

(ঘ) পাশাপাশি অনেক কর্ম রয়েছে যা চূড়ান্ত পর্যায়ে ইবাদত বলে গণ্য হলেও সাধারণ ভাবে ইবাদত নয়। আনুগত্য, ভয়, ভালবাসা ইত্যাদি এ পর্যায়ের। ভয় আল্লাহর ইবাদত। কুরআন-হাদীসে বারংবার আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, উপরন্তু কেবলমাত্র আল্লাহকে ভয় করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু এর মানে এ নয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করা শিরক। মহান আল্লাহ বলেন:

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ

"তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছ আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন; তুমি মানুষদেরকে ভয় করছ, অথচ আল্লাকেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত।"[১৫৮]

কেউই কল্পনা করবেন না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষকে ভয় করে শিরকে লিপ্ত হয়েছিলেন। বস্তুত, মানুষ প্রাকৃতিকভাবে মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টিকে ভয় পায়। এতে শিরক হবে বলে বলে কেউ মনে করবে না। এমনকি মানুষের ভয়ে, অস্ত্রের ভয়ে বা প্রাণ বাঁচানোর জন্য আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করাকেও কেউ শিরক বলবেন না। সর্বোপরি মানুষের ভয়ে বা জীবন বাঁচাতে সুস্পষ্ট শিরক করলেও তাকে শিরক বলে গণ্য করা হবে না। 'ভয়' ইবাদত হওয়ার অর্থ হলো, শুধু চূড়ান্ত পর্যায়ের অলৌকিক, অপার্থিব বা 'আল্লাহর মত অন্য কাউকে ভয় পাওয়া'ই শিরক বলে গণ্য হবে।

এ পর্যায়ের ভয় মূলত কর্মের সাথে সম্পৃক্ত নয়, বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত। 'আল্লাহর মত অমুককে ভয় পাচ্ছে' বললেই শিরক হয় না। বরং কোন্ বিশ্বাসের ভিত্তিতে সে ভয় পাচ্ছে তাই বিবেচ্য। মুলত বিশ্বাসই শিরক, কর্ম নয়। কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য সত্তাকে আল্লাহর মত অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার অধিকারী বা কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক, জাগতিক নিয়মের বাইরে অলৌকিকভাবে ইচ্ছা করলেই ভাল-মন্দ করতে সক্ষম অথবা বা কোনোভাবে আল্লাহর ক্ষমতার অংশীদার বলে বিশ্বাস করে তবে তা শিরক হবে। এ বিশ্বাসজাত ভয়ের কারণে যদি সে রাস্তার ডান থেকে বামে চলে যায় তবুও তা শিরক। আর যদি মানবীয় ভয়ের কারণে সে আল্লাহর বিধানের সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে শিরকে লিপ্ত হয়, তবুও তা শিরক বলে গণ্য হবে না।

কাজেই 'ভয়'-এর ক্ষেত্রে কর্ম নয় বিশ্বাসই বিবেচ্য। জবাই, উৎসর্গ, প্রার্থনা, সাজদা বা মানতের ক্ষেত্রে যেমন কর্মই মূলত শিরক প্রমাণ করে, ব্যাখ্যা তা দূরীভূত বা নিশ্চিত করে, ভয়-এর ক্ষেত্রে বিষয়টি উল্টা। কর্ম কখনোই শিরক প্রমাণ করে না। কারো কোনো পরিমাণের ভয় দেখেই এ কথা বলা যায় না যে, লোকটির কর্ম শিরক, অথবা লোকটি কাফির বা মুশরিক। তবে যদি লোকটির বক্তব্য দ্বারা তার শিরকী বিশ্বাস প্রমাণিত হয় তবে তা শিরক বলে গণ্য হবে।

(ঙ) 'আনুগত্য'ও ভয়, ভালবাসা ইত্যাদি কর্মের মত কর্ম। কাউকে আল্লাহর মত চূড়ান্ত প্রশ্নাতীত সর্বময় আনুগত্যের যোগ্য ও চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করে তার আনুগত্য করলেই শুধু তা শিরক বলে গণ্য হবে। মূলত বিশ্বাসই শিরক, কর্ম নয়। এইরূপ বিশ্বাস নিয়ে যদি কারো হুকুম মত ইসলাম-অনুমোদিত বৈধ কর্মও করে তবুও তা শিরক। আর যদি মানবীয় ভালবাসা, ভয়, লোভ ইত্যাদি কারণে কারো নির্দেশ মত আল্লাহর বিধানের বিরোধী কাজ করে তবুও তা শিরক বলে গণ্য হবে না। আমরা দেখেছি যে, এরূপ ভয়জনিত আনুগত্যের ভিত্তিতে শিরক বা কুফরী কর্মে লিপ্ত হলেও তা শিরক-কুফর বলে গণ্য হবে না।

(চ) ইহূদী-খৃস্টানদের আনুগত্য ছিল শিরক পর্যায়ের আনুগত্য। অতীতে এবং বর্তমানেও তারা তাদের পণ্ডিত, পাদরী, ধর্মগুরু বা পোপদের ক্ষেত্রে ঐশ্বরিক পবিত্রতা (divinity, holiness, sanctity) ও অভ্রান্ততা (infallibility) বা 'ইসমত'-এ' বিশ্বাস করে। তারা বিশ্বাস করে যে, ধর্মগ্রন্থে কি আছে তা বিবেচ্য নয়, বরং পবিত্র-আত্মায় পূর্ণ হয়ে ধর্মগুরুগণ যা ব্যাখ্যা দিবেন তাই চূড়ান্ত। ইহূদী-খৃস্টান ধর্মের ইতিহাসের সাথে পরিচিত সকলেই তা জানেন।

উপর্যুক্ত হাদীসগুলি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাদের শিরক ছিল বিশ্বাসে, কর্মে নয়। পাদরী-পোপ যা হালাল বা হারাম বলে ঘোষণা করত তারা তা হালাল বা হারাম বলে বিশ্বাস করত; কারণ তারা তাদের পবিত্রতায় (holiness, sacredness, sanctity) বিশ্বাস করত। এ ছিল তাদের শিরক। তারা সে হারামকে বর্জন করতো কিনা বা হালালকে পালন করতো কি না তা বিবেচ্য নয়।

এরূপ আনুগত্যের পাশাপাশি ইহূদী-খৃস্টানগণ ধর্মগুরু ও দরবেশদের ইবাদতও করত। তারা তাদেরকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করত, তাদের বর লাভের জন্য তাদের সাজদা করত, অনেকের মূর্তি বানিয়ে সেখানে মানত, উৎসর্গ, সাজদা ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের ইবাদত করত।

(ছ) শয়তানের বন্ধু বা মুশরিকদের আনুগত্যের বিষয়টিও একইরূপ। এখানে আনুগত্য কর্মে নয়, বিশ্বাসে। এখানে আনুগত্য হলো মৃত প্রাণীর মাংস ভক্ষণ বৈধ বলে বিশ্বাস করা।

মহান আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই করা হয়নি এমন পশুর মাংস ভক্ষণ করা হারাম। শয়তান তার বন্ধদেরকে প্রেরণা দিল এ বিধান সঠিক নয় বলে প্রমাণ করে মুসলিমদের তাদের দলে নেওয়ার জন্য। তাদের যুক্তি ছিল, আমরা

নিজেরা যা হত্যা করি তা খাওয়া বৈধ আর আল্লাহ যা হত্যা করেন (স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে) তা খাওয়া অবৈধ হয় কিভাবে? এ যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ যা হত্যা করেছেন, অর্থাৎ যা আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই করা হয় নি, বরং স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে তা ভক্ষণ করা বৈধ। মুসলিমদেরকে আল্লাহ জানান যে তোমরা যদি তাদের এ মত মেনে নাও এবং মৃতপ্রাণীর মাংস ভক্ষণ বৈধ বলে বিশ্বাস কর তবে তোমরাও তাদের মত মুশরিক হয়ে যাবে।

এ আয়াতের অর্থ এ নয় যে, কেউ যদি বাধ্য হয়ে, লোভে পড়ে বা অন্য কোনো কারণে কোনো কাফিরের নির্দেশ মান্য করে মৃতপ্রাণীর মাংস ভক্ষণ করে তবে সে মুশরিক হয়ে যাবে। এর অর্থ, কেউ যদি মুশরিকদের দলিল-প্রমাণ ও যুক্তিতে প্রভাবিত হয়ে তাদের মতটিকে সঠিক বলে মেনে নেয় বা তাদের 'বিশ্বাস' গ্রহণ করে তবে বাস্তবে মৃতপ্রাণীর মাংস ভক্ষণ করুক অথবা না করুক সে মুশরিক বলে গণ্য হবে।[১৫৯]

৩. ৮. ৫. তাগুত বর্জন ও অবিশ্বাস

তাগুত অবিশ্বাস ও বর্জন বিষয়ক আয়াতগুলিকে জামাআতুল মুসলিমীন নেতৃবৃন্দ তাদের মতের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করতেন। তাগুত শব্দটি কুরআনে ৮ স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে।[১৬০] ইতোপূর্বে একটি আয়াতে দেখেছি যে আল্লাহ বলেছেন: "দীনে কোনো জবরদস্তি নেই। ... যে তাগূতকে অবিশ্বাস করবে এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করবে সে এমন এক মযবুত হাতল ধরবে যা কখনো ভাঙ্গবে না।" অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا

"তুমি কি দেখ নি তাদেরকে যারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তারা বিশ্বাস করে, অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাগূতকে অবিশ্বাস করার আর শয়তান চায় তাদেরকে ভিষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে? তাদেরকে যখন বলা হয় আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে এস, তখন মুনাফিকদেরকে তুমি তোমার নিকট হতে মুখ একেবারে ফিরিয়ে নিতে দেখবে।"[১৬১]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

"আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দিয়ে আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি।"[১৬২]

এখানে তাগুতকে বর্জন করা বলতে তাগুতের ইবাদত বর্জন করা বুঝানো হয়েছে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى

"যারা তাগূতের ইবাদত করা বর্জন করে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ।"[১৬৩]

তাগূত শব্দটি আরবী 'তুগইয়ান' শব্দ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, যার অর্থ সীমালঙ্ঘন করা। অবাধ্যতা, জুলুম বা অন্যায়ের ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘনকারীকে 'তাগী' বা 'সীমালঙ্ঘনকারী' বলা হয়। অত্যধিক সীমলঙ্ঘনকারীকে 'তাগিয়াহ' বা তাগূত বলা হয়। এভাবে আমরা দেখছি যে, আভিধানিকভাবে 'তাগূত' অর্থ 'মহা-সীমালঙ্ঘনকারী'।[১৬৪]

আভিধানিকভাবে সকল সীমালঙ্ঘনকারী বা অবাধ্যকে 'তাগূত' বা 'তাগিয়াহ' বলা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো কুরআনের পরিভাষায় এ 'মহা-সীমালঙ্ঘনকারী' কে, কাফিরগণ যাকে বিশ্বাস করে এবং যার পথে যুদ্ধ করে, আর যাকে অবিশ্বাস ও যার ইবাদত বর্জন করা মুমিনের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ? যার কাছে বিচার প্রার্থনা করা মুনাফিকদের কর্ম?

তাগুতের নিকট বিচারপ্রার্থনা বিষয়ক আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী বলেন:

قَالَ جَابِرٌ كَانَتْ الطَّوَاغِيتُ الَّتِي يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهَا فِي جُهَيْنَةَ وَاحِدٌ وَفِي أَسْلَمَ وَاحِدٌ وَفِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٌ كُهَّانٌ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ وَقَالَ عُمَرُ ... الطَّاغُوتُ الشَّيْطَانُ وَقَالَ عِكْرِمَةُ ... الطَّاغُوتُ الْكَاهِنُ

"জাবির (রা) বলেন, তারা যে সকল তাগূতের নিকট বিচার প্রার্থনা করত তার একজন ছিল জুহাইনা গোত্রে, একজন ছিল আসলাম গোত্রে এবং প্রত্যেক গোত্রেই গণক-পুরোহিত ছিল যাদের উপর শয়তান অবতীর্ণ হতো। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, তাগূত অর্থ শয়তান। ইকরিমা বলেছেন, তাগূত অর্থ কাহিন বা গণক-পুরোহিত।[১৬৫]

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী (৩১০ হি) তাঁর তাফসীরে বিভিন্ন সনদে মুফাসসির সাহাবী ও তাবিয়ীগণ থেকে 'তাগূতের' ব্যাখ্যায় তিনটি মত উল্লেখ করেছেন। সাহাবী উমার (রা), তাবিয়ী মুজাহিদ, শা'বী, কাতাদাহ, দাহ্হাক, সুদ্দী প্রমুখ মুফাস্সির বলেন, তাগূত অর্থ শয়তান। তাবিয়ী আবুল আলিয়াহ ও মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন বলেন, তাগূত অর্থ যাদুকর। সাহাবী জাবির (রা), তাবিয়ী সাঈদ ইবনু জুবাইর, রুফাই, ইবনু জুরাইজ প্রমুখ মুফাস্সির বলেছেন, তাগূত অর্থ 'কাহিন' বা গণক-পুরোহিত।[১৬৬]

কুরআনে বিভিন্ন স্থানে তাগূত শব্দটির ব্যবহারের মধ্যে তুলনা করলে প্রথম ব্যাখ্যাটির শক্তিশালী বলে প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ বলেন:

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ

"যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে যান। আর যারা কুফরী করেছে তাদের অভিভাবক তাগূত। তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়।"[১৬৭]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

"যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে। আর যারা কুফরী করেছে তারা তাগূতের পথে যুদ্ধ করে। অতএব তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল।"[১৬৮]

এ দুটি আয়াতে স্পষ্টতই তাগুত বলতে শয়তান বুঝানো হয়েছে। প্রথম আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফিরদের বন্ধু তাগূত এবং পরের আয়াতে বলা হয়েছে যে, কাফিরগণ শয়তানের বন্ধ। এথেকে স্পষ্টত বুঝা যায় যে, তাগূত ও শয়তান একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া দ্বিতীয় আয়াতে তাগূত ও শয়তান শব্দদ্বয়ের ব্যবহার থেকে বুঝা যায় যে, দুটি দ্বারা একই অর্থ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কাফিরগণ তাগূতের পথে যুদ্ধ করে, কাজেই তোমরা তাগূতের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।

ইবনু কাসীর বলেন, "তাগূতের অর্থ শয়তান বলা অত্যন্ত জোরালো মত। কারণ মুর্তি, স্তম্ভ, পাথর, গাছপালা ইত্যাদির পূজা, এগুলির কাছে বিচার চাওয়া, এগুলির জন্য লড়াই করা ইত্যাদি জাহিলী যুগের সকল অকল্যাণের উৎস হলো শয়তান। কাজেই এক কথায় সকল অর্থ এসে যায়।"[১৬৯]

হাদীস শরীফে মূর্তি-প্রতিমাকে 'তাগূত' বা 'তাগিয়াহ' বলা হয়েছে। দেব-দেবীর নামে শপথের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِيْتِ (بِالطَّوَاغِي) وَلا بِآبَائِكُمْ

"তোমরা তাগুতদের নামে শপথ করবে না এবং তোমাদের পিতাদের নামে শপথ করবে না।"[১৭০]

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى (حَوْلَ) ذِي الْخَلَصَةِ وَذُو الْخَلَصَةِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

কিয়ামতের পূর্বেই দাওস গোত্রের মহিলাদের নিতম্ব দাওস গোত্রের তাগিয়াহ 'যুল খালাসা' প্রতিমার নিকট আন্দোলিত হবে।[১৭১]

উপরের আয়াতগুলিতে আমরা দেখেছি যে, মহান আল্লাহ ঈমানের দুটি অংশ উল্লেখ করেছেন: আল্লাহকে বিশ্বাস করা এবং তাগূতকে অবিশ্বাস করা। আর এ অর্থে অন্যত্র বলা হয়েছে যে, আল্লাহর ইবাদত করতে হবে এবং তাগূতের ইবাদত বর্জন করতে হবে। এ অর্থে একটি হাদীস প্রণিধান যোগ্য। তারিক ইবনু আশইয়াম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ.

"যদি কেউ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে এবং আল্লাহ ছাড়া যা কিছু ইবাদত করা হয় তা অবিশ্বাস করে, তবে তার রক্ত ও

সম্পদ নিষিদ্ধ হবে, তার হিসাব হবে আল্লাহর উপর।"[১৭২]

উপরের আয়াতগুলির সাথে এ হাদীসের অর্থ সমন্বয় করলে বুঝা যায় যে, 'তাগূত' বলতে 'আল্লাহ ছাড়া যা কিছু ইবাদত করা হয়' বুঝানো হয়েছে। পরবর্তী যুগের অনেক মুফাসসির এ প্রকারের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ইমাম মালিক (১৭৯ হি) থেকে বর্ণিত, আল্লাহকে ছাড়া যাকেই ইবাদত করা হয় সেই তাগূত।[১৭৩] ইমাম তাবারী (৩১০ হি) এ অর্থই সঠিক বলে উল্লেখ করেছেন।"[১৭৪] কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, "আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয় অথবা আল্লাহর বিরোধিতায় যার আনুগত্য করা হয় সেই তাগূত।"[১৭৫]

এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করা হয়েছে এবং হচ্ছে তাদের মধ্যে রয়েছেন ঈসা, উযাইর, ইয়াগূস, ইয়াউক, নসর ও অন্যান্য নবী, ওলী ও ফিরিশতাগণ। এদেরকে তো তাগূত বলা যায় না। তাহলে মুফাসসিরদের এ ব্যাখ্যা কিভাবে গ্রহণ করা যাবে? এক্ষেত্রে তারা বলেছেন যে, যারা ইবাদত গ্রহণে তুষ্ঠ তাদেরকেই তাগূত বলা হবে; কারণ তারা আল্লাহর অবাধ্যতায় মহা-সীমালঙ্ঘনকারী। অথবা ইবাদতকারীদের কর্মের ভিত্তিতে তাদেরকে তাগূত বলা হবে। অর্থাৎ ইবাদতকারীগণ তাদের ইবাদত করে মহা-সীমালঙ্ঘনকারীতে পরিণত হয়েছে।[১৭৬]

এভাবে আমরা দেখছি যে, ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করা এবং তাঁর ইবাদত করা এবং তাগূতকে অবিশ্বাস করা এবং তাগূতের ইবাদত বর্জন করা। শয়তানই এ তাগূত। এছাড়া শয়তানের নির্দেশে আল্লাহ ছাড়া যা কিছু ইবাদত করা হয়েছে সবই তাগূত। মুমিনের দায়িত্ব ইবাদতের অধিকার একমাত্র আল্লাহরই বলে বিশ্বাস করা, শুধু আল্লাহরই ইবাদত করা, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো কিছুর ইবাদত গ্রহণের অধিকার অবিশ্বাস করা এবং এবং অন্য কিছুর ইবাদত বর্জন করা। আল্লাহর যা অবতীর্ণ করেছেন তা এবং তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে পরিত্যাগ করে অন্য ধর্মের গণক-পুরোহিতর নিকট বিচার প্রার্থনা করা বা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) বিচারকে অগ্রহণযোগ্য বিবেচনা করে অন্য কারো কাছে বিচার প্রার্থনা করা মুনাফিকদের কর্ম, যা কখনোই কোনো মুমিন করতে পারেন না।

এ সকল বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। তবে মুফাসসিরগণের কোনো কথা ও আভিধানিক অর্থকে ভিত্তি করে 'জামা'আতুল মুসলিমীন' নেতৃবৃন্দ দাবি করেন যে, আল্লাহর আইন ছাড়া বিচার-শাসনকারী সকল সরকারই 'তাগূত' এবং এদেরকে বর্জন করা ও অবিশ্বাস করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাজেই যে ব্যক্তি ঈমানের দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও এরূপ শাসক বা সরকারকে বর্জন করবে না বা সহযোগিতা ও আনুগত্য করবে, অথবা এ সকল দেশের আদালতে বিচার প্রার্থনা করবে সে কাফির, যদিও সে সালাত, সিয়াম ও ইসলামের অন্য সকল ইবাদত পালন করে।

এক্ষেত্রে তাদের বিভ্রান্তি সুস্পষ্ট:

প্রথমত: তাঁরা "তাগুত"-এর ব্যাখ্যায় সীমালঙ্ঘন করেছেন এবং 'তাগূতের' শাব্দিক ও কুরআনী অর্থের মধ্যে পার্থক্য নষ্ট করেছেন। সকল অবাধ্য পাপী সীমালঙ্ঘনকারীই আভিধানিকভাবে 'তাগূত' বলে অভিহিত হতে পারে, কিন্তু কুরআনে যে তাগূতকে অবিশ্বাস করতে ও ইবাদত বর্জন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সে শয়তান এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে ইবাদত করা হয়।

দ্বিতীয়ত: তাঁরা তাগূতের প্রতি মুমিনের দায়িত্বের বর্ণনায় সীমালঙ্ঘন করেছেন। কুরআনে তাগূতের প্রতি মুমিনের দুটি দায়িত্ব উল্লেখ করা হয়েছে: "অবিশ্বাস করা" ও "ইবাদত বর্জন করা"। অবিশ্বাস অর্থ তার অস্তিত্বে বা রাষ্ট্রক্ষমতায় অবিশ্বাস নয়, তার ইবাদত পাওয়ার অধিকারে অবিশ্বাস করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন, আল্লাহ ছাড়া যা কিছু ইবাদত করা হয় তা অবিশ্বাস করতে হবে। আমরা জানি, আল্লাহ ছাড়া অনেক ফিরিশতা ও নবীর (আ) ইবাদত করা হয়েছে। এখানে এদের অস্তিত্ব বা এদের মর্যাদা অবিশ্বাস করতে নির্দেশ দেওয়া হয় নি। বরং 'ইবাদত পাওয়ার কোনোরূপ অধিকার এদের আছে' তা অস্বীকার করতে হবে। অনুরূপভাবে ফিরাউন ও অন্যান্য শাসকের ইবাদত করা হয়েছে। তাদের প্রতি অবিশ্বাস অর্থ তাদের অস্তিত্বে বা রাজত্বে অবিশ্বাস নয়, বরং তাদের 'ইবাদত-যোগ্যতা' অবিশ্বাস করা।

তৃতীয়ত: তারা ইবাদত ও আনুগত্যের পার্থক্য নষ্ট করেছেন। আমরা ইতোপূর্বে বিষয়টি আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, শয়তানই মূলত তাগূত। আর তাগূতের আনুগত্য বা সহযোগিতা করলেই যদি কুফর বা শিরক হয়, তবে প্রত্যেক মানুষই কাফির ও মুশরিক বলে গণ্য হবে। কারণ প্রতিটি মানুষই শয়তানের প্ররোচনাই বিভিন্ন ভাবে আল্লাহর অবাধ্যতা বা পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান আছে এরূপ কোনো মানুষই এ ধরনের কথা বলবেন বলে মনে হয় না।

চতুর্থত: তাগূতের নিকট বিচারপ্রার্থনার ব্যাখ্যায় তারা সীমালঙ্ঘন করেছেন। অন্য ধর্মের গণক-পুরোহিত- যারা অলৌকিক বা গায়েবী জ্ঞান এবং সে জ্ঞানের ভিত্তিতে সঠিক বিচার করার যোগ্যতা ও অধিকার দাবি করেন- তাদের এরূপ জ্ঞান ও বিচারের যোগ্যতায় বিশ্বাস করা বা এরূপ বিশ্বাসের ভিত্তিতে তাদের কাছে বিচার চাওয়া নিঃসন্দেহে কুফরী। এছাড়া আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) নিকট ন্যায়বিচার পাওয়া যাবে না বা তাদের ফয়সালা অগ্রহণযোগ্য মনে করে অন্য যে কোনো ব্যক্তির নিকট বিচার চাওয়াও কুফরী। এখানে কুফরী বিশ্বাসে, অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) বিচারকে অগ্রহণযোগ্য মনে করা বা অন্য কারো অলৌকিক জ্ঞান ও নির্ভুল বিচারের যোগ্যতা আছে বলে বিশ্বাস করা।

আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব যে, সমকালীন মুসলিম দেশগুলির অধিকাংশ আইনই ইসলামী বা ইসলাম সম্মত। কিছু

আইন ইসলাম বিরোধী। কোনো মুমিন আল্লাহর আইনের শ্রেষ্ঠতে বিশ্বাস-সহ আল্লাহর আইনের অবিদ্যমানতার কারণে নিজের ন্যূনতম অধিকার রক্ষার জন্য এরূপ আইনের আশ্রয় নিলে তা কখনোই কুফরী বা পাপ বলে গণ্য নয়।

মুফাস্সিরগণ সহীহ, যয়ীফ, বানোয়াট অনেক মতামত উদ্ধৃত করেন, যেগুলি "মতামত" মাত্র। হালাল-হারাম বা ঈমান-কুফর নির্ধারণে সনদবিচার ও সহীহ হাদীস প্রয়োজন। এ সকল "মতামত" সনদভিত্তিক বিচার না করে পছন্দভিত্তিক গ্রহণ করার কারণে আমরা অনেক সময় ভুলের মধ্যে নিপতিত হই। তাগূতের নিকট বিচারপ্রার্থনার আয়াতের ক্ষেত্রেও তা ঘটেছে।

এ প্রসঙ্গে তাফসীরে যে সকল হাদীস বা সাহাবীগণের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে তার অধিকাংশেরই কোনো নির্ভরযোগ্য সনদ নেই। এরূপ একটি "হাদীস" এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয় যে, একজন ইহূদী ও মুনাফিক মুসলিমের মধ্যে কোনো বিষয়ে বিবাদ হয়। মুনাফিক ব্যক্তি একজন পুরোহিত বা ইহূদী নেতার কাছে বিচারপ্রার্থনা করতে চায়, কিন্তু ইহূদী লোকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বিচারপ্রার্থনায় আগ্রহী ছিল। একপর্যায়ে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বিচার চাইলে তিনি সবকিছু শুনে ইহূদীর পক্ষে বিচার করেন। মুনাফিক ব্যক্তি এতে অসন্তুষ্ট হয়ে উমার (রা)-এর নিকট বিচার প্রার্থনা করেন। তিনি বাদী ও বিবাদীর বক্তব্য শোনার পর উক্ত মুনাফিককে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। বিভিন্ন ভাষায় বর্ণিত এ "হাদীসটি"র কোনো গ্রহণযোগ্য সনদ নেই। ইবনু কাসীর তা উল্লেখ করেছেন।[১৭৭]

এ বর্ণনা বিশুদ্ধ হলেও সমকালীন আদালতে বিচার প্রার্থনা কুফরী বলে প্রমাণিত হয় না। বাদী ও বিবাদীর কর্ম থেকে বুঝা যায় যে, মদীনার প্রশাসন-ব্যবস্থায় উমার (রা)-এর ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা ছিল। আর মুনাফিক লোকটি নিজে উমার (রা)–এর কাছে বিচার চেয়েছে এবং স্বীকার করেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিচার সে অপছন্দ করেছে। বিবাদীও তার বক্তব্য সঠিক বলে সাক্ষ্য দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিচারকে আপত্তিকর মনে করা কুফরী। যেহেতু ব্যক্তি নিজেই নিজের অপরাধের জন্য বিচার প্রার্থনা করেছে কাজেই তাকে তার পাওনা শাস্তি প্রদান বৈধ। কিন্তু জামাআতুল মুসলিমীন ও অন্যান্যরা এরূপ যয়ীফ বা অনির্ভরযোগ্য বর্ণনার উপর তাদের মতামতের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং তাদের পছন্দমত এর ব্যাখ্যা করেন।

৩. ৮. ৬. রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বনাম কুফ্রীর প্রতি সন্তুষ্টি

'জামা'আতুল মুসলিমীন'-এর নেতৃবৃন্দ বলেন, এ সকল দেশের নাগরিকবৃন্দ যেহেতু আল্লাহর আইন অমান্যকারী রাষ্ট্রের ও সরকারের সাথে সহযোগিতা করেন, রাষ্ট্রের নির্বাচনে অংশ নিয়ে এসকল কাফিরদেরকে ক্ষমতায় থাকতে সাহায্য করেন এবং এদের অধীনে চাকরী করেন, সেহেতু এ সকল দেশের সকল নাগরিকই কাফির বলে গণ্য।

এখানে তারা পাপীর সাথে সহযোগিতা ও পাপে সহযোগিতার মধ্যে পার্থক্য না করে দুটি বিষয়কে এক পর্যায়ের বলে দাবি করেছেন। এরপর পাপের সহযোগিতার অভিযোগে সাধারণ মুসলিম জনসাধারণকে কাফির বলে দাবি করেছেন। তাদের বিভ্রান্তি অনুধাবন করতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি লক্ষণীয়:

(ক) কুরআন-হাদীসে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব বা অন্তরঙ্গ ভালবাসার বন্ধন তৈরি করতে নিষেধ করা হয়েছে। কয়েকটি আয়াত দেখুন:

لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً

"মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণ ব্যতীত কাফিরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক থাকবে না, তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের থেকে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর।"[১৭৮]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

"হে মু'মিনগণ, তোমরা ইয়াহূদী ও খৃস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে।"[১৭৯]

لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

"তুমি পাবে না আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোনো সম্প্রদায় যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধচারীদেরকে, হোক না এ বিরুদ্ধচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা বা তাদের জ্ঞাতি গোত্র।"[১৮০]

আরো অনেক আয়াতে এ বিষয়ে তাকিদ দেওয়া হয়েছে। এ সকল আয়াতের আলোকে প্রত্যেক মুমিনের দায়িত্ব, তার হৃদয় ও কর্মকে নিয়ন্ত্রন করা, যেন কাফির সম্প্রদায়ের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা হৃদয়ে স্থান না পায় এবং ভালবাসা প্রকাশক কোনো কর্ম যেন সে না করে।

তবে একথা সুস্পষ্ট যে, ভালবাসা মূলত হৃদয়ের কর্ম। কাজেই কারো কোনো কর্মকেই নিশ্চিতরূপে 'কুফরীর প্রতি বা কাফিরের প্রতি ভালবাসা' বলে নিশ্চিতরূপে চিহ্নিত করা যায় না, যতক্ষণ না তার সম্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে তা নিশ্চিত হয়। এজন্য শুধু কাফিরদের সাথে সুসম্পর্ক, সহযেগিতা বা এরূপ কোনো কাজের ভিত্তিতে কাউকে কাফির বলা যায় না। ইসলামের প্রধান শত্রু মক্কাবাসীদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মক্কা আক্রমনের গোপন তথ্য ফাঁস করে হাতিব (রা) পত্র লিখেছিলেন। তার কর্ম নিঃসন্দেহে আল্লাহ ও তার রাসূলের শত্রুদের প্রতি ভালবাসা প্রকাশক। কিন্তু শুধু কর্মের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কাফির বলে ঘোষণা দেন নি। বরং তার কর্মের উদ্দেশ জানতে চেয়েছেন এবং তার ওযর কবুল করেছেন। এমনকি তাকে তাওবা করার নির্দেশও দেন নি।[১৮১]

(খ) জাগতিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা কখনোই 'ভালবাসা' বা বন্ধুত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ কাফিরদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন। তাদের অধীনে চাকরী করেছেন। ইউসূফ (আ) মিসরের মুর্তি-পূজারী ফির'আউনের দেশে তারই রাজত্বে তারই অধীনে চাকরী করেছেন।

(গ) পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, উপনিবেশোত্তর মুসলিম দেশগুলির শাসক, প্রশাসক বা সরকারকে ইহূদী, খৃস্টান বা মুশরিকদের মত কাফির মনে করা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বিভ্রান্তি ছাড়া কিছুই নয়। এদের কারো কর্ম কঠিন পাপ বা কুফরী হলেও, এদের সুস্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা কুফরী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকেই কাফির বলা যায় না। এরূপ সরকারের অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বহাল রাখা এবং ইসলামবিরোধী নয় এরূপ বিষয়ে তার আনুগত্য করাই ইসলামের নির্দেশ। উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لا مَا صَلَّوْا

"অচিরেই তোমাদের উপর অনেক শাসক প্রশাসক আসবে যারা ন্যায় ও অন্যায় উভয় প্রকারের কাজ করবে। যে ব্যক্তি তাদের অন্যায়কে ঘৃণা করবে সে অন্যায়ের অপরাধ থেকে মুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি আপত্তি করবে সে (আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে) নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু যে এ সকল অন্যায় কাজ মেনে নেবে বা তাদের অনুসরণ করবে (সে বাঁচতে পারবে না।)" সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বলেন, "না, যতক্ষণ তারা সালাত আদায় করবে।"[১৮২]

যদি কোনো নাগরিক তার সরকারের অন্যায় সমর্থন করেন, অন্যায়ের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন বা অন্যায়ের ক্ষেত্রে সরকারের অনুসরণ করেন তবে তিনি তার সরকারের পাপের ভাগী হবেন। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা, চাকরী, কর্ম বা রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের কারণে কোনো নাগরিক পাপী হবে না। আউফ ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَلا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ

"তোমরা হুশিয়ার! তোমাদের কারো উপরে যদি কোনো শাসক-প্রশাসক নিযুক্ত হন এবং সে দেখতে পায় যে, উক্ত শাসক বা প্রশাসক আল্লাহর অবাধ্যতার কোনো কাজে লিপ্ত হচ্ছেন, তবে সে যেন আল্লাহর অবাধ্যতার উক্ত কর্মকে ঘৃণা করে, কিন্তু আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেবে না।"[১৮৩]

অন্য বর্ণনায়:

إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ

"যখন তোমরা তোমাদের শাসক-প্রশাসকগণ থেকে এমন কিছু দেখবে যা তোমরা অপছন্দ কর, তখন তোমরা তার কর্মকে অপছন্দ করবে, কিন্তু তার আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিবে না।"[১৮৪]

৩. ৮. ৭. জামা'আত ও বাই'আতের তত্ত্ব

বিশ্বের সকল সমাজের সকল মুসলিমকে কাফির বলে গণ্য করার ক্ষেত্রে তাদের একটি বড় তত্ত্ব ছিল জামা'আত ও বাই'আত তত্ত্ব। তারা দাবি করত যে সমকালীন সকল মুসলিম দেশ ও সমাজ কাফির ও জাহিলী সমাজ। এগুলির সাথে কুফরী ও সম্পর্কচ্ছেদ না করা পর্যন্ত কেউ মুমিন বলে গণ্য হবে না। আর কাউকে মুমিন বলে বা "দীনী ভাই" বলে চিনতে পারার একমাত্র মাধ্যম হলো বাই'আত। শুধুমাত্র 'জামা'আত' ও বাইয়াতের মাধ্যমেই একজন মুসলিমকে অমুসলিম থেকে পৃথক করা যাবে। যতক্ষণ না কোনো মুসলিম তাদের ইমামের হাতে বাইয়াত করে তাদের 'জামাআতে' যোগ দিবে ততক্ষণ তাকে মুমিন বলে গণ্য কার যাবে না।

এ দাবির পক্ষে তারা কুরআন ও হাদীসের বাইয়াত ও জামা'আত বিষয়ক নির্দেশগুলিকে দলিল হিসেবে পেশ করে। তাদের এ দাবি মুর্খতা ও বিভ্রান্তির সংমিশ্রণ ছিল। কারণ তাদের পেশ করা দলিলের কোনোটিতেই বাইয়াত ও জামা'আতকে ঈমানের

পরিচয় হিসেবে উল্লেখ করা হয় নি। তারা এ পরিভাষাদ্বয়ের অর্থও বুঝতে পারে নি।

ভাষাবিদগণ জানেন যে, ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের অর্থ যুগের আবর্তনে পরিবর্তিত হয়। আরবী ভাষা যদিও কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সভ্যতার কারণে স্বাভাবিক বিবর্তন ও পরিবর্তন থেকে অনেকটা রক্ষা পেয়েছে, তবুও অনেক আরবী শব্দের অর্থ আংশিক বা পরিপূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের যুগের ব্যবহৃত অর্থ এবং বর্তমানে প্রচলিত অর্থের মধ্যে অনেক সময় আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়।

এ জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের বক্তব্য ব্যাপক অধ্যয়ন এবং প্রাচীন মুফাস্সির ও মুহাদ্দিসগণের ব্যাখ্যা অধ্যয়ন না করলে এ সকল ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ আরব পাঠকও বিভ্রান্ত হন। এরূপ বিভ্রান্তি শিকার হন 'জামা'আতুল মুসলিমীন' নেতৃবৃন্দ 'জামা'আত' শব্দের ক্ষেত্রে।

'জামা'আত' ও 'বাই'আত' ইসলামের দুটি রাষ্ট্রনৈতিক পরিভাষা। জামা'আত শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি **"কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা"** গ্রন্থে।[১৮৫] এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, জামাআত শব্দের আভিধানিক অর্থ "ঐক্য" বা "ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠী"। যে কোনো স্থানে যে মানুষগুলি থাকেন তাদের সমষ্টিকে বা তাদের ঐক্যবদ্ধতাকে "জামাআত" বলা হয়। জামাআতের বিপরীত হলো ফিরকা বা হিযব, অর্থাৎ দল বা গ্রুপ।

মনে করুন একটি মসজিদের মধ্যে ১০০ জন মুসল্লী আছেন। এরা মসজিদের জামা'আত। এদের মধ্যে কম বা বেশি সংখ্যক মুসল্লী যদি পৃথকভাবে একত্রিত হয়ে মসজিদের এক দিকে বসেন তবে তারা একটি ফিরকা, কাওম বা হিযব, অর্থৎ দল, গ্রুপ বা সম্প্রদায় বলে গণ্য, কিন্তু তারা জামা'আত বলে গণ্য নয়। যেমন, উপর্যুক্ত ১০০ জনের মধ্য থেকে ৫ জন এক দিকে পৃথক হয়ে বসলেন, আর দশ জন অন্য কোণে পৃথক হয়ে বসলেন এবং অন্য কোণে আরো কয়েকজন একত্রিত হলেন। এখন আমরা ফিরকা ও জামা'আতের রূপ চিন্তা করি। মূলত মসজিদের জামা'আত বা ঐক্য ভেঙ্গে ইফতিরাক বা দলাদলি এসেছে। তিনটি ফিরকা বা দল মূল জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আর বাকি যারা কোনো 'দল' বা ফিরকা গঠন না করে দলবিহীনভাবে রয়ে গিয়েছেন তারা নিজেদেরকে 'জামা'আত' বলতে পারেন। আর এ অর্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে "জামাআত" বলা হয়।

এভাবে একটি ঘর, মসজিদ বা মাহফিলের মধ্যে বিদ্যমান সকল মানুষের বা অধিকাংশ মানুষের সমষ্টি বা তাদের ঐক্যবদ্ধতাকে উক্ত স্থানের 'জামাআত' বলা হয়। যেমন বলা হয়, মসজিদের জামাআত, ঘরের জামাআত, মহল্লার জামাআত, মাহফিলের জামাআত। অর্থাৎ ঘর, মহল্লাহ, মসজিদ বা মাহফিলের সকল মানুষ। এ অর্থে অল্প কিছু মানুষকেও জামাআত বলা যেতে পারে, তবে তা 'সকল মানুষের ঐক্য' অর্থে নয়, বরং 'নির্ধারিত স্থানের সকল মানুষের ঐক্য' অর্থে।

কুরআন-হাদীসে "জামাআত" বলতে "জামাআতুল মুসলিমীন" বা সকল মুসলিমের বা অধিকাংশ মুসলিমের ঐক্য বুঝানো হয়েছে। কুরআন, হাদীস ও মূল আরবী ব্যবহার অনুসারে 'জামা'আত' অর্থ জনগণ, জনগোষ্ঠী বা সমাজ (community, society). বিভিন্ন হাদীসে 'জামা'আত'-এর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। 'জামা'আত-বদ্ধ' থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং 'বিচ্ছিন্ন হতে' নিষেধ করা হয়েছে। এ সকল নির্দেশের অর্থ, মুসলিম যে সমাজে বা জনগোষ্ঠীতে বসবাস করবেন, সে সমাজের মানুষদের রাজনৈতিক, সামাজিক সিদ্ধান্তাদির সাথে একমত থাকতে হবে, যদিও সে সিদ্ধান্ত তার বা তার গোষ্ঠীর মতামত বা স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়।

মূলত রাষ্ট্রীয় বিষয়েই রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সকল নির্দেশনা দিয়েছেন। জামা'আত ও বাইয়াত বিষয়ক নির্দেশাদি একই সত্রে বাঁধা। জামা'আত অর্থ সমাজ বা রাষ্ট্রের জনগণ বা তাদের ঐক্য এবং বাইয়াত অর্থ রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের শপথ। আরবগণ প্রাচীন যুগ থেকে 'কাবীলা' বা গোত্রতান্ত্রিক বিভক্ত সমাজে বসবাস করত। ইসলামের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিচ্ছিন্ন কবীলা বা গোত্র কেন্দ্রিক আরব সমাজকে বিশ্বের সর্বপ্রথম আধুনিক জনগণতান্ত্রিক পরামর্শভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে আনেন। আরবরা রাষ্ট্রিয় আনুগত্য বুঝতো না। তারা বুঝতো কবীলা বা গোত্র প্রধানের আনুগত্য। বিচ্ছিন্নভাবে ছোট বা বড় গোত্রের অধীনে তারা বাস করত। গোত্রের বাইরে কারো আনুগত্য বা অধীনতাকে তারা অবমাননাকর বলে মনে করত। এছাড়া ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বাধীনতাবোধ তাদেরকে তাদের মতের বাইরে সকল সিদ্ধান্ত অমান্য করতে প্রেরণা দিত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিচ্ছিন্ন জাতিকে প্রথমবারের মত কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসেন। তিনি এজন্য বারবার তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও আনুগত্যের মধ্যে অবস্থান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্য বর্জন করা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা করা, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বাইরে বা রাষ্ট্রহীনভাবে বাস করাকে তিনি জাহিলী জীবন ও এ প্রকারের মৃত্যুকে জাহিলী মৃত্যু বলেছেন। কারণ জাহিলী যুগের মানুষ রাষ্ট্র চিনত না এবং রাষ্ট্রহীনভাবে বসবাস করত। কাজেই এভাবে থাকা নিঃসন্দেহে জাহিলী জীবন ও এভাবে মরা জাহিলী মরা। পছন্দ হোক বা না হোক রাষ্ট্র প্রশাসনের আনুগত্য করতে হবে। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, কবীলা বা দলের মতামতের কারণে বা কোন অবস্থাতেই রাষ্ট্র বা সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। প্রয়োজনে রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রশাসনকে সৎকাজে আদেশ, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ ও সংশোধন করতে হবে। কিন্তু বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ ও হানাহানি নিষিদ্ধ।

এ অর্থে তিনি যে সকল নির্দেশনা দিয়েছেন তা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তিনি মুসলিম উম্মাহকে সর্বদা রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য করতে বলেছেন। রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের প্রতীক "বাইয়াত" বা "আনুগত্যের শপথ" সর্বদা বজায় রাখতে বলেছেন। তিনি তাদেরকে "জামা'আত" বদ্ধ থাকতে বলেছেন। এ সকল হাদীসের মর্মাথ একই। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে থাকতে হবে

এবং বিদ্রোহ, হানাহানি বা ক্ষমতা দখলের অবৈধ প্রক্রিয়া ও প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে হবে।[১৮৬]

এ অর্থের হাদীসগুলি পর্যালোচনা করলেই আমরা তা বুঝতে পারব। ইবনু আব্বাস (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ (لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ) إِلا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

"কেউ তার শাসক বা প্রশাসক থেকে কোন অপছন্দনীয় বিষয় দেখলে তাকে ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে। কারণ যদি কেউ জামা'আতের (মুসলিম সমাজ বা রাষ্টের ঐক্যের) বাইরে এক বিঘতও বের হয়ে যায় এবং এ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তাহলে সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।"[১৮৭]

আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

"যে ব্যক্তি 'তা'আত' বা 'রাষ্ট্রীয় আনুগত্য' থেকে বের হয়ে এবং জামা'আত বা মুসলিম সমাজ ও জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করল সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।"[১৮৮]

মু'আবিয়া (রা) তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর পুত্র ইয়াযিদকে রাষ্ট্র প্রধান পদে মনোনয়ন দান করেন এবং তার আনুগত্যের জন্য তিনি রাষ্ট্রের সকল নাগরিক থেকে বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। ৬০ হিজরীতে মু'আবিয়া (রা)-এর ইন্তেকালের পরে ইয়াযিদ শাসনভার গ্রহণ করেন এবং চার বছর শাসন করে ৬৪ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। তার শাসনামলে ৬৩ হিজরীতে মদীনার অধিবাসীগণ ইয়াযিদের জুলুম-অত্যাচার, ইমাম হুসাইনের শাহাদত ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে বিদ্রোহ করেন। তাদের বিদ্রোহ ছিল যুক্তিসঙ্গত এবং একান্তই আল্লাহর ওয়াস্তে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে অনুপ্রেরণা নিয়ে। কিন্তু তা সত্বেও সে সময়ে জীবিত সাহাবীগণ বিদ্রোহে রাজী ছিলেন না। সহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা) মদীনার বিদ্রোহের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনু মুতি'র নিকট গমন করেন। তিনি তাকে সম্মানের সাথে বসতে অনুরোধ করেন। ইবনু উমর বলেন: আমি বসতে আসিনি। আমি তোমাকে একটি হাদীস শুনাতে এসেছি। আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি:

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

"যে ব্যক্তি 'তাআত' বা রাষ্ট্রীয় আনুগত্য থেকে নিজেকে বের করে নিল সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হলে নিজের জন্য কোন ওজর পেশ করতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল যে, তার গলায় কোন 'বাই'আত' বা রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের অঙ্গীকার নেই সে ব্যক্তি জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।"[১৮৯]

রাষ্ট্রীয় ঐক্য বা "জামাআত" বিনষ্ট করা এত বড় অপরাধ যে, এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আরফাজা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ (مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ)

"ভবিষ্যতে অনেক বিচ্যুতি-অন্যায় সংঘটিত হবে। যদি এমন ঘটে যে, এ উম্মাতের ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় কেউ এসে সে ঐক্য বিনষ্ট করে বিভক্তি সৃষ্টি করতে চায় তবে সে যেই হোক না কেন তোমরা তাকে তরবারী দিয়ে আঘাত করবে। অন্য বর্ণনায়: তোমাদের বিষয়টি একব্যক্তির বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় (একজন্য রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনে থাকা অবস্থায়) কোনো একব্যক্তি যদি এসে তোমাদের ঐক্য বিনষ্ট করতে বা 'জামাআত' বিভক্ত করতে চায় তবে তাকে হত্যা করবে।"[১৯০]

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا

"যদি দুজন খলীফার বাইয়াত করা হয় তবে যে পরে বাইয়াত নিয়েছে তাকে হত্যা করবে।"[১৯১]

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান বলেন, মানুষেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভাল বিষয়াদি সম্পর্কে প্রশ্ন করত। আমি তাঁকে খারাপ বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতাম, এ ভয়ে যে, কি জানি আমি কোনো খারাপের মধ্যে নিপতিত হয়ে যায় কিনা। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা জাহিলিয়্যাত ও অকল্যাণের মধ্যে ছিলাম। তখন আল্লাহ আমাদেরকে এ কল্যাণ এনে দিলেন। এর পরে কি আবার

কোনো অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সে অকল্যাণের পরে কি আবার কল্যাণ ফিরে আসবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তবে তার মধ্যে কিছু জঞ্জাল-ময়লা থাকবে। আমি বললাম, সে জঞ্জাল-ময়লা কি? তিনি বলেন, কিছু মানুষ যারা আমার আদর্শ ও নীতি ছেড়ে অন্য আদর্শ ও রীতি অনুসরণ করবে। তুমি তাদের মধ্যে ভাল ও মন্দ দেখতে পাবে। আমি বললাম, এ ভাল অবস্থার পরে কি আবার খারাপ অবস্থা আছে? তিনি বলেন, হ্যাঁ। জাহান্নামের দরজাগুলির দিকে আহ্বানকারীগণ (আবির্ভুত হবে), যারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তাদের বর্ণনা দিন। তিনি বললেন, তারা আমাদেরই চামড়ার মানুষ-আমাদেরই স্বজাতি, আমাদের ভাষাতেই তারা কথা বলবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি যদি এ অবস্থায় পড়ে যাই তবে আপনি আমাকে কি করতে বলেন, তিনি বলেন:

تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ

"তুমি মুসলিমদের জামা'আত (সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ জনগোষ্ঠী) ও তাদের ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান)-কে ধরে থাকবে। আমি বললাম, যদি তাদের কোনো জামা'আত না থাকে এবং কোনো ইমামও না থাকে (জনগণ সকলেই ক্ষুদ্রক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থাহীন বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকে), তিনি বললেন, সেক্ষেত্রে তুমি সে সকল দল সবগুলিকেই পরিত্যাগ করবে। যদি তোমাকে কোনো গাছের মূল কামড়ে ধরে পড়ে থাকতে হয় তাও থাকবে। এভাবে থাকা অবস্থাতেই যেন তোমার মৃত্যু এসে যায়।"[১৯২]

হারিস আশ'আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلا أَنْ يَرْجِعَ

"আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি, যেগুলির নির্দেশ আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন: শ্রবণ, আনুগত্য, জিহাদ, হিজরত ও জামা'আত; কারণ যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত সরে গেল সে ইসলামের রজ্জু নিজের গলা থেকে খুলে ফেলল, যদি না ফিরে আসে।"[১৯৩]

এভাবে আমরা দেখছি যে, হাদীসের পরিভাষায় জামা'আত বলতে "রাষ্ট্রীয় ঐক্য" বা মুসলিম সমাজ বা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ঐক্য বুঝানো হয়েছে। তারা যখন কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তখন ব্যক্তিগতভাবে, দলগতভাবে বা গোষ্ঠীগতভাবে সে সিদ্ধান্ত অমান্য করা, নিজের মতের উপর অটল থাকা বা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতের বিরোধিতা করা নিষিদ্ধ।

উপরের হাদীসগুলি মূলত কুরআনের এ বিষয়ক নির্দেশের ব্যাখ্যা। মহান আল্লাহ বলেন:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا

"তোমরা আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ কর ঐক্যবদ্ধভাবে; এবং দলেদলে বিভক্ত হয়ো না।"[১৯৪]

এখানে আল্লাহ 'জামাআত' বা ঐক্যের নির্দেশ দিয়েছেন এবং 'তাফাররুক' বা দলাদলি করতে বা দলে দলে বিভক্ত হতে নিষেধ করেছেন।

জামাআতের সর্বোচ্চ নির্দশন ছিলেন সাহাবীগণ। এছাড়া ধর্মীয় বিষয়ে 'জামাআত' বুঝাতে মুসলিম উম্মাহর আলিম সমাজের সমষ্টি বা ঐক্য বুঝানো হয়েছে বলে মনে করেছেন কোনো কোনো আলিম।[১৯৫]

সর্বাবস্থায় সকলেই 'জামা'আত' বলতে 'সাধারণ জনগোষ্ঠী' বা (society, community) বুঝিয়েছেন, কেউ 'জামা'আত' বলতে 'দল' (group, party) বুঝান নি। আরবীতে "দল" বা সংগঠন বুঝাতে 'ফিরকা', 'হিযব' 'কাওম' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, 'জামা'আত' নয়।

আমরা আগেই বলেছি যে, একটি নির্ধারিত স্থানের সকল মানুষ বুঝাতেও "জামাআত" শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এরূপ সীমিত "জামাআত" বা ঐক্য অর্থে আধুনিক যুগে কখনো কখনো জামাআত বলতে "দলবদ্ধতা" বুঝানো হয়। অর্থাৎ কোনো উদ্দেশ্য সামনে রেখে কতিপয় মানুষের ঐক্য। এরূপ ঐক্য বা "জামাআত"-ও ইসলাম নির্দেশিত। কোনো সফরে বা অন্য কোনো কর্মে বা উদ্দেশ্যে তিনজন মানুষ থাকলে একজনকে আমীর বা নেতা নিযুক্ত করে ঐক্যবদ্ধ থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ।

এ অর্থে দীনী কর্মে ক্ষুদ্র পরিমণ্ডলে মুসলিমগণ "জামাআতবদ্ধ" অর্থাৎ "একই কর্মে রত সকল মানুষ ঐক্যবদ্ধ" থাকতে পারেন; তবে উপরের আয়াত ও হাদীসগুলিতে 'জামাআত' বলতে এ ক্ষুদ্র ঐক্য বা "দল" বুঝানো হয় নি; মুসলিমদের সামগ্রিক ঐক্য বুঝানো হয়েছে। কাজেই এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলভুক্ত হওয়াকে ইসলাম পালনের অংশ মনে করার অর্থ ইবাদত পালনের জন্য

রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বিষয়কে শর্ত করেন নি তাকে যুক্তি দিয়ে শর্ত বানিয়ে নেওয়া। উপরন্তু এরূপ ধারণার দ্বারা ইসলাম নিষিদ্ধ "দলাদলি", "বিভক্তি" বা "বিচ্ছিন্নতা" একটি ইসলামী ইবাদত বলে পরিগণিত হবে!

দীন পালন ও দীনী দাওয়াতে সামষ্টিক প্রচেষ্টা অধিকতর ফলদায়ক। ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়ের নিষেধ, দীন প্রতিষ্ঠা বা আল্লাহর পথে দাওয়াতের জন্য এরূপ ক্ষুদ্রতর বা আংশিক "জামাআত" (ঐক্য) একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারী উপকরন। কিন্তু দাওয়াতের জন্য "জামাআত" শরীয়ত-নির্দেশিত কোনো জরুরী বিষয় নয়। 'সালাতের' ক্ষেত্রে ফরয সালাত একাকী পালন করলে সাওয়াব কম হবে বা গোনাহ হবে বলে সুন্নাত থেকে আমরা জানতে পারি। কিন্তু 'দাওয়াতের' ক্ষেত্রে এ ইবাদত একাকী পালন করলে সাওয়াব কম হবে বা গোনাহ হবে বলে আমরা মনে করতে পারি না।

এরূপ মনে করলে তা সুন্নাতের ব্যতিক্রম এবং বিদআতে পরিণত হবে। যেমন অধিক উপকার বা অনুরূপ কোনো যুক্তি দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত, দরুদ-সালাম, যিকর ইত্যাদি ইবাদত পালনের জন্য 'জামাআত' বা দলবদ্ধতা, দণ্ডায়মান হওয়া, চিৎকার করা ইত্যাদিকে উক্ত ইবাদতের অংশ মনে করা বা এ সকল ইবাদত একাকী পালন করলে, বসে পালন করলে বা মৃদু শব্দে পালন করলে সাওয়াব কম হবে বলে মনে করা।

'জামা'আতুল মুসলিমীন'-এর বিভ্রান্তির কারণ হলো তারা 'জামা'আত' বিষয়ক প্রচলিত সংকীর্ণ অর্থকে ইসলামী পারিভাষিক অর্থ বলে দাবি করেন। এরপর সুন্নাতের নির্দেশনা ছাড়াই বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে দীন পালন ও দীন প্রতিষ্ঠার জন্য "দলবদ্ধতা" শর্ত বলে গণ্য করেন। 'জামাআত' বিষয়ক উপরের হাদীসগুলির আলোকে তারা দাবি করেন যে, দলের মধ্যে থাকা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কারণ দল বা জামা'আত পরিত্যাগ করাকে জাহিলিয়্যাত বলা হয়েছে, আর জাহিলিয়্যাত অর্থই কুফরী। এছাড়া জামা'আত পরিত্যাগ করাকে ইসলামের রজ্জু খুলে ফেলা বলে অভিহিত করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় 'জামা'আত' ত্যাগকারী কাফির বলে গন্য হবে।

উপরের আয়াত ও হাদীসগুলির নির্দেশনা হলো, মুমিনগণ দলাদলি করবেন না। ইসলামের মধ্যে কোনো দলাদলি থাকবে না; বরং সকল মুসলিম ঐক্যবদ্ধ থাকবেন। অন্তত মুমিন সকল মুমিনকে একদল বলে বিশ্বাস করবেন। দল, মত, বর্ণ, দেশ, কর্ম, মাযহাব ইত্যাদির পার্থক্যের কারণে এক মুসলিম আরেক মুসলিমকে "অন্যদল" বলে মনে করবেন না; বরং এগুলি-সহ সকল মুসলিমকে একদল বলে বিশ্বাস করবেন। কিন্তু এ কথার ব্যাখ্যায় জামাআতুল মুজাহিদীন নেতৃবৃন্দ বলেন, "মুসলিম হতে হলে কোনো না কোনো দলে থাকতে হবে!" অর্থাৎ দলাদলি করতেই হবে! এ হলো কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ।

এ ভুল অর্থের ভিত্তিতে তারা দাবী করেন যে, ইসলাম পালনের জন্য কোনো না কোনো দলের মধ্যে থাকতে হবে। আর যেহেতু একমাত্র তারাই দীন প্রতিষ্ঠা ও দীনের বিজয়ের জন্য চেষ্টা করছেন সেহেতু তাদের দলই একমাত্র সঠিক দল। যারা তাদের বিরোধিতা করেন তারা মূলত দীন প্রতিষ্ঠা ও দীনের বিজয় চাচ্ছেন না। এজন্য তারাও কাফির।

জামা'আতের পাশাপাশি তারা 'বাইআত'-কেও ঈমানের অংশ বলে গণ্য করেন, কারণ বাইয়াত পরিত্যাগ করাকে জাহিলিয়্যাত বলা হয়েছে। তারা বলেন দলের আমীরের হাতে বাইয়াতই হলো দলভূক্তির একমাত্র পথ। যে ব্যক্তি তাদের দলের আমীরের হাতে বাইয়াত করে তাদের দলে যোগদান করবে শুধু তারাই মুসলিম বলে গণ্য হবে। যারা এভাবে তাদের দলভুক্ত হতে অস্বীকার করবে তারা কাফির বলে গণ্য হবে। উপরের আলোচনা থেকে এ সকল বিষয়ের বিভ্রান্তি আমরা বুঝতে পেরেছি।

বস্তুত মুসলিমকে বা যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করছে তাকে কোনো কর্ম, দ্ব্যর্থবোধক কথা, অপছন্দনীয় বিশ্বাস, আকীদা বা মতবাদের কারণে কাফির বলে গণ্য করার প্রবণতা মুসলিম উম্মাতের জন্য সর্বদা বেদনা ও ক্ষতি বয়ে এনেছে। এ থেকে উম্মতের মধ্যে দলাদলি, মারামারি, সংঘর্ষ, সংঘাত ও সন্ত্রাসের জন্ম হয়েছে।

সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারী উম্মাতের মূলধারার আলিমগণ ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। পাপের কারণে তো নয়ই, এমনকি ইসলামী বিশ্বাসের সাথে আংশিক বা বাহ্যিক সাংঘর্ষিক মতবাদ, বিশ্বাস বা আকীদার কারণেও তারা ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলতেন না। তার কোনো ব্যাখ্যা বা ওজর আছে কিনা তা সন্ধান করতেন এবং ঈমানের বিষয়ে তার মুখের দাবির উপরেই নির্ভর করতেন। এজন্য খারিজী, শিয়া, মুতাযিলী, কাদারীয়া, জাবারিয়া ইত্যাদি বিভ্রান্ত বিশ্বাস বা মতবাদের অনুসারীরা কুরআনের অনেক আয়াত ও ইসলামী অনেক বিশ্বাস অস্বীকার করলেও তাদেরকে কাফির না বলে বিভ্রান্ত বা ভ্রান্তিতে নিপতিত মুসলিম বলে গণ্য করেছেন। আমি **"কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা"** গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্ত ারিত আলোচনা করেছি। সম্মানিত পাঠককে বইটি পড়তে অনুরোধ করছি।

৩. ৯. ইসলামী রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

৩. ৯. ১. ইসলাম ও রাষ্ট্র

ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বকে নিয়ে ইসলাম একটি সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা। তবে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাভাবিক পার্থক্য রক্ষা করা হয়েছে ইসলামে। রাষ্ট্র-ব্যবস্থাসহ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ছাড়া সকল দেশের সকল সমাজের মানুষদের জন্য পালনীয় প্রশস্ততা রয়েছে ইসলামে। রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে মুমিনের ধর্ম পালনের জন্য শর্ত বা মূল বিষয় বলে গণ্য করা হয় নি। রাষ্ট্র ব্যবস্থা ইসলামের একটি অংশ। ইসলামে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান আছে। তবে ইসলাম শুধু রাষ্ট্র ব্যবস্থার নাম নয়।

মুমিন আরকানে ইসলাম ও অন্যান্য ফরয, নফল ইবাদত সাধ্যমত পরিপূর্ণভাবে পালনের মাধ্যমে নিজের জীবনে পূর্ণতমভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবেন। কোনো মুসলিম কোনো রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে থাকলে তিনি তার দায়িত্ব আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে পালন করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন। এক্ষেত্রে তার নিজ জীবনের অন্যান্য কর্মের মত রাষ্ট্রীয় কর্ম আল্লাহর হুকুম মত পালন করা তার

দায়িত্ব। অন্যান্য মুসলিমের দায়িত্ব রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যক্তি বা পরিবারের সকল ক্ষেত্রে সবাইকে আল্লাহর হুকুম পালন করার জন্য দাওয়াত দেওয়া। যে কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের (ﷺ) নির্দেশ লঙ্ঘিত হলে সুযোগ ও সাধ্যমত কুরআন নির্দেশিত উত্তম আচরণ দ্বারা খারাপ আচরণের প্রতিরোধ পদ্ধতিতে দাওয়াত, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের মাধ্যমে তা সংশোধন ও পরিবর্তনের চেষ্টা করবেন। তবে এ চেষ্টা সফল না হলে মুমিনের দ্বীন-পালন ব্যাহত হয় বা সমাজ ও রাষ্ট্রের পাপের কারণে ব্যক্তি মুমিন পাপী হন এরূপ চিন্তার কোনো ভিত্তি নেই।

৩. ৯. ২. ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃতি

ইসলাম সর্বকালের ও সর্বযুগগের সমগ্র মানব জাতির জন্য স্থায়ী জীবন ব্যবস্থা এবং বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন ধর্ম। কুরআন কারীম, হাদীসে রাসূল ﷺ ও সাহাবীগণের জীবনপদ্ধতি থেকে আমরা দেখতে পাই যে, এতে দু'টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে: একদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে যেন যুগ, সমাজ, সামাজিক রুচি ও আচার আচরণের পরিবর্তনের ফলে ইসলামের ধর্মীয় রূপে পরিবর্তন না আসে। অপর দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, যুগ, সমাজ, আচার-আচরণ ইত্যাদির পরিবর্তনের কারণে ইসলামের আহকাম পালনে যেন কারো কোনো অসুবিধা না হয়। সকল যুগের সকল দেশের মানুষেরা যেন সহজেই জীবন ধর্ম ইসলাম পালন করতে পারে।

এ মূলনীতির ভিত্তিতে ইসলামে মানব জীবনের কর্মকাণ্ডকে মূল দুভাগে ভাগ করা হয়েছে: (১) ইবাদাত ও (২) মুআমালাত। মানুষকে জীবন ধারণ করতে জাগতিক ও জৈবিক প্রয়োজনে যা করতে হয় এবং বিশ্বাসী-অবিশ্বাস ও ধার্মিক-অধার্মিক সকলেই যা করেন তা মুআমালাত বা জাগতিক কর্ম বলে গণ্য। আর জাগতিক প্রয়োজনের উর্দ্ধে শুধু মহান স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্য মানুষ যে কর্ম করে তা ইবাদত বলে গণ্য।

ইবাদত ও মুআমালাতের পার্থক্য বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমার লেখা **"এহইয়াউস সুনান"** গ্রন্থটি পাঠ করতে পাঠককে অনুরোধ করছি। এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, ইবাদতের ক্ষেত্রে ইসলামে বিস্তারিত ও খুটিনাটি নিয়ম-পদ্ধতি ও বিধিবিধান প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কর্ম যেভাবে করেছেন অবিকল সেভাবে করার বিশেষ তাকিদ দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে মুআমালাত বা জাগতিক কর্মের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রশস্ততা দেওয়া হয়েছে। কিছু মূলনীতি প্রদান করা হয়েছে এবং ফরয ও হারাম নির্ধারণ করা হয়েছে। এর বাইরে সবই বৈধ বলে গণ্য হবে। মুআমালাতের ক্ষেত্রে কোনো বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তা বৈধ বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেন নি তা করা নিষিদ্ধ। আর মুআমালাতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা নিষেধ করেছেন শুধু তাই নিষিদ্ধ, যা তিনি নিষেধ করেন নি তা বৈধ।

চাষাবাদ, চিকিৎসা, বাড়িঘর তৈরি ইত্যাদি জাগতিক বিষয়ে যেমন প্রশস্ততা প্রদান করা হয়েছে, তেমনি প্রশস্ততা প্রদান করা হয়েছে ইবাদত পালনের জাগতিক উপকরণের ক্ষেত্রে। যেমন ইলম শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তবে শিক্ষার পদ্ধতি, উপকরণ ইত্যাদির বিষয় উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। কেউ বলতে পারেন না যে, সাহাবীগণের যুগে ছাপানো বই ছিল না, পরীক্ষা পদ্ধতি ছিল না বা সনদ প্রদানের পদ্ধতি ছিল না কাজেই তা নিষিদ্ধ। বরং যতক্ষণ না শরীয়তে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যাবে ততক্ষণ তা বৈধ।

বিবাহ, পরিবারগঠন, আবাসন, চিকিৎসা ইত্যাদির মত রাষ্ট্রগঠন, রাষ্ট্রপরিচালনা ও এ বিষয়ক দায়িত্বাবলি "মুআমালাত"। এজন্য ইসলামে এ বিষয়ে মৌলিক নীতিমালার মধ্যে প্রশস্ততা প্রদান করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর খুটিনাটি বিষয়ে দেশ, যুগ, জাতি ও পরিবেশের আলোকে ভিন্নতার অবকাশ রাখা হয়েছে।

এ সকল মূলনীতির আলোকে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃতি আলোচনার জন্য পৃথক গ্রন্থের প্রয়োজন। এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্র "থিওক্র্যটিক" বা পুরোহিত-তান্ত্রিক নয়, বরং জনগণতান্ত্রিক। এখানে মোল্লা, পুরোহিত, ইমাম বা অন্য কোনো ধর্মীয় নেতাকে "আল্লাহর নামে" বা "আল্লাহর খলীফা" হয়ে শাসন করার ক্ষমতা বা সুযোগ দেওয়া হয় নি। ইসলামে কখনোই শাসককে "আল্লাহর খলীফা" হিসেবে গণ্য করা হয় নি, তাকে বিশেষ অধিকার, ক্ষমতা বা অভ্রান্ততা প্রদান করা হয় নি বা তাকে জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে রাখা হয় নি। বরং শাসককে জনগণের প্রতিনিধি ও জনগণের কাছে জবাবাদিহী বলে গণ্য করা হয়েছে।

কেবলমাত্র 'শীয়া' সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসে ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে রাজতান্ত্রিক ও পুরোহিততান্ত্রিক বলে দাবি করা হয়েছে। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, ইসলামের রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব বা রাষ্ট্রক্ষমতা আলী (রা)-এর বংশধরদের পাওনা। আর "রাষ্ট্রীয় নেতা" বা ইমাম আল্লাহর খলীফা হিসেবে বিশেষ জ্ঞান, ক্ষমতা ও অধিকার সংরক্ষণ করেন। রাষ্ট্রীয় বিষয়ে তাঁর মতামতই চূড়ান্ত। তাঁর অনুপস্থিতি বা অদৃশ্য থাকা অবস্থায় "ফকীহ" তাঁর প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনার আলোকে সাহাবীগণ ও পরবর্তী মূলধারার মুসলিম আলিমগণ এ মত প্রত্যাখ্যান করেছেন। বস্তুত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের সময়ে পৃথিবীতে বিদ্যমান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মূল তিনটি বিষয় দেখা যায়:

প্রথমত: রাষ্ট্রক্ষমতার উৎস বংশ বা জবরদখল

রাজবংশের কেউ রাজা হবে এটাই ছিল সর্বজনস্বীকৃত রীতি। রাজতন্ত্রের বাইরে ক্ষমতা গ্রহণের একমাত্র উৎস ছিল অস্ত্র বা জবরদখল। রাজাকে হত্যা করে বা অস্ত্রের ক্ষমতায় রাজদণ্ড গ্রহণ করা।

দ্বিতীয়ত: রাষ্ট্রের মালিকানা বা সার্বভৌমত্ব রাজার

রাজ্যের সকল সম্পদ ও নাগরিক রাজার মালিকানাধীন। তিনি সকল জবাবাদিহিতার ঊধ্বে। রাষ্ট্রের সম্পদ ও নাগরিকদের বিষয়ে তিনি ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাখেন এবং তার সিদ্ধান্ত প্রশ্নাতীত।

এরূপ সর্বোচ্চ ক্ষমতা বুঝাতে ইংরেজিতে (sovereignty) শব্দটি ব্যবহার করা হয়। শব্দটি প্রাচীন ফরাসী souverein,

ল্যাটিন superanus/ super শব্দ থেকে এসেছে। এর মূল অর্থ (above) বা উর্ধে। যেহেতু রাজার ক্ষমতা সকলের উর্ধ্বে সেহেতু রাজাকে ইংরেজিত sovereign বলা হয়। ইংরেজীতে sovereign অর্থই king বা রাজা। আরবী অভিধানেও sovereign অর্থ ملك (রাজা)। (sovereignty) অর্থ বাংলায় রাজত্ব এবং আরবীতে মুলক (المُلْك) বা সিয়াদাত (السيادة) অর্থাৎ রাজত্ব বা কর্তৃত্ব।

বাংলায় এর প্রতিশব্দ হিসেবে "সার্বভৌমত্ব" শব্দটি ব্যবহার করা হয়। বাংলা এ শব্দটি "সর্বভূমি" থেকে গৃহীত। এর অর্থ 'বিশ্বজনীন' বা universal হওয়া উচিত। ইংরেজি (sovereign) বা সর্বোচ্চ শব্দের মূল অর্থের সাথে বাংলা সর্বভূম বা বিশ্বজনিন শব্দের মূল অর্থের মিল নেই। তবে প্রাচীন যুগে "সারা বিশ্বে পরিচিত" অর্থে শাসক বা বড় পণ্ডিতকে "সার্বভৌম" উপাধি দেওয়া হতো। এভাবে রাজাকে "সার্বভৌম" বলার প্রচলন ঘটে। আর এথেকেই রাজত্বকে সার্বভৌমত্ব বলা হয়।

তৃতীয়তঃ রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি বা প্রতিভূ

প্রায় সকল সমাজেই রাজাকে কোনো না কোনোভাবে ঈশ্বরের পুত্র, প্রতিনিধি বা বংশধর বলে কল্পনা করে তাকে ঐশ্বরিক বা ধর্মীয় পবিত্রতা, অধিকার ও অভ্রান্ততা (infalliblity) প্রদান করা হয়েছে। বিশেষত খৃস্টীয় চতুর্থ শতকের শুরুতে বাইযান্টাইন-রোমান সাম্রাজ্যে খৃস্টধর্মকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা প্রদানের পর থেকে ইউরোপে থিওক্র্যাটিক শাসনের শুরু হয় এবং ধর্মের নামে বা আল্লাহর নামে শাসক ও পুরোহিতদেরকে আল্লাহর প্রতিনিধি ও প্রতিভু হিসেবে বিশেষ পবিত্রতা প্রদান করা হয়। তাদের নির্দেশ আক্ষরিক পালন করা ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করা হয় এবং তাদের নির্দেশ অমান্য করা ধর্মদ্রোহিতা বলে গণ্য হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ রাষ্ট্রের বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মূলনীতি প্রদান করেন। তাঁর দেওয়া মূলনীতির প্রধান দিকগুলি নিম্নরূপ:

প্রথমতঃ রাষ্ট্রক্ষমতার উৎস নাগরিকদের পরার্মশ

কুরআন কারীমে এবং হাদীস শরীফে মুমিন জীবনের সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ মূলনীতি হাতে-কলমে শেখানোর জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ কাউকে তাঁর পরে রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য মানোনয়ন দেওয়া থেকে বিরত থাকেন, যেন মুসলিমগণ পরামর্শ ব্যবস্থার বাস্তব প্রয়োগ করতে পারেন।

মহান আল্লাহ মুমিনদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

"যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে, সালাত কায়েম করেছে, তাদের কর্ম তাদের মধ্যে পারস্পরিক পরামর্শভিত্তিক এবং তাদেরকে যা রিযকপ্রদান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।"[১৯৬]

তাহলে, মুমিনদের সকল কর্ম তাদের সকলের পরামর্শভিত্তিক। যে বিষয়ে আল্লাহর সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশনা নেই এরূপ সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের পরামর্শ গ্রহণই মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট্য। আর এরূপ বিষয়ের অন্যতম রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি, যা সকল নাগরিকের স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট। শাসক, প্রশাসক, সরকার বা জনপ্রতিনিধি নির্বাচন, নির্বাচনের মেয়াদ, সরকার পরিচালনা পদ্ধতি, এ বিষয়ক নীতি নির্ধারণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা যে সংশ্লিষ্ট সকলেই পরামর্শ প্রদান করবেন। নারী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সাধারণ-অসাধারণ সকলের পরামর্শ গ্রহণ এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। কাউকে বাদ দেওয়ার কোনোরূপ নির্দেশনা নেই। যদি কেউ পরামর্শ দেন ও অন্যরা মেনে নেন তাহলেও অসুবিধা নেই।

কুরআন-হাদীসে সংশ্লিষ্ট সকলের পরামর্শ গ্রহণের তাকিদ দেওয়া হয়েছে, তবে পরামর্শ গ্রহণের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেওয়া হয় নি। বরং অন্যান্য জাগতিক ও উপকরণ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির মত এ বিষয়কে যুগ, জাতি ও পরিবেশের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মানুষদের অবস্থা অনুসারে সরাসারি সকল নাগরিকের, তাদের প্রতিনিধিদের, গোত্রপতিদের, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের বা সামাজিক নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে। এরূপ পরামর্শ গ্রহণ মুখে হতে পারে বা গোপন ব্যালটে হতে পারে। এক্ষেত্রে পরামর্শ গ্রহণের কোনো একটি পদ্ধতিকে ইসলামী বা ইসলাম বিরোধী বলে গণ্য করার কোনো সুযোগ নেই।

সাহাবীগণের যুগে বা পরবর্তী যুগে ছিল না বলে বা প্রাচীন ফিকহের গ্রন্থে লেখা নেই বলে সার্বজনীন ভোট ব্যবস্থা, ৪ বা ৫ বৎসর পরে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা বা পরামর্শ গ্রহণের অনুরূপ কোনো পদ্ধতিকে ইসলাম বিরোধী বলে চিন্তা করা আর মাদ্রাসায় পরীক্ষা ব্যবস্থা, সনদ প্রদানের ব্যবস্থা, ছাপানো বই পড়ার ব্যবস্থা বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার ইসলাম বিরোধী বা নিষিদ্ধ বলে চিন্তা করা একই ধরনের অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তি।

দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রের মালিকান জনগণের

মালিকানা দু প্রকারের। সকল কিছুর প্রকৃত মালিকানা মহান আল্লাহর। তিনিই মালিক, রাজা বা sovereign। পাশাপাশি জাগতিকভাবে মানুষকে দুনিয়াতে তার সম্পদের মালিকানা প্রদান করা হয়েছে এবং মালিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এভাবে রাষ্ট্রের মালিকানা জনগণের।

আমরা দেখেছি যে, প্রাচীন ব্যবস্থায় রাজা ছিলেন sovereign বা সার্বভৌম। রাজ্যের সকল সম্পদ ও নাগরিকের সর্বোচ্চ বা

প্রশ্নাতীত মালিকানা (sovereignty) ছিল তার একার। তিনি নিজের প্রয়োজন, সুবিধা ও ইচ্ছামত তা ব্যবহার করবেন, এতে কারো কোনো আপত্তি বা প্রশ্ন করার অধিকার ছিল না। পক্ষান্তরে ইসলামে রাষ্ট্রের মালিকান নাগরিকগণের। নিজের মালিকানাধীন জমিন যেমন মুমিন আল্লাহর নির্দেশের আওতায় নিজের প্রয়োজন, সুবিধা ও ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারেন, তেমনি রাষ্ট্রের জনগণ রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা ও সম্পদ আল্লাহর নির্দেশের আওতায় থেকে নিজেদের প্রয়োজন ও সুবিধা অনুসারে ব্যবহার করবেন।

নিজের মালিকানাধীন সম্পদ, অর্থ ও অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় রাষ্ট্রের বিষয়াবলিও আল্লাহর নির্দেশ মত পরিচালনা করার বিষয়ে জনগণ দায়বদ্ধ। এ দায় পালনের জন্য শাসক তাদের প্রতিনিধি এবং তাদের কাছে জবাবদিহী। শাসক রাষ্ট্রের মালিক নন, বরং জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালন করেন। তিনি জনগণের কাছে জবাবাদিহী। জনগণ তাকে যে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারে, শাসন ও সংশোধন করতে পারে।

এজন্যই শাসক বা সরকার নির্বাচনে জনগণের পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশনা। জনগণের মধ্য থেকে তাদের পরামর্শে সরকার নির্বাচিত হবেন। আর তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য তারা জনগণের কাছে জবাবদিহী থাকবেন।

তৃতীয়ত: শাসকের কোনো অভ্রান্ততা বা পবিত্রতা নেই

ইসলামের দৃষ্টিতে শাসক কখনোই আল্লাহর খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত (successor/vicar) নন। অন্য সকল মানুষের মতই তিনি আল্লাহর বিধান ও ব্যবস্থার অধীন। মহান আল্লাহ রাষ্ট্র পরিচালনা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য যে মূলনীতি প্রদান করেছেন তা পালন করতে তিনি বাধ্য।

রাষ্ট্রপরিচালনা বিষয়ে ইসলাম কিছু মূলনীতি দিয়েছে, যেগুলির মধ্যে রয়েছে জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকলের মৌলিক নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করা, জীবন, জীবিকা, ধর্ম, বাসস্থান ও পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, জনগণের পরামর্শ গ্রহণ করা, বৈষম্যহীন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, অপরাধীর সঠিক শাস্তি নিশ্চিত করা ইত্যাদি। বিচার ও শাস্তির ক্ষেত্রে ইসলামে কিছু শাস্তি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, যেগুলি সমাজের অপরাধ দমন করে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করে। অন্যান্য অপরাধে শাসক, সরকার বা প্রশাসন প্রয়োজনীয় যুগোপযোগী শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।

এ সকল মূলনীতি ও বিধিবিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে এবং ইসলামের নির্দেশনার ব্যাখ্যা প্রদানে শাসকের নিজস্ব কোনো পবিত্রতা বা অভ্রান্ততা নেই। জনগণের শাসনে, নির্দেশ দানে বা আল্লাহর বিধানের ব্যাখ্যায় তাঁর নিজের মতের কোনো বিশেষ মূল্য নেই। তার ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত ভুল বলে মনে হলে যে কেউ তার সমালোচনা এবং ভুল সংশোধন করতে পারেন।

অন্যান্য মুআমালাতের ন্যায় রাষ্ট্রনীতি ও আইন-বিচারের ক্ষেত্রে ইসলামে মূলনীতি দেওয়া হয়েছে এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে প্রশস্ততা প্রদান করা হয়েছে। কয়েকটি অপরাধের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু শাস্তি প্রদানের প্রক্রিয়া কঠিন করা হয়েছে। নীতি, বিধান ইত্যাদির ব্যাখ্যা ও প্রয়োগে কারো অভ্রান্ততা দেওয়া হয় নি। এজন্য মুসলিম দেশগুলিতে কখনোই ইউরোপের মত স্বৈরাচার বা থিওক্র্যাসি প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় আলিমগণ কখনো ধর্মের নামে ক্ষমতা গ্রহণ করেন নি। আলিমগণ কুরআন-হাদীসের নীতিমালা ব্যাখ্যা করেছেন আর শাসকগণ প্রয়োগ করেছেন। উভয় বিভাগেরই স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা ছিল। ব্যাখ্যায় ভুল হয়েছে বলে মনে হলে শাসকগণ তা প্রত্যাখ্যান করেছেন ও সকল আলিমের পরামর্শ নিয়েছেন। প্রয়োগে ও বাস্তবায়নে ভুল হয়েছে মনে করলে জনগণ ও আলিমগণ প্রতিবাদ করেছেন। সকল স্বৈরাচারের মধ্যেও শাসকের সমালোচনা, কম বেশি বাকস্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, গবেষনা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত ছিল। কখনোই কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে ধর্মের নামে ভিন্নমতাবলম্বী বা ভিন্নধর্মীয়দের উপর নিয়মতান্ত্রিক বা রাষ্ট্রীয় নির্যাতন করা হয় নি। খৃস্টীয় অষ্টম শতক থেকে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতক পর্যন্ত ইউরোপ, ভারত, মধ্যপ্রাচ্য ও বিশ্বের যে কোনো অমুসলিম দেশের সাথে সে যুগের মুসলিম দেশগুলির অবস্থা তুলনা করলে যে কোনো গবেষক নিশ্চিত হবেন যে, মুসলিম দেশগুলিতে সকল ধর্মের মানুষ সর্বোচ্চ নাগরিক অধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করেছেন।

৩. ৯. ৩. ইসলাম ও "তন্ত্র"

"তন্ত্র" বা cracy একটি আধুনিক পরিভাষা। বাংলায় "তন্ত্র" শব্দটির অনেক অর্থ রয়েছে, যেমন, শাস্ত্র, বিদ্যা, প্রাধান্য, রাজ্যশাসন পদ্ধতি ইত্যাদি। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য হলো "রাজ্যশাসন পদ্ধতি", যা ইংরেজি (cracy) শব্দের অনুবাদ হিসেবে ব্যবহৃত। ইংরেজি (cracy) শব্দটি গ্রীক (kratos) শব্দ থেকে আগত, যার অর্থ (power, strength, rule) ক্ষমতা, শক্তি, শাসন ইত্যাদি।

বিশ্বের অতীত ও বর্তমান বিভিন্ন "রাজ্যশাসন পদ্ধতি" পর্যালোচনা করলে আমরা বলতে পারি যে, রাজ্যশাসন পদ্ধতি মূলত দূ প্রকারের হতে পারে: (১) জনগণের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এবং (২) শাসকের একচ্ছত্র ক্ষমতার ভিত্তিতে। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে শাসকের একচ্ছত্র অধিকার ও ক্ষমতার উৎস তার বংশ বা দখল হতে পারে বা "ঐশ্বরিক" হতে পারে। শাসক নিজের বংশ বা দখলের অধিকারে রাষ্ট্রের সকল কিছুর মালিকানা দাবি করবেন অথবা নিজেকে "ঈশ্বরের" প্রতিনিধি হিসেবে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবি করবেন।

আধুনিক পরিভাষায় "রাজ্যশাসনের" প্রথম পদ্ধতি "গণতন্ত্র" (Democracy) এবং দ্বিতীয় পদ্ধতি "স্বৈরতন্ত্র" (Autocracy) নামে পরিচিত। আর যদি শাসক বা শাসকগোষ্ঠী তাদের ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব বা ধর্মীয় অভ্রান্ততা দাবি করেন তাহলে তা "পুরোহিততন্ত্র", "যাজকতন্ত্র" বা (Theocracy) নামে পরিচিত। এখন প্রশ্ন হলো, ইসলামের উপর্যুক্ত "রাজ্যশাসন

পদ্ধতি"-কে আমরা কোন্ প্রকারের বলে গণ্য করব?

আমরা অনেক সময় বলি যে, ইসলাম ইসলামই, একে কোনো তন্ত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। কথাটির মধ্যে সত্যতা রয়েছে। তবে যে ব্যক্তি ইসলামকে ভালভাবে জানেন না, তাকে ইসলামের বিষয় বুঝাতে হলে তাঁর ভাষায় বা পরিভাষায় অনুবাদ করেই তাঁকে বুঝাতে হবে। এছাড়া ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ধর্ম, যার মধ্যে, বিশ্বাস, কর্ম, আচার আচরণ, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সকল বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। "ইসলাম" বললে এগুলির সমষ্টি বুঝায়। রাজ্যশাসন পদ্ধতি বিষয়ে ইসলামের দিক নির্দেশনার সমষ্টিকে আমরা সহজবোধ্যভাবে কী বলতে পারি? ইসলামের রাজ্যশাসন পদ্ধতি কি গণতন্ত্র? না স্বৈরতন্ত্র? না পুরোহিততন্ত্র? অন্তত এর কোন্‌টির সবচেয়ে নিকটবর্তী?

উপরের আলোচনা থেকে আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি যে, ইসলামের রাজ্যশাসন পদ্ধতি "গণতান্ত্রিক"। কিন্তু ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণে পাশ্চাত্য গবেষকগণ একে (Theocracy) বলে উল্লেখ করেছেন। Theocracy শব্দটি গ্রীক (theokratia) থেকে আগত। এর অর্থ (government by a god) বা একজন দেবতার সরকার। এ ব্যবস্থায় দেবতা, ঈশ্বর বা মহান স্রষ্টাকে একচ্ছত্র ক্ষমতা ও সর্বোচ্চ মালিকানার অধিকারী (sole sovereign) এবং সকল আইনকে ঈশ্বরের নির্দেশ বলে গণ্য করা হয়। স্বভাবতই দেবতা বা ঈশ্বর নিজে শাসন করেন না। কাজেই ঈশ্বরের নামে পুরোহিতগণ বা রাজাই শাসন পরিচালনা করেন। তবে তারা নিজেদেরকে "ঈশ্বরের প্রতিনিধি" বলে দাবি করেন এবং তাদের আদেশ নিষেধকে অলঙ্ঘনীয় ঐশ্বরিক নির্দেশ বলে গণ্য করেন।

ইসলামে আল্লাহকে সর্বোচ্চ মালিকানার অধিকারী (sovereign) বলে বিশ্বাস করা হয়। তিনিই হুকুম, নির্দেশ বা বিধান প্রদানের অধিকারী। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, ইসলামী শাসনব্যবস্থা থিওক্রাটিক। থিওক্র্যাসির সাথে ইসলামের মৌলিক পার্থক্য হলো, থিওক্র্যাসিতে রাজা বা পুরোহিতগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তারা ধর্মের নামে বা ঈশ্বরের নামে যে ব্যাখ্যা, আইন বা বিধান প্রদান করবেন তা মান্য করা জনগণের "ধর্মীয়" দায়িত্ব এবং অমান্য করা "ধর্মদ্রোহিতা"। থিওক্রাসী হলো ঈশ্বরের বা ধর্মের নামে স্বৈরতন্ত্র।

থিওক্র্যাসির মূল প্রেরণা বর্ণনা করে রাজা প্রথম জেমস (১৫৬৬-১৬২৫) বলেন: "The state of monarchy is the supremest thing upon earth: for kings are not only god's lieutenants upon earth, and sit upon God's throne, but even by God himself they are called gods." "রাজার অবস্থানই পৃথিবীর উপরে সর্বোচ্চ বিষয়। কারণ, রাজাগণ পৃথিবীর বুকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং ঈশ্বরের সিংহাসনে আসীন। শুধু তাই নয়, সর্বোপরি স্বয়ং ঈশ্বর তাদেরকে ঈশ্বর বলে আখ্যায়িত করেছেন।" (মাইক্রোসফট এনকার্টা)

পক্ষান্তরে ইসলামে আল্লাহর নির্দেশ, হুকুম বা বিধান সকল মানুষের জন্য উন্মুক্তভাবে প্রদান করেছেন। "রাজ্যশাসন" বিষয়েও আল্লাহ মূলনীতি প্রদান করেছেন। এগুলি সবার জন্য উন্মুক্ত। এগুলি হলো সবার জন্য পালনীয় সংবিধানের মৌলিক নীতিমালার মত। এর প্রয়োগে, ব্যাখ্যায় বা আইন প্রণয়নে রাজা বা যাজকগণের কোনোরূপ বিশেষত্ব নেই। বরং রাজ্যশাসন বিষয়ক ইসলামের নীতিমালা 'লিখিত সংবিধানের' মত স্বৈরতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও জনগণের অধিকার রক্ষার অন্যতম মাধ্যম।

গণতন্ত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখব যে, গণতন্ত্র অর্থ নির্ধারিত কোনো সরকার ব্যবস্থা নয়। রাজ্যশাসন ব্যবস্থায় যে কোনোভাবে জনগণের অংশীদারিত্ব, পরামর্শগ্রহণ ও জনগণের নিকট জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকলেই তাকে "গণতন্ত্র" বলা যায়। এ অর্থে মূলত ইসলামই সর্বপ্রথম একটি "গণতান্ত্রিক" রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রদান করে। ইসলামের আগে গ্রীসে ও রোমে গণতন্ত্রের কিছু চর্চা হয়। এরপর তা বিলীন হয়ে যায় এবং বিশ্বের সর্বত্র রাজতান্ত্রিক বা যাজকতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম পরামর্শভিত্তিক প্রতিনিধিত্বমূলক "গণতান্ত্রিক" ব্যবস্থা প্রদান করেন।

জনগণতান্ত্রিক এ নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন তৎকালীন প্রেক্ষাপটে কষ্টকর ছিল। খিলাফতে রাশেদার পরেই এর থেকে কমবেশি বিচ্যুতি শুরু হয়। তবে ইসলামের ইতিহাসের যে কোনো যুগের স্বৈরাচারী শাসকদের সাথে সে সময়ের ইউরোপের চার্চ ও খৃস্টান শাসকদের অবস্থা তুলনা করলে যে কোনো গবেষক নিশ্চিত হবেন যে, এ মূলনীতির প্রভাব সর্বদা বিদ্যমান ছিল।

৩. ৯. ৪. ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী আইন-বিচার

ইসলামের অপরাধ আইন (criminial law) সম্পর্কে ভয়ঙ্কর বিভ্রান্তি ও অপপ্রচার পাশ্চাত্যে ও মুসলিম সমাজগুলিতে বিদ্যমান। ইসলামী অপরাধ আইনের কিছু বিষয়কে আংশিকভাবে উপস্থাপন করে এগুলির ভিত্তিতে ইসলামী আইন, বিচার ও বিচারব্যবস্থাকে বর্বর, মধ্যযুগীয় এবং পুরোহিততান্ত্রিক বলে অপপ্রচার করা হয়। আবার অনেক আবেগী মুসলিম ইসলামী অপরাধ আইনের কয়েকটি দিককেই "ইসলামী আইন", এগুলির অনুপস্থিতিকে ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এবং এগুলি প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামী রাষ্ট্রের একামত্র পরিচয় বলে মনে করেন।

যে কোনো রাষ্ট্রের মূল দায়িত্ব (১) নাগরিকদের বৈষম্যহীন অধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা (২) বহিশক্রর আগ্রাসন থেকে রাষ্ট্র ও নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ইসলামেও এ দুটি বিষয়কে রাষ্ট্রের মূল দায়িত্বগুলির অন্যতম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় দায়িত্ব পালনের জন্য ইসলামে "জিহাদ"-এর বিধান প্রদান করা হয়েছে। আর প্রথম দায়িত্ব পালনের জন্য ইসলামে আইন ও বিচারব্যবস্থা বিষয়ক নীতিমালা প্রদান করা হয়েছে।

ইসলামী আইন ও আইন প্রয়োগের দুটি দিক রয়েছে: (১) আইন ও (২) বিচারব্যবস্থা। ইসলামী আইন বিষয়ে অনেক অপপ্রচার থাকলেও যে কোনো মতের ও ধর্মের গবেষক ইসলামী বিচারব্যবস্থার শ্রেষ্ঠতের বিষয়ে নিশ্চিত হবেন। বিচারকের

নিরপেক্ষতা, বিচারের সচ্ছতা, সাক্ষ্য গ্রহণ, সাক্ষ্য-প্রমাণের সঠিকত্ব প্রমাণ, অভিযুক্তের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ, সন্দেহের সুযোগ ইত্যাদির মাধ্যমে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকললের জন্য ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম অত্যন্ত কার্যকর, মানবিক ও সচ্ছ বিচারব্যবস্থা প্রদান করেছে। আধুনিক বিশ্বের প্রায় সকল দেশের বিচারব্যবস্থার অনেক বিষয় ইসলামী বিচারব্যবস্থা থেকে গৃহীত।

ইসলামের পারিবারিক, সামাজিক, বাণিজ্যিক, সাম্পদিক, অধিকার বিষয়ক ও অন্যান্য সকল দেওয়ানী (civil) আইনের বিষয়েও অবিকল একই কথা বলতে হবে। বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি দেওয়ানী, সামাজিক, পারিবারিক ও অন্যান্য বিষয়ে ইসলামী আইন গৃহীত, প্রচলিত বা স্বীকৃত হয়েছে। আমাদের দেশের ও অন্যান্য মুসলিম দেশের বিচারব্যবস্থা ও দেওয়ানী আইন সবই মূলত ইসলামী।

এগুলির পাশাপাশি ইসলামে "অপরাধ আইন" রয়েছে। বিশ্বের সকল দেশের অপরাধ-আইনের উদ্দেশ্য অপরাধীর শাস্তি ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণ। ইসলামের অপরাধ আইনেরও একই উদ্দেশ্য। পার্থক্য শাস্তির প্রকৃতিতে। ইসলামে অল্প কয়েকটি অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট সকল অপরাধের ক্ষেত্রে যুগ, জাতি ও সমাজের প্রেক্ষাপটে শাসক, পার্লামেন্ট, সরকার বা বিচারক শাস্তির প্রকৃতি নির্ধারণ করতে পারেন।

ইসলামে নির্ধারিত শাস্তিগুলি নিম্নরূপ: (১) ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। (২) ইচ্ছাকৃত অঙ্গহানির শাস্তি অনুরূপ অঙ্গহানি। (৩) চুরির শাস্তি কব্জি থেকে হাত কেটে দেওয়া। (৪) ব্যভিচারের শাস্তি ১০০ বেত্রাঘাত ও বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। (৫) কারো বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ করে তা ৪ জন সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর মাধ্যমে প্রমাণ করতে না পারলে অভিযোগকারী ও সাক্ষীগণের শাস্তি ৮০ বেত্রাঘাত। (৫) জেনে বুঝে ইসলাম গ্রহণ করার পর ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। (৬) মদপানের শাস্তি ৪০ বা ৮০ বেত্রাঘাত।

এ সকল শাস্তি কেবলমাত্র মুসলিম নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য। বিশেষত ব্যভিচার ও মদপানের উপর্যুক্ত শাস্তি একান্তভাবেই মুসলিম অপরাধীর জন্য প্রযোজ্য। কোনো মুসলিম নাগরিক এ সকল অপরাধে লিপ্ত হয়েছেন বলে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলে তিনি এ শাস্তি ভোগ করবেন। অমুসলিমদের জন্য এ সকল শাস্তি প্রযোজ্য নয়। তারা তাদের ধর্মীয় আইনে বা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইনে বিচার ও শাস্তি ভোগ করবেন।

হত্যা, অঙ্গহানি ও চুরি এ তিনটি অপরাধের বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। তবে শাস্তির প্রকৃতি সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইসলামী শাস্তিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কঠোর বা মধ্যযুগীয় বলে দাবি করেন। ব্যভিচার, মদপান ও ধর্মত্যাগকে তারা অপরাধ বলে গণ্য করতে নারাজ। এগুলির শাস্তিপ্রদানকেও তারা মধ্যযুগীয় ও ধর্মান্ধতা বলে আখ্যায়িত করেন।

প্রকৃত সত্য হলো, "অপরাধ নিয়ন্ত্রণ"-এর লক্ষ্য অর্জনে ইসলামী বিচারব্যবস্থা ও ইসলামী দেওয়ানী আইন-এর পাশাপাশি ইসলামী অপরাধ-আইনের সঠিক বাস্তবায়নই সবচেয়ে বড় সহায়ক। এ সকল আইন কঠোর হলেও তা অমানবিক বা বর্বর নয়; বরং মানবতার সংরক্ষণে ও বর্বরতা নিয়ন্ত্রণে তা সর্বোচ্চ সহায়ক। এখানে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষণীয়:

(১) ইসলামের এ সকল শাস্তি যেমন কঠোর করা হয়েছে প্রয়োগ তার চেয়ে অনেক কঠিন ও প্রায় অসম্ভব করা হয়েছে, যেন কোনোভাবেই নিরপরাধ বা কম অপরাধী শাস্তি না পায়। অপরাধ শতভাগ প্রমাণিত হওয়া, অপরাধে লিপ্ত হওয়ার কোনোরূপ ওযর না থাকা এবং অপরাধের শাস্তিযোগ্যতার পর্যায় নিশ্চিত হওয়া এ সকল নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগের পূর্বশর্ত। সামান্য সন্দেহ হলে বিচারক অপেক্ষাকৃত হালকা শাস্তি প্রদান করবেন।

হত্যা, অঙ্গহানী ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিহতের উত্তরাধিকারিগণ বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করলে ক্ষতিপূরণ নিয়ে বা কিছু না নিয়ে ক্ষমা করতে পারেন। ব্যভিচারের ক্ষেত্রে চারজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী অথবা ব্যক্তির স্বেচ্ছায় স্বীকৃতির ভিত্তিতেই বিচার শুরু হতে পারে। সাক্ষীগণের সাক্ষ্য ত্রুটিপূর্ণ হলে সাক্ষীগণ ও অভিযোগকারী প্রত্যেকে ৮০ বেত্রাঘাত শাস্তি ভোগ করবেন। উপরন্তু সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও বিচারিক সকল ক্ষেত্রে তাদেরকে স্থায়ীভাবে "সাক্ষ্যদানের অযোগ্য" বলে ঘোষণা দেওয়া হবে। স্বেচ্ছায় স্বীকৃতি প্রদানকারী ব্যক্তি পরে অস্বীকৃতি জানালে তার অস্বীকৃতিই কার্যকর হবে।

(২) বস্তুত, এ সকল শাস্তির উদ্দেশ্য অপরাধ নিয়ন্ত্রণ। সহজ শাস্তির মাধ্যমে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ হয় না। এছাড়া শাস্তি সহজ হলে নিরপরাধের শাস্তি পাওয়ার সুযোগ বেশি হয়। শাস্তি হালকা হওয়ার কারণে বিচারক সহজেই শাস্তি দেন এবং শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিরপরাধ হলেও তা মেনে নেন। আর কঠিন শাস্তির ক্ষেত্রে বিচারক, সমাজ, রাষ্ট্র, বিচারকৃত ব্যক্তি সকলেই অত্যন্ত সজাগ থাকেন, যেন নিরপরাধ শাস্তি না পায় বা অল্প অপরাধে কঠিন শাস্তি না হয়।

(৩) অপরাধ বিষয়ক গবেষণা প্রমাণ করে যে, অল্পসংখ্যক অপরাধীর শাস্তি দিয়ে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা ইসলামী আইনের মাধ্যমেই সম্ভব। অতীতের মুসলিম সমাজগুলিতে খুব কম মানুষেরই হাত কাটা হয়েছে বা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শাস্তির ভয়াবহতার কারণে অপরাধ কম সংঘটিত হয়েছে। বর্তমানেও সৌদি আরব, ইরান, পাকিস্তান, উপসাগরীয় ও মধ্যপ্রাচীয় কয়েকটি দেশে এ সকল শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে খুব কম সময়ে এ সকল শাস্তি প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু শাস্তির বিদ্যমানতার কারণে অপরাধী ভয় পায়। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য ব্যবস্থায় শাস্তির মাধ্যমে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ হয় না, বরং অপরাধীর মধ্যে অপরাধ-প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

(৪) পাশ্চাত্যে অধিকাংশ দেশে 'ড্রাগস' বা 'মাদকদ্রব্য' গ্রহণ ও বিপনন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলেও মদপান অপরাধ নয়। অথচ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান প্রমাণ করে যে, ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষতির দিক থেকে মদ ও ড্রাগস উভয়ই সমান, বরং মদের ক্ষতি অধিক। প্রায় আড়াই শতাব্দী ধরে ইউরোপ ও আমেরিকায় মদ নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অনেক আন্দোলন হয়েছে। নারীরা

এ সকল আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। এ সকল আন্দোলনের ভিত্তিতে গত শতাব্দীতে ইউরোপের অনেক দেশে মদ নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। আমেরিকায় ১৯২০ সালে মদ নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু মদব্যবসায়ীদের চাপে ১৯৩৩ সালে তা আবার বৈধ করা হয়।

মাদকাসক্তি/মদ-নির্ভরতা (Alcoholism/Alcohol Dependence) আধুনিক সভ্যতার ভয়ঙ্করতম ব্যধিগুলির অন্যতম। বিশ্বে অগণিত সফল ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবি, টেকনিশিয়ান, শ্রমিক ও অনুরূপ সফল মানুষের জীবন ও পরিবার ধ্বংস হয়েছে মদের কারণে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুসারে বিশ্বের ৭৬ মিলিয়ন মানুষ মদ পানের কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন রকমের কঠিন রোগে ভুগছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ এবং রাশিয়ার মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মদপান জনিত মারাত্মক রোগব্যধিতে ভুগছেন। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ মদপান ও মদ-নির্ভরতাকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা বলে চিহ্নিত করছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুসারে বর্তমান বিশ্বের সকল রোগব্যাধির শতকরা ৩.৫ ভাগ মদপান জনিত। মদপান ও মাতলামির কারণে প্রতি বৎসর শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই ১৮৫ বিলিয়ন ডলার নষ্ট হয়।[১৯৭]

ইসলাম ঈমান ও আল্লাহর ভয়ের পাশাপাশি আইনের মাধ্যমে এ ভয়ঙ্কর ব্যাধিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করেছে। এ আইনে একমাত্র মদব্যবসায়ী ছাড়া কারো কোনো ক্ষতি হয় না, শাস্তিপ্রাপ্তের সংখ্যা বাড়ে না কিন্তু এ আইনের মাধ্যমে এ ভয়ঙ্কর ব্যাধি নির্মূল হয় বা নিয়ন্ত্রিত হয়।

(৫) ইহূদীধর্ম, খৃস্টধর্ম ও অন্য সকল ধর্মেই ব্যভিচারকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ, বিশেষত বাইবেলে ব্যভিচার ও সকল প্রকার অবৈধ যৌনতাকে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতায় ধর্ষণকে অপরাধ বলা হলেও ব্যভিচারকে বৈধ করা হয়েছে এবং বিষয়টিকে মানুষের ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু 'ড্রাগস' বিক্রয় ও গ্রহণকে এভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতা হিসেবে গণ্য করা হয় না। অথচ ব্যক্তি, সমাজ ও মানবসভ্যতার জন্য ড্রাগসের চেয়ে ব্যভিচার অনেক বেশি ক্ষতিকর। আধুনিক সভ্যতা প্রমাণ করেছে যে, ব্যভিচারের মাধ্যমে পরিবার নষ্ট হয়, সন্তানগণ পারিবারিক স্নেহ ও প্রতিপালন থেকে বঞ্চিত হয়, তাদের মধ্যে মানবীয় মূল্যবোধের বিকাশ ব্যহত হয় এবং হিংস্রতা বৃদ্ধি পায়। বস্তুত ড্রাগসের কারণে ব্যক্তির জীবন নষ্ট হয় আর ব্যভিচারের মাধ্যমে মানবসভ্যতা বিনষ্ট হয়। এজন্য ইসলামে মদপান, মাদকদ্রব্য গ্রহণ, বিপনন ও ব্যভিচারকে কাছাকাছি পর্যায়ের কঠিন অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

(৬) ইহূদী-খৃস্টীয় ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে বিধর্মী ও ধর্মত্যাগীর মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে। যদি কোনো গ্রাম বা নগরীর অধিবাসীরা ধর্মত্যাগ করে তাহলে তথাকার সকল মানুষকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে এবং সকল পশুও হত্যা করতে হবে। তথাকার সকল সম্পদ ও দ্রব্যাদি পুড়িয়ে ফেলতে হবে। অগ্নিদগ্ধ জনপদটি চিরিকালীন ঢিবি হয়ে থাকবে। কখনোই আর তা পুনর্বার নির্মিত হবে না। উপরন্তু ধর্মের নির্দেশ সামান্য লঙ্ঘন করলেও মৃত্যুদণ্ডের বিধান দেওয়া হয়েছে। যেমন, শনিবারে খড়ি কুড়ালে বা কর্ম করলে তাকে জনসমক্ষে পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিধান রয়েছে।[১৯৮]

ইসলাম অন্য ধর্মের অনুসারীদের ইসলাম গ্রহণের জন্য চাপপ্রয়োগ বা প্রলোভন নিষিদ্ধ করেছে। পাশাপাশি মুসলিমের জন্য অন্যধর্ম গ্রহণ মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করেছে। ইসলামী রাষ্ট্রের স্থিতি বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র রোধ করতেই এ বিধান দেওয়া হয়েছে। যারা বাইবেলকে ঈশ্বরের বাণী বলে বিশ্বাস করেন তাদের মুখে এবং আধুনিক যুগে যারা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষার নামে অমানবিক আইন তৈরি করছেন বা সমর্থন করছেন তাদের মুখে ইসলামের এ আইনকে অমানবিক বলা মোটেও মানায় না।

(৭) মুমিন বিশ্বাস করেন যে, কিভাবে মানুষের অপরাধ প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং কোন্ অপরাধে কোন্ শাস্তি সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য তা মহান স্রষ্টা আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন। আইনের বিষয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ প্রশস্ততা দিয়েছেন এবং যুগ ও সমাজের আলোকে আইন তৈরির সুযোগ দিয়েছেন। শুধু যে সকল বিষয়ে প্রয়োজন সেক্ষেত্রেই তিনি শাস্তি নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

মুমিনের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ মহান আল্লাহর বিধানের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করা। সালাত, সিয়াম, বিবাহ ইত্যাদি সকল বিষয়ের ন্যায় বিচারব্যবস্থা, দেওয়ানী আইন ও অপরাধ আইনের ক্ষেত্রেও আল্লাহর নির্দেশ মান্য করা মুমিনের ঈমান ও ইসলামের দাবী। যদি কোনো মানুষ মনে করেন যে, সালাতের ক্ষেত্রে কুরআনের নির্দেশ সর্বজনীন, সর্বকালীন এবং সর্বোত্তম, কিন্তু বিচারের ক্ষেত্রে কুরআনের নির্দেশ সর্বোত্তম নয় বা সর্বজনীন নয় তাহলে তিনি মুমিন বলে নিজেকে দাবি করতে পারেন না।

(৮) অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আগ্রহী যে কোনো দেশের জন্য ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন এ আগ্রহ পূরণের অন্যতম সহায়ক। বিশেষত মুসলিম দেশগুলির আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা অবস্থার উন্নয়নে ইসলামী অপরাধ-আইন বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। সকল মুসলিম দেশের সরকার ও প্রশাসনের দায়িত্ব আল্লাহর প্রতি ঈমান, ধর্মীয় প্রেরণা, দেশপ্রেম ও নাগরিকদের স্বার্থে ইসলামী আইনের সঠিক বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়া।

(৯) আল্লাহর পথে আহ্বানকারী যেমন সালাত, সিয়াম, যিকর ইত্যাদি কুরআন নির্দেশিত ইবাদত বাস্তবায়নের আহ্বান করবেন, তেমনি কুরআন নির্দেশিত আইন, বিচার ইত্যাদির বাস্তবায়নের আহ্বান করবেন। সালাত পালনে আল্লাহর নির্দেশের অবহেলা যেমন তাকে ব্যথিত করে, বিচার পালনে আল্লাহর নির্দেশের অবহেলাও তাকে তেমনি ব্যথিত করে। এ তার ঈমানের দাবি। কুরআন-সুন্নাহর কোনো নির্দেশনার প্রতি অবহেলা দেখে ব্যথিত না হলে ঈমান থাকে না।

(১০) সালাত, সিয়াম ইত্যাদির দাওয়াতের ন্যায় আইন ও বিচার বিষয়ক দাওয়াতও বিনম্রতা, উত্তম আচরণ ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে হতে হবে। কোনো অবস্থাতেই সহিংসতা বা বলপ্রয়োগ মুমিনের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহর কোনো নির্দেশ অমান্য হতে দেখলে কোনোরূপ ব্যাথা ও আপত্তি হৃদয়ে অনুভব না করা ঈমান হারাণোর লক্ষণ। সাধ্য থাকা সত্ত্বেও দাওয়াত না দিয়ে নীরব থাকলে পাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অন্তত কেউই যদি কথা না বলেন তবে সকলেরই পাপী হওয়ার সম্ভাবনা। বিনম্রতা ও শোভন আচরণের সাথে দাওয়াতের দায়িত্ব আদায় করলে সুনিশ্চিত সাওয়াবের আশা করা যায়। আর অশোভন আচরণ, উগ্রতা, বলপ্রয়োগ বা সহিংসতার আশ্রয় গ্রহণ করলে সুনিশ্চিত কঠিন পাপ অর্জন ছাড়া কোনোই লাভ হবে না। এতে নিজের মনের ক্ষোভ বা প্রতিশোধস্পৃহা পূরণ হতে পারে এবং মুমিনকে জাহান্নমে নেওয়ার ও মুসলিম সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শয়তান ও তার অনুসারীদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি মুমিনের বা মুসলিম উম্মাহর ক্ষতি ছাড়া কোনো লাভ হয় না।

আমরা দেখছি যে, আমাদের দেশে বিচারব্যবস্থা, দেওয়ানী আইন ও কোনো কোনো অপরাধ-আইন ইসলাম নির্দেশিত বা ইসলাম সম্মত। আর কিছু ইসলামী আইন বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এজন্য কি কোনো মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রকে কাফির বা অনৈসলামিক রাষ্ট্র বলা বৈধ? আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদে তা পর্যালোচনা করতে চাই। মহান আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করছি।

৩. ৯. ৫. ইসলামী রাষ্ট্র বনাম অনৈসলামিক রাষ্ট্র

আমরা দেখেছি যে, জামাআতুল মুসলিমীন বা "তাকফীর ওয়াল হিজরা" সংগঠন উপনিবেশোত্তর মুসলিম দেশগুলিকে কাফির রাষ্ট্র বলে গণ্য করে। এ বিষয়ে তাদের বিভ্রান্তি আমরা নিম্নরূপে বিন্যস্ত করতে পারি:

(১) আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রগুলি কাফির রাষ্ট।

(২) কাফির রাষ্ট্র উৎখাত করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা বড় ফরয।

(৩) এ ফরয পালনের জন্য জিহাদই একমাত্র পথ এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যা কিছু করা হয় সবই জিহাদ বলে গণ্য।

(৪) এ জিহাদ পালনে রাষ্ট্রের নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা করা বৈধ।

এভাবে তারা ইসলামী শিক্ষার বিকৃতি সাধন করেছেন। অজ্ঞতা, আক্রোশ ও আবেগ তাদেরকে এ পথে পরিচালিত করে। অথবা ইসলামকে কলঙ্কিত করতে এবং ইসলামী জাগরণকে থামিয়ে দিতে কৌশলে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে এ সকল কথা বলানো হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ বিষয়ের বিভ্রান্তি আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, জিহাদ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ নয়, জিহাদ প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার পথ। আর জিহাদ শুধু শত্রু বাহিনীর সশস্ত্র যোদ্ধাদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হবে। পারিভাষিক জিহাদ বা রাষ্ট্রীয় যুদ্ধের বাইরে রাষ্ট্র সংস্কার বা রাষ্ট্রে ইসলামী মূল্যবোধ ও বিধিবিধান প্রতিষ্ঠার কর্ম ইসলামী পরিভাষায় জিহাদ নয়, তা হলো "আল্লাহর পথে দাওয়াত" এবং "ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ"। একে পারিভাষিক জিহাদ বলে মনে করা বা এজন্য অস্ত্রধারণ ও হত্যা বৈধ মনে করা ইসলামী শিক্ষার কঠিনতম বিকৃতি ছাড়া কিছুই নয়।

আমরা এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় বিষয় আলোচনা করতে চেষ্টা করব। আর এ বিষয়ক বিভ্রান্তি বুঝতে হলে আমাদেরকে জানতে হবে, কখন আমরা একটি রাষ্ট্রকে "ইসলামী রাষ্ট্র" বলে গণ্য করব এবং কখন আমার একটি রাষ্ট্রকে "কাফির রাষ্ট্র" বা অনৈসলামিক রাষ্ট্র বলে গণ্য করব?

আগেই বলেছি যে, সাধারণ খুটিনাটি বিষয়ে প্রশস্ততা দেওয়ার জন্য মুআমালাত বিষয়ে ইসলামে অনেক বিষয় উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। তারই একটি প্রকাশ হলো "দারুল ইসলাম" বা ইসলামী রাষ্ট্র ও দারুল কুফর বা কুফরী রাষ্ট্র বিষয়ক কোনো সুনির্ধারিত সংজ্ঞা কুরআন-হাদীসে প্রদান করা হয় নি।

এখন যদি আমাদের কাউকে ইসলামী বিবাহ ও কুফরী বিবাহ অথবা ইসলামী পরিবার ও কুফরী পরিবারের "সুনির্ধারিত সংজ্ঞা" জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে আমরা দেখব যে, বিষয়টি বেশ প্রশস্ত। পরিপূর্ণ ইসলামী বিবাহের বা পরিবারের যে ধারণা আমাদের রয়েছে তার কিছু বিচ্যুতি হলেই আমরা সে বিবাহ বা পরিবারকে "কুফরী" বলে গণ্য করতে পারছি না। বরং কুফরী বিবাহ বা পরিবারের উর্ধ্বে উঠলেই তাকে 'ইসলামী' বলে মানতে বাধ্য হচ্ছি, যদিও পুরোপুরি ইসলামী নয় বলে বুঝতে পারছি।

ইসলামী রাষ্ট্রের বিষয়টিও অনুরূপ। কুরআন ও হাদীসে ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নি। মহান আল্লাহ বলেন:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদেরকে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, অবশ্যই তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করবেন যেমন তিনি স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের জন্য তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি অবশ্যই তাদের ভয়-ভীতিকে শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোনো শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই সত্যত্যাগী।"[১৯৯]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেনঃ

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ

"যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতাবান করলে তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, ন্যায়ের আদেশ করে এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করে। আর কর্মসমূহের পরিণাম আল্লাহরই অধীনে।"[২০০]

এ আয়াতদ্বয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম আয়াতে দীনের সুদৃঢ়তা, শান্তি-নিরাপত্তায় দীন পালনের স্বাধীনতা এবং নির্ভয়ে আল্লাহর শিরকমুক্ত ইবাদত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে সালাত, যাকাত, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের বিদ্যমানতা ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ সকল আয়াতের আলোকে ফকীহগণ দারুল ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রকারের সংজ্ঞা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে কেউ কেউ মুসলমানদের রাজনৈতিক আধিপত্যকে মূল বলে গণ্য করেছেন এবং বলেছেন যে, দাও'আত, যুদ্ধ, সন্ধি, স্বাধীনতা বা অন্য যে কোনোভাবে কোনো দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা মুসলিমদের হাতে আসলে সে দেশ দারুল ইসলাম।[২০১] অন্যান্য ফকীহ ইসলামী বিধি বিধানের প্রকাশকে মানদণ্ড বলে গণ্য করেছেন। তাঁদের ভাষ্যমতে যে কোনো দেশ, রাষ্ট্র বা জনপদে ইসলামের বিধিবিধান প্রকাশিত থাকলে তা দারুল ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্র বলে গণ্য।[২০২]

এখানে লক্ষণীয় যে, ব্যক্তি মুমিনের ক্ষেত্রে যেমন পরিপূর্ণ ও আদর্শ মুমিনের পাশাপাশি কম বা বেশি পাপে লিপ্ত পাপী মুমিনদেরকেও মুসলিম বলে গণ্য করা হয়েছে, তেমনি ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী দেশের ইসলামের দাবি গ্রহণে প্রশস্ততা অবলম্বন করা হয়েছে। পাপের প্রকাশ, ইসলামী বিধিবিধানের অবমাননা, ইসলামী বিধান লঙ্ঘন, কুরআন বিরোধী বিধিবিধান বা আকীদা বিশ্বাসের প্রকাশের কারণে রাষ্ট্রকে কাফির রাষ্ট্র বলে গণ্য করা হয় নি। মুসলিম উম্মাহর ফকীহ ও ইমামগণ বারংবার উল্লেখ করেছেন যে, কোনো দেশ বা রাষ্ট্র মুসলিম শাসনাধীন হয়ে "দারুল ইসলামে" পরিণত হওয়ার পর শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন, অমুসলিমদের প্রাধান্য বা অন্য কোনো কারণে পুনরায় "দারুল কুফর" বা "দারুল হরব" অর্থাৎ অনৈসলামিক রাষ্ট্র বা শত্রু রাষ্ট্র বলে গণ্য করার ক্ষেত্রে ব্যাপক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এ বিষয়ে ফকীহগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেন, তিনটি শর্ত পূরণ হলে ইসলামী রাষ্ট্রকে কাফির রাষ্ট্র বলে গণ্য করা যাবে: (১) কুফরের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়া, (২) কাফির রাষ্ট্রের সাথে সংযুক্ত হওয়া এবং (৩) উক্ত রাষ্ট্রের মুসলিম ও অমুসলিম সকল নাগরিকের মুসলিমগণ প্রদত্ত নাগরিক অধিকার ও নিরাপত্তা বাতিল হওয়া।[২০৩]

ইসলামের ইতিহাসে শীয়াগণ সর্বদা শীয়া রাষ্ট্র ছাড়া সকল সরকার ও রাষ্ট্রকে তাগূতী রাষ্ট্র বলে বিশ্বাস করেছেন। পক্ষান্তরে সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারী আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলিমগণ কখনোই এ ধরনের মতামত পোষণ করেন নি। এমনকি বাতিনী শিয়া, কারামিতা, ফাতিমী শিয়া ও অন্যান্য গোষ্ঠী যারা প্রকাশ্যে ও সুস্পষ্টভাবে কুরআন-হাদীসের বিধানাবালি ব্যাখ্যা করে অস্বীকার ও অমান্য করত এবং এর ব্যতিক্রম বিধান প্রদান করত তাদের রাষ্ট্রকেও তাগূতী, জাহিলী বা কাফির রাষ্ট্র বলে গণ্য করেন নি। বরং এগুলিকে ইসলামী রাষ্ট্র বলেই গণ্য করেছেন।

রাষ্ট্রীয় বিষয়ে কুরআনের বিধিবিধানের ব্যতিক্রম চলা বা "আল্লাহর আইনের" ব্যতিক্রম বিধান দান উমাইয়া যুগেই শুরু হয়েছে। বিশেষত আব্বাসী, ফাতিমী, বাতিনী, মোগল ইত্যাদি রাজ্যে ইসলামী বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক সুস্পষ্ট কুফরী বিশ্বাস ও মতবাদকে রাষ্ট্রীয় মতবাদ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, ইসলামের আইন বিচার অনেকাংশেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এমনকি ইসলামের হারাম অনেক বিষয় বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে বৈধ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে ইহূদী, খৃস্টান, অগ্নিউপাসক বা পৌত্তলিকদের রাষ্ট্রীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আলিমগণ সাধ্যমত এগুলির কঠোর প্রতিবাদ করেছেন, অনেকে সরকারের বিরাগভাজন হয়েছেন, শাস্তিভোগ করেছেন, কিন্তু কখনোই রাষ্ট্র প্রশাসনের এ সকল বিচ্যুতির কারণে এ সকল রাষ্ট্র বা সমাজকে কাফির রাষ্ট্র বা সমাজ বলে গণ্য করেন নি, রাষ্ট্র, সরকার বা তাদের অনুগতদের বা নাগরিকদের কাফির বলে গণ্য করেন নি বা "ইসলামী রাষ্ট্র" প্রতিষ্ঠার জন্য এরূপ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা যুদ্ধে লিপ্ত হন নি। বরং এরূপ রাষ্ট্রের আনুগত্য করেছেন, আইন মেনেছেন এবং এদের নেতৃত্বে কাফির রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জিহাদে শরীক হয়েছেন।

উমাইয়া, আব্বাসী, স্পেনীয়, খারিজীয়, ফাতেমীয়, কারামিতীয়, বাতিনী, তাতার, মুগল ইত্যাদি সকল যুগের সকল রাষ্ট্রকেই মুসলিম আলিম ও ফকীহগণ দারুল ইসলাম বলে গণ্য করেছেন এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সকল বিধান সেখানে প্রয়োগ করেছেন। জুমুআ, জামাত, রাষ্ট্রের আনুগত্য, রাষ্ট্র প্রধানের নির্দেশে ও নেতৃত্বে শত্রুদেশের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদ ইত্যাদি সকল বিধান এ সকল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে উল্লেখ করেছেন।

বর্তমান বিশ্বের মুসলিম দেশগুলির অবস্থা উমাইয়া যুগ ও পরবর্তী যুগের মুসলিম দেশগুলি থেকে মোটেও ভিন্ন নয়, বরং

কিছুটা ভালই বলতে হয়। শাসক নির্বাচন ও রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের পরামর্শ গ্রহণ, জনগণের নিকট জবাবদিহিতা, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, নিরপেক্ষভাবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও আইন প্রয়োগ ইত্যাদি ইসলামী নির্দেশনা পালনের ক্ষেত্রে এ সকল রাষ্ট্র পূর্ববর্তী রাষ্ট্রগুলি থেকে কিছুটা হলেও উন্নত হয়েছে। এ সকল দেশের অধিকাংশ আইন-কানুন ও বিচার ব্যবস্থা ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা থেকে গৃহীত। ইসলমী বিধানের পরিপন্থী কিছু আইন-কানুনও বিদ্যমান, যেগুলির অপসারণ ও সংশোধনের জন্য মুমিন চেষ্টা ও দাওয়াত অব্যাহত রাখবেন। কিন্তু শাসকদের পাপ, রাষ্ট্র ব্যবস্থার পাপ বা কিছু ইসলাম-বিরোধী আইন-কানুনের জন্য কোনো রাষ্ট্রকে "দারুল কুফর" বা কাফির রাষ্ট্র মনে করার কোনোরূপ ভিত্তি নেই।

উপনিবেশোত্তর মুসলিম দেশগুলির স্বৈরাচার, ইসলাম বিরোধী আচরণ ও বিধিবিধান, ধার্মিক মানুষদের প্রতি অত্যাচার ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে অনেক আবেগী মুসলিমই অনুভব করেন যে, তার দেশটি একটি অনৈসলামিক দেশ এবং এদেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সময়ের দাবি। আবেগ-তাড়িত মতামত বা কর্ম জাগতিক ফল বা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সহায়ক নয়। আবেগ যাই বলুক না কেন, আমাদেরকে আবেগমুক্ত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কুরআন-হাদীসের সামগ্রিক নির্দেশনা, ইসলামের ইতিহাসের সকল যুগের রাষ্ট্রগুলির অবস্থা, সেগুলির সংস্কারে আলিম, উলামা, পীর, মাশাইখ ও বুজুর্গগণের কর্মধারার ভিত্তিতে আবেগমুক্ত হয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

কুরআন-হাদীসের সামগ্রিক নির্দেশনা, উমাইয়া যুগ ও পরবর্তী যুগগুলির বিষয়ে সাহাবী, তাবিয়ী ও তৎপরবর্তী আলিমগণের মতামতের আলোকে আমরা সুনিশ্চিত বুঝতে পারি যে, সমকালীন মুসলিম দেশগুলিকে কাফির রাষ্ট্র বলে গণ্য করার কোনো সুযোগ নেই। সমকালীন কোনো কোনো গবেষক মুসলিম রাষ্ট্র ও ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। এ পার্থক্য একান্তই গবেষণা। ইসলামী শরীয়তের বিধান প্রদানের ক্ষেত্রে এ পার্থক্যের কোনো গুরুত্ব নেই। শরীয়তের বিধানের আলোকে এগুলি সবই দারুল ইসলাম। আল্লাহর পথে দাওয়াত বা ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের অংশ হিসেবে মুমিন এ সকল রাষ্ট্রের অন্যায়ের প্রতিবাদ করবেন, সংশোধনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন, কিন্তু কখনোই রাষ্ট্রীয় আনুগত্য পরিত্যাগ করবেন না বা রাষ্ট্রদ্রোহিতায় লিপ্ত হবেন না।

৩. ৯. ৬. দীন প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্র সংস্কার

আমরা বলেছি যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার একটি দিক রাষ্ট্র। ইসলামে রাষ্ট্র ব্যবস্থার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ উল্লেখ করেছেন যে, সমাজে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রাখা মুসলিমদের জন্য ফরয কিফায়া। তবে এ বিষয়ে খারিজীগণ, বিশেষত আধুনিক খারিজীগণ কিছু বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হন। তারা দাবি করেন যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা বড় ফরয। তাদের দাবীর দুটি বিশেষ দিক লক্ষণীয়: প্রথমত বিশ্বে কোথাও "ইসলামী রাষ্ট্র" নেই, বরং সকল মুসলিম রাষ্ট্রই "কাফির" রাষ্ট্র এবং দ্বিতীয়ত, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সবচেয়ে বড় ফরয।

মূলধারার আলিমদের সাথে এদের দাবির পার্থক্য দুটি:

প্রথমত, মূলধারার আলিমগণের মতানুসারে মুসলিম সমাজে বিদ্যমান রাষ্ট্রগুলি বিচ্যুতি ও পাপাচার সত্ত্বেও "ইসলামী রাষ্ট্র" বা "দারুল ইসলাম"; কাজেই মুমিনের দায়িত্ব শূন্য থেকে প্রতিষ্ঠা নয়, বরং প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে সংস্কার ও সংশোধন করা। সাধারণ নাগরিকদের দায়িত্ব রাষ্ট্র সংস্কার ও সংশোধন। আর রাষ্ট্র প্রশাসন ও সরকারের দায়িত্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত রাখা, শরীয়তের বাস্তবায়ন ও প্রয়োজনীয় জিহাদ পরিচালনা করা।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, সংশোধন ইত্যাদির দায়িত্ব সাধারণভাবে ফরয কিফায়া, কখনো ফরয আইন, তবে কখনোই বড় ফরয নয়।

এখানে লক্ষণীয় যে, সমকালীন প্রাজ্ঞ ও সুপ্রসিদ্ধ কোনো কোনো আলিম ও গবেষকের কিছু কিছু বক্তব্য 'জামাআতুল মুসলিমীন' তাদের মতামতের দলীল হিসেবে পেশ করতেন। এ সকল বক্তব্য থেকে তারা যা প্রমাণ করতেন এ সকল আলিম সে অর্থে তাঁদের কথা বলেন নি। ইসলামী দাওয়াত, আন্দোলন, সমাজ পরিবর্তন, দীনের বিজয়, দীন প্রতিষ্ঠা, জাহিলী সমাজ বর্জন ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব বুঝাতে তারা যে সকল কথা বলেছেন এ সকল আবেগী যুবক সেগুলিকে "বেদবাক্যের" মত আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে তাদের আবেগকে আরো বেশি শানিত করেছেন। এভাবে আবেগতাড়িত উগ্রতায় নিপতিত হয়েছে। কখনো বা এভাবে তাদের আবেগ উজ্জীবিত করে তাদেরকে বিপথগামী করা হয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্যে।

খারিজীগণের প্রমাণাদির মধ্যে ছিল:

প্রথমত, জিহাদ বিষয়ক নির্দেশাবলি

তারা দাবি করতেন যে, জিহাদ বড় ফরয। আর জিহাদের উদ্দেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যা কিছু করা হয় তা জিহাদ বলে গণ্য। কাজেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই জিহাদ এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই বড় ফরয।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, "বড় ফরয" পরিভাষাটিই কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত নয়। কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনা ছাড়া কোনো ইবাদতকে "বড় ফরয" বলা যায় না। আরকানে ইসলামের পরে আর কোনো ইবাদতকে ঢালাওভাবে বড় ফরয বলার সুযোগ নেই। আমরা দেখেছি যে, জিহাদ সাধারণত ফরয কিফায়া এবং কখনো বা ফরয আইন। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয় দাওয়াতের মাধ্যমে, জিহাদের মাধ্যমে নয়। রাষ্ট্র সংস্কারও হয় দাওয়াতের মাধ্যমে, জিহাদের মাধ্যমে নয়।

দ্বিতীয়ত: প্রতিপালকের খিলাফাত

মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً

"যখন তোমার প্রতিপালক মালাকগণকে বললেন: আমি পৃথিবীতে একজন 'স্থলাভিষিক্ত' সৃষ্টি করছি।"[২০৪]

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে বড় ফরয বলে দাবি করে তারা বলেন যে, মহান আল্লাহ মানুষকে তাঁর রুবূবিয়্যাত বা প্রতিপালনের খিলাফাত বা প্রতিনিধির দায়িত্ব প্রদান করেছেন। রুবূবিয়্যাতের এ দায়িত্ব পালনই মুমিনের বড় ফরয। আর এ দায়িত্ব পালনের জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা অপরিহার্য।

বস্তুত তাদের এ "দলীল"-টি একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য বাণী দ্বারা প্রমাণিত। তবে এ আয়াতটির সাথে এ দায়িত্বের কোনো সম্পর্কই নেই।

খলীফা অর্থ 'স্থলাভিষিক্ত' বা 'গদ্দিনশীন', যিনি অন্যের অনুপস্থিতিতে তার স্থলে অবস্থান বা কর্ম করেন। আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি আদমকে পৃথিবীতে 'খলীফা' বা স্থলাভিষিক্ত হিসেবে প্রেরণ করবেন, কার স্থলাভিষিক্ত তা বলেন নি। মুফাস্সিরগণ থেকে তিনটি মত প্রসিদ্ধ: (১) ইবনু আব্বাস (রা), ইবনু মাসঊদ (রা) প্রমুখ সাহাবীর মতে এখানে 'স্থলাভিষিক্ত' বলতে পূর্ববর্তী জিন্ন জাতির স্থলাভিষিক্ত বুঝানো হয়েছে। (২) ইবনু যাইদ ও অন্যান্য কোনো কোনো মুফাস্সিরের মতে এখানে 'খলীফা' বা স্থলাভিষিক্ত বলতে বুঝানো হয়েছে যে, আদম সন্তানগণ এক প্রজন্মের পর আরেক প্রজন্ম পৃথিবীতে বসবাস করবে এবং পরবর্তী প্রজন্ম পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত হবে। (৩) ইমাম তাবারী ও অন্যান্য কতিপয় মুফাস্সির বলেন যে, এখানে খলীফা অর্থ আল্লাহর খলীফাও হতে পারে। অর্থৎ আদম ও তাঁর সন্তানগণ পৃথিবীতে আল্লাহর নিয়ম-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরই স্থলাভিষিক্ত।[২০৫]

খলীফা শব্দ, এর বহুবচন এবং এর ক্রিয়াপদ কুরআন কারীমে প্রায় ২০ স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। এ সকল ব্যবহারের আলোকে সুস্পষ্ট যে, খলীফা বলতে পূর্ববর্তী প্রজন্মের স্থলাভিষিক্ত বুঝানো হয়। এজন্য কুরআনের ব্যবহারের আলোকে প্রথম ও দ্বিতীয় মতই অধিক গ্রহণযোগ্য।

তৃতীয় মতটির বিষয়ে প্রথম যুগের অনেক আলিম আপত্তি করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, মানুষকে আল্লাহর খলীফা বলা ইসলামী বিশ্বাসের পরিপন্থী। কারণ, কারো মৃত্যু, স্থানান্তর বা অবিদ্যমানতার কারণেই তার স্থলাভিষিক্ত, গদ্দিনশীন বা খলীফার প্রয়োজন হয়। আর মহান আল্লাহ তো এরূপ কোনো প্রয়োজনীয়তা থেকে মহা পবিত্র। কুরআনে কোথাও মানুষকে 'আল্লাহর খলীফা' বলা হয় নি। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে যে, আল্লাহই মানুষের খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত হন। যেমন সফরের দু'আয় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন: "আপনিই সফরে (আমাদের) সাথী এবং পরিবারে (আমাদের) খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত।"[২০৬] একব্যক্তি আবূ বাকর (রা)-কে সম্বোধন করে বলেন, হে আল্লাহর খলীফা। তখন তিনি বলেন, "আমি আল্লাহর খলীফা নই, বরং আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত।"[২০৭]

এতদসত্ত্বেও পরবর্তীকালে এ আয়াতের তাফসীরে তৃতীয় মতটিই প্রসিদ্ধি লাভ করে। শিয়াগণ এ ব্যাখ্যাকে তাদের মতের দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাদের মতে মানুষ আল্লাহর খলীফা। আর আল্লাহর খিলাফাতের পরিপূর্ণতা ইমাম বা রাষ্ট্র প্রধানের মধ্যে বিদ্যমান থাকতে হবে। এজন্য তাদের বিশ্বাস অনুসারে ইমাম আল্লাহর গাইবী জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী এবং তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ধর্মীয় সিদ্ধান্ত বলে গণ্য।

তৃতীয়ত, দীনের বিজয়

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে একাধিকবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি দীনকে প্রকাশ বা বিজয় দান করবেন। এ সকল আয়াত থেকে তারা দাবি করেন যে, দীনকে বিজয় করার দায়িত্ব উম্মাতের বড় ফরয।

আমরা উল্লেখ করেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের প্রায়োগিক সুন্নাত ও ব্যাখ্যা বর্জন করে, শুধু নিজের মন ও মনন দিয়ে কুরআনের অর্থ নির্ধারণ করা এবং এ অর্থের ভিত্তিতে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা খারিজীগণের বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ ছিল। নিঃসন্দেহে দীনের বিজয় ইসলামের নির্দেশনা। তবে বিজয়ের অর্থ ও পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের মাধ্যমে জানতে হবে। আমরা এখানে এ সকল আয়াতের অর্থ ও এর ব্যাখ্যায় সাহাবী-তাবিয়ী ও পরবর্তী আলিমগণের মতামত আলোচনা করব।

মহান আল্লাহ বলেন:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

"তিনিই প্রেরণ করেছেন তার রাসূলকে সঠিক পথের নির্দেশনা ও সত্য দীন-সহ; যেন তিনি তাকে প্রকাশ করেন সকল দীনের উপর; যদিও মুশরিকগণ তা অপছন্দ করে।"[২০৮]

কুরআনে আরো দু স্থানে আল্লাহ অনুরূপ কথা বলেছেন।[২০৯] এ সকল স্থানে আল্লাহ তাকে সকল দীনের উপর "ইযহার" করবেন বলে উল্লেখ করেছেন। ইযহার অর্থ প্রকাশ করা। বিজয় করা অর্থেও তা ব্যবহৃত হয়।

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াতের অর্থ "আল্লাহ মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে সকল ধর্মের সকল তথ্য প্রকাশ করবেন বা জানিয়ে দিবেন; যদিও ইহূদী-খৃস্টান ও অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা তাদের এ সকল বিষয় প্রকাশ পাওয়া অপছন্দ করত।"

অন্যান্য মুফাস্সির বলেছেন যে, এখানে প্রকাশ বা বিজয় বলতে তাত্ত্বিক প্রকাশ বা বিজয় বুঝানো হয়েছে। সকল দীনের উপর প্রকাশ বা বিজয় বলতে সকল দীনের অনুসারীদের এ দীন গ্রহণ করা বা সকল সমাজ ও রাষ্ট্রের উপরে মুসলিম রাষ্ট্রের বিজয় বুঝানো হয় নি। বরং তত্ত্বে, তথ্যে, প্রমাণে ও যুক্তিতে সকল দীনের উপর এ দিনকে আল্লাহ প্রকাশিত ও বিজয়ী করবেন বলে বুঝানো হয়েছে।

আবূ হুরাইরা (রা) ও অন্যান্য মুফাস্সির থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, শেষ যুগে ঈসা (আ)-এর পুনরাগমণের মাধ্যমে মহান আল্লাহ এ দীনকে চূড়ান্ত বিজয় ও প্রকাশ দান করবেন। সে সময়ে বিশ্বের সকল মানুষ এ দীন গ্রহণ করবে এবং দীন একমাত্র আল্লাহরই হবে।[২১০]

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিম উম্মাহর ক্রমপ্রসারিত বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন:

إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا

"আল্লাহ আমার জন্য পৃথিবীকে সংকুচিত করেন, তখন আমি পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম দেখলাম। আর পৃথিবীর যতটুকু আমার জন্য সংকুচিত করা হয়েছিল তার তাবৎ স্থানে আমার উম্মাতের রাজত্ব পৌঁছে যাবে।"[২১১]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

(لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ) لا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلا وَبَرٍ إِلا أَدْخَلَهُ اللَّهُ كَلِمَةَ الإِسْلامِ (هَذَا الدِّينَ) بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ ذُلِّ ذَلِيلٍ إِمَّا يُعِزُّهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ يُذِلُّهُمْ فَيَدِينُونَ لَهَا

"দিবারাত্র যেখানে পৌঁছে সেখানেই এ দীন পৌঁছাবে। এ ধরাপৃষ্ঠে এমন একটি বাড়ি বা তাবুও অবশিষ্ঠ থাকবে না যেখানে এ দীন পৌঁছাবে না। প্রতিটি বাড়িতেই আল্লাহ এ দীন পৌঁছাবেন, কারো সম্মানের সাথে কারো লাঞ্ছনার সাথে। কাউকে আল্লাহ দীনের অনুসারী হওয়ার তাওফীক দিয়ে সম্মানিত করবেন। আর কেউ এর বশ্যতা স্বীকার করে অনুগত হবে।[২১২]

বস্তুত আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। তিনি তাঁর মহান রাসূল (ﷺ)-এর মাধ্যমে দীনকে প্রকাশিত ও বিজয়ী করেছেন। যুক্তি ও প্রমাণে তাঁর দীনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয়েছে। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ দীনকে প্রকাশিত ও বিজয়ী করেছেন। আর এ বিজয়ের ধারা অব্যাহত থাকবে।

এমন নয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাধ্যমে অর্জিত বিজয় কোনো এক সময় একেবারে হারিয়ে যাবে এবং এরপর আমাদেরকে নতুন করে বিজয়ের যাত্রা শুরু করতে হবে। বরং বিজয়ের ধারা অব্যাহত রয়েছে। কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা এবং সাহাবীগণ ও পূর্ববর্তীগণের কর্মধারার আলোকে আমাদের দায়িত্ব হলো, প্রত্যেকের নিজের জীবনে দীন পালন, নিজের সাধ্যমত দীনের দাওয়াত, দীনের শত্রুদের ষড়যন্ত্রের জাল উন্মোচন, ইসলাম বিরোধী প্রচারণার মিথ্যাচার উন্মোচন, ইসলামের সঠিক চিত্র বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরা ইত্যাদি। পাশাপাশি ইসলামী রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, আদর্শিক ও দীনী সংস্কার ইত্যাদির জন্য যথাসাধ্য সচেষ্ট হওয়া। কিন্তু বিজয় অর্জনের নামে ইসলাম নিষিদ্ধ কোনো কর্ম বা সুন্নাত-বহির্ভূত কোনো পদ্ধতির অনুসরণ আমাদের দায়িত্ব নয়। অনুরূপভাবে ফলাফলের চিন্তা আমাদের দায়িত্ব নয়।

চতুর্থত: দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে বড় ফরয বলে দাবি করার জন্য তারা দীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশকে দলিল হিসেবে পেশ করতেন। তাদের মতে, দীন অর্থই রাষ্ট্র এবং "দীন প্রতিষ্ঠা"-র অর্থই "দীনী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা"। আর এ দায়িত্ব হলো সবচেয়ে বড় ফরয। কারণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হলে দীনের অন্যান্য অনেক দায়িত্ব পালন করা যায় না বা দীনের অন্যান্য অনেক বিষয় প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

বস্তুত মহান আল্লাহ দীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। রাষ্ট্র ব্যবস্থা দীনের অংশ। দীনের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় সুন্নাত নির্দেশিত পথে আমাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

"তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে- আর যা আমি ওহী করেছি আপনাকে- এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসাকে, এ বলে যে, তোমরা দীন প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে দলাদলি-বিচ্ছিন্নতা করো না।"[২১৩]

এখানে আল্লাহ এ সকল নবী-রাসূলকে দীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। অধিকাংশ মুফাস্সির উল্লেখ করেছেন যে, এখানে "দীন" বলতে "তাওহীদ" বুঝানো হয়েছে; কারণ সকল নবীর মূল দীন ছিল তাওহীদ। শরীয়তের বিধিবিধানের ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য ছিল।

কুরআন কারীমে নবী ও রাসূলগণের দাওয়াতের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা থেকেও বিষয়টি বুঝা যায়। কুরআন কারীমে ২৫ জন নবী-রাসূলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া নাম উল্লেখ না করে অন্য নবীদের দাওয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সকলের ক্ষেত্রেই "তাওহীদ"-কেই তাদের দাওয়াতের মূল বিষয়ই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনের বর্ণনা অনুসারে তাদের সকলের দাওয়াতের মূল বিষয় ছিল:

আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, একমাত্র তাঁরই ইবাদত কর, তাঁকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, সকল বিপদে শুধু তাঁকেই ডাক, একমাত্র তাঁরই কাছে সাহায্য চাও, তাঁরই জন্য সাজদা কর, তাঁরই উপর নির্ভর কর, তাঁরই জন্য উৎসর্গ, কুরবানী ও জবাই কর। আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য যাদের বা যা কিছুর ইবাদত করা হয় তার ইবাদত বর্জন কর, তাদের ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতা অবিশ্বাস কর।

অধিকাংশ নবী-রাসূলের ক্ষেত্রে "তাওহীদ" ছাড়া অন্য কোনো বিষয় উল্লেখ করা হয় নি। কয়েকজন নবী-রাসূলের ক্ষেত্রে তাওহীদের পাশাপাশি চারিত্রিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান উল্লেখ করা হয়েছে। সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ বলেছেন যে, সকল নবীকেই "দীন প্রতিষ্ঠার" নির্দেশ দিয়েছেন, আর অধিকাংশ নবীই তাওহীদ ছাড়া অন্য কিছুর দাওয়াত দিয়েছেন বলে কুরআনে উল্লেখ করা হয় নি। এজন্য অধিকাংশ মুফাস্সির বলেছেন যে, দীন প্রতিষ্ঠার অর্থ তাওহীদ পালন ও তাওহীদের দাওয়াত।

অন্য অনেকে দীন বলতে তাওহীদ ও আহকামের সমষ্টি বুঝিয়েছেন। কারণ প্রত্যেক নবীকে তাঁকে প্রদত্ত দীন কায়েমের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[২১৪]

"ইকামতের দীন" বা দীন প্রতিষ্ঠা বলতে অধিকাংশ মুফাস্সির "দীন পালন" বা "দীনের নির্দেশনা অনুসারে কর্ম করা" বুঝিয়েছেন। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী (৩১০ হি) বলেন:

وعنى بقوله: (أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ) أن اعملوا به على ما شرع لكم وفرض، كما قد بينا فيما مضى قبل في قوله:(أَقِيمُوا الصَّلاةَ). وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. .... عن السديّ، في قوله:(أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ) قال: اعملوا به.

"'দীন প্রতিষ্ঠা কর' কথাটির অর্থ হলো 'দীন পালন কর' বা 'দীন অনুসারে কর্ম কর, যেভাবে তোমাদের জন্য তা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে এবং ফরয করা হয়েছে', যেমনটি আমরা ইতোপূর্বে 'সালাত প্রতিষ্ঠা কর' কথাটির অর্থ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। পূর্ববর্তী (সাহাবী-তাবিয়ী-তাবি-তাবিয়ী যুগের) মুফাস্সিরগণ এরূপ ব্যাখ্যাই করেছেন। .... তাবিয়ী ইসমাঈল ইবনু আব্দুর রাহমান সুদ্দী (১২৮ হি) বলেন 'দীন প্রতিষ্ঠা কর' অর্থ দীন পালন কর।"[২১৫]

এ অর্থে তাবিয়ী মুজাহিদ ইবনু জাবর (১০৪ হি) বলেন:

لم يبعث نبي إلا أمر بإقامة الصلاة وايتاء الزكاة والإقرار بالله وطاعته، فهو إقامة الدين.

"আল্লাহ যত নবী প্রেরণ করেছেন সকলকেই সালাত কায়েম করতে, যাকাত প্রদান করতে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের স্বীকৃতি দিতে ও তাঁর আনুগত্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন, আর এ-ই হলো দীন প্রতিষ্ঠা করা।"[২১৬]

অন্য তাবিয়ী আবুল আলিয়া রুফাইয় ইবনু মিহরান (৯০ হি) বলেন:

إقامة الدين الأخلاص لله وعبادته

"দীন প্রতিষ্ঠা হলো আল্লাহর জন্য ইখলাস ও তাঁর ইবাদত করা।"[২১৭]

কোনো কোনো মুফাস্সির বলেন:

والمراد بإقامته: تعديل أركانه، وحفظه من أن يقع فيه زيغ، والمواظبة عليه، والتشمير في القيام به.

"দীন প্রতিষ্ঠার অর্থ: তার রুকনগুলি যথাযথ পালন করা, তার মধ্যে বিকৃতির অনুপ্রবেশ থেকে তাকে সংরক্ষণ করা, দীন পালনে নিয়মানুবর্তী হওয়া এবং তা যথাযথ পালনের জন্য পূণউদ্দ্যোমী হওয়া।"[২১৮]

এভাবে অধিকাংশ সাহাবী-তাবিয়ী ও প্রাচীন মুফাস্সিরের মতানুসারে পরিপূর্ণ পালনই প্রতিষ্ঠা করা। যেমন সালাত প্রতিষ্ঠা করার অর্থ 'যেভাবে ফরয ও বিধিবদ্ধ করা হয়েছে সেভাবে তা আদায় করা'। আমরা দেখেছি যে, বিজন প্রান্তরের নির্জনবাসী 'আবিদ' বান্দার একাকী সালাত আদায়কেও হাদীসে "ইকামাতে সালাত" বলা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি তার জন্য যে ভাবে ফরয ও

বিধিবদ্ধ করা হয়েছে সেভাবে তা পালন করেছেন।

বস্তুত নিজের জীবনে দীনের পরিপূর্ণ পালন অর্থ নিজের জীবনে দীনকে প্রতিষ্ঠিত করা। অন্যের জীবনে দীন প্রতিষ্ঠা করা, অর্থাৎ অন্য কোনো মানুষকে পরিপূর্ণ দীনের মধ্যে আনয়ন করা মুমিনের আয়ত্বাধীন নয়; এক্ষেত্রে মুমিনের আয়ত্বাধীন হলো অন্যকে দীন পরিপূর্ণ পালনের আহ্বান জানানো। কেউ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলে তাকে জবরদস্তি করে তা পালন করানোর ক্ষমতা বা দায়িত্ব মুমিনের নেই।

উপরের আয়াতে উল্লেখিত চারজন রাসূল: নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আলাইহিমুস সালাম)-এর বিষয়ে কুরআনের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, তাঁদের মধ্যে নূহ, ইবরাহীম ও ঈসা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন নি বা রাষ্ট্র ও জিহাদ বিষয়ক কোনো দাওয়াত দেন নি। তাঁরা তাওহীদ, রিসালাত, ঈমান, নেক কর্ম, হালাল-হারাম ইত্যাদি বিষয়ক দাওয়াত দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের সমাজের অত্যন্ত অল্প মানুষ তাদের দাওয়াত গ্রহণ করেছিলেন। এতে তাঁদের দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অপূর্ণ থাকে নি। মূসা (আ) অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি তার জাতিকে জিহাদের দাওয়াত দেন। তার জাতি তা পালন করতে অস্বীকার করে। তখন তিনি আল্লাহর কাছে তাঁর নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে বলেন:

رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

"হে আমার প্রতিপালক, আমার নিজের ও আমার ভাইয়ের উপর ছাড়া আর কারো উপর আমার কর্তৃত্ব-মালিকানা নেই। সুতরাং তুমি আমাদের ও ফাসিক মানুষদের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দাও।"[২১৯]

এভাবে আমরা দেখছি যে, এ সকল নবী-রাসূল মূলত নিজের জীবনে দীন পালন এবং দীনের দাওয়াতের বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশ পালন করেই দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করেছেন। অন্যরা গ্রহণ না করায় বা সমাজে বা রাষ্ট্রে দীন ক্ষমতাবান না হওয়ায় তার দীন পালনের দায়িত্ব অপূর্ণ থাকে নি।

আমরা আরো দেখছি যে, অন্যরা গ্রহণ করুক অথবা না করুক তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া, অর্থাৎ নিজের জীবনে দীনের পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের পাশাপাশি অন্যদেরকে দীনের দাওয়াত দেওয়া দীন পালনেরই অংশ। এজন্য কোনো কোনো মুফাস্সির দীন প্রতিষ্ঠা বলতে দীন পালন ও দীনের দাওয়াত বুঝেছেন। হিজরী ৭ম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আলিম আব্দুল আযীয- ইয্য ইবনু আব্দুস সালাম (৬৬০ হি) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন:

(أَقِيمُواْ الدِّينَ) اعملوا به، أو ادعوا إليه

"দীন প্রতিষ্ঠা কর: অর্থাৎ দীন পালন কর অথব দীনের প্রতি আহ্বান কর।"[২২০]

কোনো কোনো মুফাস্সির দীন প্রতিষ্ঠা করা বলতে ঐক্যবদ্ধভাবে দীনকে আঁকড়ে ধরা বুঝিয়েছেন; কারণ এখানে বলা হয়েছে "দীন প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে দলাদলি করো না।" এথেকে বুঝা যায় যে, দীনের বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়াই দীন প্রতিষ্ঠা করা এবং দীনের বিষয়ে দলাদলি করার অর্থ দীন প্রতিষ্ঠা না করা। মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াকূব ফিরোযআবাদী (৮১৭ হি) তার সংকলিত "তানবীরুল মিকবাস" নামক তাফসীর গ্রন্থে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি বলেছেন:

(أَنْ أَقِيمُواْ الدين) أمر الله جملة الأنبياء أن أقيموا الدين: أن اتفقوا في الدين (وَلاَ تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ) لا تختلفوا في الدين

"'দীন প্রতিষ্ঠা কর': আল্লাহ সকল নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, দীন প্রতিষ্ঠা কর: অর্থাৎ দীনের বিষয়ে ঐকমত হও 'এবং তাতে দলাদলি করো না' অর্থাৎ দীনের বিষয়ে মতভেদ করো না।"[২২১]

ইমাম তাবারী ও অন্যান্য মুফাস্সির প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুফাস্সির কাতাদা ইবনু দিআমাহ (১১৫ হি) থেকেও অনুরূপ তাফসীর উদ্ধৃত করেছেন।[২২২] এ বিষয়ে আল্লামা ইবনু কাসীর (৭৭৪ হি) বলেন:

(أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ) أي: وصى الله تعالى جميع الأنبياء، عليهم السلام، بالائتلاف والجماعة، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف.

"দীন প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে দলাদলি করো না: অর্থাৎ মহান আল্লাহ সকল নবীকে (আলাইহিমুস সালাম) নির্দেশ দিয়েছেন ভালবাসা ও ঐক্যের এবং নিষেধ করেছেন দলাদলি ও মতভেদ থেকে।"[২২৩]

এখানে উল্লেখ্য যে, কুরআন কারীমে আর কোথাও "ইকামাতে দীন" বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয় নি। হাদীসে নববীতেও "ইকামতে দীন" কথাটি কোথাও কোনোভাবে ব্যবহৃত হয়েছে বলে জানা যায় না। ইসলামী ফিকহে "ইকামতে দীন" বলে কোনো পরিভাষা নেই। বাহ্যত এর কারণ হলো, দীন একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা। এর বহু দিক রয়েছে। প্রত্যেক দিকের জন্য পৃথক বিধান

রয়েছে। সকল বিষয়ের সামষ্টিক পালন, দাওয়াত ও ঐক্যবদ্ধতা দীনের ইকামত। প্রত্যেক বিষয়ের ইকামত বা পালন, দাওয়াত ও ঐক্যবদ্ধতা ইকামতে দীনের অংশ। প্রত্যেক বিষয়ের "ইকামত" বা পালন, দাওয়াত ও ঐক্যবদ্ধতার পৃথক বিধান রয়েছে। কাজেই "ইকামতে দীন" নামে কোনো পৃথক পরিভাষা বা বিধান প্রদান করা হয় নি।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখছি যে, মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে দীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। আর দীন প্রতিষ্ঠার অর্থ হলো নিজের জীবনে দীনকে প্রতিপালন করে প্রতিষ্ঠিত রাখা। পাশাপাশি অন্যদেরকে তা প্রতিষ্ঠিত রাখতে দাওয়াত দেওয়া এবং দীনের বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকাও ইকামতে দীন বা দীন প্রতিষ্ঠার অন্তর্ভুক্ত।

দীন ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা, যা বিশ্বাস, কর্ম, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিধান প্রদান করেছে। সকল বিধানই দীন এবং প্রত্যেকের নিজের জীবনে যে বিধান প্রযোজ্য তা আল্লাহর নির্দেশনা মত পালন করা দীন প্রতিষ্ঠার অংশ। পাশাপাশি দীনের সকল বিষয়ের দাওয়াত প্রদানও দীন প্রতিষ্ঠার অংশ।

তাওহীদ, ঈমান, সালাত, যাকাত, সিয়াম, পরিবার, হালাল-হারাম, বিচার-ব্যবস্থা, অর্থ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ইত্যাদি সকল বিষয় আল্লাহর নির্দেশ মত পালন করা, পালনের দাওয়াত দেওয়া ও পালনে ও দাওয়াতে ঐক্যবদ্ধ থাকা দীন প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দিক। দীনের যে কোনো বিষয় পালন ও দাওয়াতই দীন প্রতিষ্ঠার অংশ। যে মুমিন রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে রয়েছেন তার জন্য দীনের অন্যান্য বিধানের ন্যায় রাষ্ট্রীয় বিষয়ে দীনের বিধান পালন করা দীন প্রতিষ্ঠার অংশ। আর অন্যান্য মুমিনের জন্য এ বিষয়ে তাকে ও অন্যান্য সকলকে দাওয়াত দেওয়া দীন প্রতিষ্ঠার অংশ।

আমরা আগেই বলেছি, ইসলামে রাষ্ট্র ব্যবস্থার গুরুত্বের বিষয়ে দীন সম্পর্কে অভিজ্ঞ কোনো মুসলিমই দ্বিমত পোষণ করবেন না। তবে দীন অর্থ শুধু রাষ্ট্র বলে মনে করা, শুধু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে দীন প্রতিষ্ঠা বলে দাবি করা, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করলে বড় ফরয তরক হবে এবং অন্য কোনো ইবাদত কবুল হবে না ইত্যাদি চিন্তার কোনো শরীয়তসম্মত ভিত্তি নেই।

রাষ্ট্রক্ষমতার গুরুত্বের বিষয়ে জামাআতুল মুসলিমীন তাদের লিখনি ও বক্তব্যে যে সকল যুক্তি পেশ করতেন সেগুলির অন্যতম হলো, রাষ্ট্রব্যবস্থা না হলে দীনের অনেক বিধান পালন করা যায় না এবং একমাত্র রাষ্ট্র ক্ষমতা হাতে থাকলেই সমাজের সর্বস্তরে দীন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

তাদের এ কথার মধ্যে সত্যতা রয়েছে। রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ইসলামীকরণের গুরুত্ব বুঝাতে দীনী দাওয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেকেই এরূপ কথা বলেন। কিন্তু জামাআতুল মুসলিমীন এ কথাকে ভুল অর্থে ব্যবহার করতেন। এ যুক্তি দিয়ে তারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকে বড় ফরয বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করতেন। আমরা দেখেছি যে, কোনো ইবাদতকে কোনো যুক্তি দিয়ে বড় ফরয বলা যায় না, বরং এজন্য কুরআন-সুন্নাহের সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রয়োজন।

এ যুক্তি দিয়ে তারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য আরকানে ইসলাম, অন্যান্য 'ফরয আইন', ওয়াজিব বা ব্যক্তিজীবনের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত বর্জন করা বা হারাম-মাকরূহ কর্মে লিপ্ত হওয়ার বৈধতা প্রমাণ করতেন। এগুলি সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি ছাড়া কিছুই নয়।

আমরা কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের বক্তব্য থেকে দেখেছি যে, আরকানুল ইসলাম ও অন্যান্য ফরয-নফল ইবাদত পালনই মুমিনের জীবনের মূল উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রে বা বিজন প্রান্তরে, সমাজে বা একাকী, মুসলিম দেশে বা অমুসলিম দেশে সকল অবস্থায় ও স্থানে মুমিন ইবাদত-বন্দেগী পালন করবেন। জিহাদ ও রাষ্ট্রক্ষমতা ইবাদতের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা রক্ষার মাধ্যম বা উপকরণ। এরা বিষয়টিকে উল্টা করে বুঝেন। তারা বলেন, জিহাদ ও রাষ্ট্রক্ষমতাই মুমিন জীবনের মূল উদ্দেশ্য। আরকানুল ইসলাম ও অন্যান্য ইবাদত সবই জিহাদ ও রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও সংরক্ষণের উপকরণ মাত্র। এজন্য রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য সবই করা যায় বা সবই বাদ দেওয়া যায় বলে তারা দবি করতেন।

এছাড়া তারা বুঝাতেন যে, রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের আগে তাওহীদ, আহকাম, ইলম, আত্মশুদ্ধি ইত্যাদির পালন ও দাওয়াত গুরুত্বহীন। যারা এগুলির পালন ও দাওয়াতের মাধ্যমে দীন প্রতিষ্ঠার বা দীনের এদিকগুলি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতেন তাদেরকে দীন প্রতিষ্ঠার বিরোধী বলে গণ্য করতেন। একমাত্র রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণের প্রচেষ্টাকেই তারা দীন প্রতিষ্ঠা বলে মনে করতেন। তাদের এ সকল মতামত দীন, দীন প্রতিষ্ঠায় নবী-রাসূলগণের কর্মপদ্ধতি, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাত, মানবপ্রকৃতি ও ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে প্রগাঢ় অজ্ঞতার সাথে আবেগের সংমিশ্রণের ফল।

রাষ্ট্রক্ষমতার পরিবর্তন বা দখল কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডের উপর নির্ভর করে না। হাজার বছরের মুক্তিযুদ্ধ, সশস্ত্র সংগ্রাম, গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড, প্রচার ইত্যাদির মাধ্যমেও ক্ষমতার পরিবর্তন বা দখল অসম্ভব হতে পারে। দখল হলেও তা বেদখল হতে পারে। দীন প্রতিষ্ঠা বা দাওয়াতকে রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের অধীন বলে চিন্তা করা দীন প্রতিষ্ঠা ও দীনের বিজয় অর্জনের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক ও অবাস্তব চিন্তা।

রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা এবং এ ব্যবস্থার প্রয়োগে নিয়োজিত মানুষ- এ দুয়ের সমন্বয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত হয়। খিলাফাতে রাশিদার পরে ইসলামী ব্যবস্থা একইরূপ আছে, কিন্তু ব্যবস্থার প্রয়োগের মানুষের পরিবর্তন ঘটেছে। তাঁদের পরে আর কখনোই তাঁদের মত মানুষ আসবে না। এজন্যই বিভিন্ন হাদীসে বারংবার বলা হয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় "মন্দ" ও "ভাল" আসবে, তবে কখনোই প্রথম সময়ের মত হবে না।

আর খিলাফতে রাশিদার পর থেকে সকল মুসলিম সমাজের অবস্থা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে, কোনো সরকারই সমাজের পাপ, অনাচার ইত্যাদি দূর করে নি। রাষ্ট্র বা সরকার রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করেছে এবং ভাল বা মন্দভাবে আইনের প্রয়োগ করেছে। ইসলামী মূল্যবোধের বিকাশ, ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়ের নিষেধ, আল্লাহর পথে দাওয়াত ইত্যাদি মূলত আলিম-উলামা,

পীর-মাশাইখ ও দায়ীগণের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছে। "ভাল" ইসলামী রাষ্ট্র বড়জোর দাওয়াতের পরিবেশ রক্ষা করেছে। পক্ষান্তরে অনেক "খারাপ" ইসলামী রাষ্ট্র দাওয়াতকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

কাজেই রাষ্ট্র হলেই সব হয়ে যাবে অথবা রাষ্ট্র না হলে কিছুই হবে না- এরূপ চিন্তা মানব প্রকৃতি ও ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা-প্রসূত আবেগতাড়িত কথা। "মন্দ" বা "ভাল" উভয় অবস্থায় "দায়ী"-গণ দাওয়াত এগিয়ে নিবেন। দাওয়াতের মাধ্যমেই রাষ্ট্রীয় বিষয়ে জুলুম, অনাচার, অত্যাচার ও ইসলামী বিধান লঙ্ঘন দূর করতে এবং ভাল বা দাওয়াত-বান্ধব (Dawah-Friendly) সরকার লাভ করতে চেষ্টা করবেন।

অনুরূপভাবে রাষ্ট্রের অবিদ্যমানতায় বা বিচ্যুতিতে মুমিনের দীন ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা মুমিন পাপী হয় বলে চিন্তা করার কোনো শরীয়ত সম্মত ভিত্তি নেই। এ কথা বলা যায় যে, বিবাহ না করলে, সম্পদ না থাকলে বা ক্ষমতা না থাকলে দীনের অনেক বিধান পালন করা যায় না। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, বিবাহ করা, সম্পদ অর্জন করা বা ক্ষমতা লাভ করা সবচেয়ে বড় ফরয। অথবা বলা যায় না, যে মুমিন শরীয়ত সম্মত ওজরের কারনে বিবাহ করেন নি, সম্পদশালী হতে পারেন নি বা ক্ষমতাশালী হতে পারেন নি তিনি তার সাধ্যমত দীনের বিধানগুলি পালন করলেও তা কবুল হবে না বা তিনি পাপী বলে গণ্য হবেন।

যারা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে রয়েছেন তারা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করলে পাপী হবেন। যার সম্পদ আছে তার জন্য যাকাত দেওয়া যেমন ফরয, যার ক্ষমতা আছে তার জন্য ক্ষমতা আল্লাহর নির্দেশমত ব্যবহার করা, দুনীতি বন্ধ করা, অধিকার ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাও তেমানি ফরয। অন্যরা এ বিষয়ে দাওয়াত দেওয়ার পরেও সংশ্লিষ্টরা না মানলে তাদের পাপ থাকে না। কাজেই ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা, আবেগ বা দ্রুত ফলাফলের জন্য শরীয়ত নিষিদ্ধ কোনো কাজকে "বড় ফরয" পালনের অযুহাতে বৈধতা দেওয়ার সুযোগ নেই। এমনকি এ দায়িত্ব পালনের অযুহাতে কোনো সুন্নাত-মুসতাহাব কর্ম পরিত্যাগও মুমিনের দায়িত্ব নয়। সুন্নাতের ব্যতিক্রম পদ্ধতি অনুসরণও মুমিনের জন্য ক্ষতিকর।

৩. ১০. সমাজ পরিবর্তনে সাহাবী ও পরবর্তীদের কর্মধারা

সমাজ-পরিবর্তন, সংস্কার, রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ক সমকালীন গবেষণার ক্ষেত্রে প্রায় সকলেই একটি বিশেষ ভুলের মধ্যে নিপতিত হন। তা হলে, তারা শূন্য থেকে শুরুর বিষয়ে চিন্তা করেন। তারা ধারণা করেন যে, ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র বলতে কিছুই বিদ্যমান নেই; কাজেই আমাদেরকে শূন্য থেকে শুরু করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যেমন একটি কাফির সমাজে দাওয়াত দিয়ে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আমাদেরকেও তেমনি একটি কাফির সমাজকে পরিবর্তন করতে হবে। পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা বুঝেছি যে, এ সকল চিন্তার ভিত্তি আরেকটি ভুলের উপর, তা হলো পাপের কারণে মুসলিম ব্যক্তি, সমাজ রাষ্ট্রকে "অমুসলিম" বলে গণ্য করা। জেনে বা না-জেনে অসতর্কভাবে আমর এ ভুলের মধ্যে নিপতিত হই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামী দীন, সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিতরূপে আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন হাদীসে বারংবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, এ ব্যবস্থায় বিচ্যুতি আসবে, আবার কিছু ভাল হবে, আবার বিচ্যুতি আসবে। আবার কিছু ভাল হবে। কখনো হবে স্বৈরতান্ত্রিক রাজত্ব এবং কখনো হবে নুবুওয়াতের পদ্ধতিতে জনগণতান্ত্রিক খিলাফাত। এভাবেই চলতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। এ ব্যবস্থা একেবারে বিলীন হবে না, আবার খিলাফাতে রাশেদার মত পরিপূর্ণ ব্যবস্থাও আর আসবে না।

কাজেই বর্তমান সমাজগুলিকে মক্কার কাফির সমাজের মত কল্পনা করার কোনো সুযোগ নেই। বরং এ সকল সমাজ উমাইয়া, আব্বাসী, ফাতিমী, বাতিনী, কারামিতী, মোগল, তাতার ও অন্যান্য রাষ্ট্র ও সমাজের মত। এক্ষেত্রে দীনী দাওয়াত, পরিবর্তন বা সংস্কারের জন্য আমাদেরকে পূর্ববর্তী সমাজ ও রাষ্ট্রগুলিতে সাহাবী-তাবিয়ী ও পরবর্তী আলিমগণের কর্মধারা পর্যালোচনা করতে হবে। কুরআন-হাদীসের নির্দেশনার আলোকে এবং তাঁদের কর্মধারার ভিত্তিতে আমাদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

৩. ১০. ১. মুসলিম সমাজে রাষ্ট্র সংস্কারে হাদীসের নির্দেশনা

আমরা দেখেছি যে, সমকালীন মুসলিম রাষ্ট্রগুলি উমাইয়া, আব্বাসী, ফাতিমী, বাতিনী ইত্যাদি মুসলিম রাষ্ট্রের মতই পাপে লিপ্ত মুসলিম রাষ্ট্র। এ সকল রাষ্ট্রে দীনের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় রাষ্ট্রীয় পাপ, অনাচার, অবিচার ও ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আপত্তি ও প্রতিবাদ করা এবং এগুলো দূর করার দাওয়াত দেওয়া দীন প্রতিষ্ঠার অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাশাপাশি এ সকল রাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিকের জন্য রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বজায় রাখা ও আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখাও দীন প্রতিষ্ঠার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়ে অনেক নির্দেশনা দিয়েছেন। ইতোপূর্বে আনুগত্য, জামা'আত, বাই'আত ইত্যাদি প্রসঙ্গে এ বিষয়ক কয়েকটি হাদীস আমরা উল্লেখ করেছি। আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

(১) "কেউ তার শাসক বা প্রশাসক থেকে কোন অপছন্দনীয় বিষয় দেখলে তাকে ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে। কারণ যদি কেউ জামা'আত (মুসলিম সমাজ বা রাষ্টের ঐক্য)-এর বাইরে এক বিঘতও বের হয়ে যায় এবং এ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তাহলে সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।"

(২) "যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে বের হয়ে এবং ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করল সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।"

(৩) "যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য থেকে নিজেকে বের করে নিল কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হলে সে নিজের জন্য কোন ওজর পেশ করতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল যে, তার গলায় কোন 'বাই'আত' বা রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের অঙ্গীকার নেই সে ব্যক্তি জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।"

(৪) "অচিরেই তোমাদের উপর অনেক শাসক-প্রশাসক আসবে যারা ন্যায় ও অন্যায় উভয় প্রকারের কাজ করবে। যে ব্যক্তি তাদের অন্যায়কে ঘৃণা করবে সে অন্যায়ের অপরাধ থেকে মুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি আপত্তি করবে সে (আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে)

নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু যে এ সকল অন্যায় কাজ মেনে নেবে বা তাদের অনুসরণ করবে (সে বাঁচতে পারবে না।)" সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বলেন, "না, যতক্ষণ তারা সালাত আদায় করবে।"

(৫) "হুশিয়ার থাকবে! তোমাদের কারো উপরে যদি কোনো শাসক-প্রশাসক নিযুক্ত হন এবং সে দেখতে পায় যে, উক্ত শাসক-প্রশাসক আল্লাহর অবাধ্যতার কোনো কাজে লিপ্ত হচ্ছেন, তবে সে যেন আল্লাহর অবাধ্যতার উক্ত কর্মকে ঘৃণা করে, কিন্তু আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে না নেয়।"

(৬) "যখন তোমরা তোমাদের শাসক-প্রশাসকগণ থেকে এমন কিছু দেখবে যা তোমরা অপছন্দ কর, তখন তোমরা তার কর্মকে অপছন্দ করবে, কিন্তু তার আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিবে না।"

(৭) "ভবিষ্যতে অনেক বিচ্যুতি-অন্যায় সংঘটিত হবে। যদি এমন ঘটে যে, এ উম্মাতের ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় কেউ এসে সে ঐক্য বিনষ্ট করে বিভক্তি সৃষ্টি করতে চায় তবে সে যেই হোক না কেন তোমরা তাকে তরবারী দিয়ে আঘাত করবে। অন্য বর্ণনায়: তোমাদের বিষয়টি একব্যক্তির বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় (একজন্য রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনে থাকা অবস্থায়) কোনো একব্যক্তি যদি এসে তোমাদের ঐক্য বিনষ্ট করতে বা 'জামাআত' বিভক্ত করতে চায় তবে তাকে হত্যা করবে।"

(৮) "যদি দুজন খলীফার বাইয়াত করা হয় তবে যে পরে বাইয়াত নিয়েছে তাকে হত্যা করবে।"

(৯) আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وكَرِهَ إِلا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ

"মুসলিমের দায়িত্ব রাষ্ট্রের আনুগত্য করা, তার পছন্দনীয়-অপছন্দনীয় সকল বিষয়ে, যতক্ষণ না কোনো পাপের নির্দেশ দেওয়া হয়। যদি কোনো পাপের নির্দেশ দেওয়া হয় তবে সে বিষয়ে কোনো আনুগত্য নেই।"[২২৪]

(১০) অন্য হাদীসে উবাদা ইবনুস সামিত বলেন:

بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لائِمٍ (في لفظ: وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ)

"আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাইয়াত করলাম যে, আমরা কষ্টে ও আরামে, উদ্দীপনায় ও আপত্তিতে এবং আমাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হলেও রাষ্ট্রের আনুগত্য করব, রাষ্ট্রের দায়িত্বপ্রাপ্তদের থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব না এবং আল্লাহর বিষয়ে কারো নিন্দা-আপত্তির ভয়-তোয়াক্কা না করে যেখানেই থাকি না কেন হক্ক কথা বলব। অন্য বর্ণনায়: আমরা ক্ষমতাপ্রাপ্তদের থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করব না, তবে তিনি বলেন: তোমরা যদি সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাতীত কুফর দেখতে পাও, যে বিষয়ে তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে (তবে সেক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্তরা তাদের এ অধিকার হারাবে)।"[২২৫]

(১১) হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান বলেন,

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَيْفَ قَالَ يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ

"আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা মন্দ অবস্থায় ছিলাম, এরপর আল্লাহ ভাল অবস্থা প্রদান করলেন, যার মধ্যে আমরা এখন রয়েছি। এরপর কি আবার মন্দ রয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সে মন্দের পরে কি আবার ভাল রয়েছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ। আমি বললাম, সে ভালর পরে কি আবার মন্দ রয়েছে? তিনি বলেন: হ্যাঁ। আমি বললাম, তা কেমন? তিনি বলেন, আমার পরে এমন অনেক শাসক হবে যারা আমার আদর্শ গ্রহণ করবে না এবং আমার রীতি পালন করবে না। তাদের মধ্যে এমন অনেক মানুষ থাকবে যাদের অন্তর হলো মানব দেহের মধ্যে শয়তানের অন্তর। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, আমি যদি এরূপ অবস্থায় পড়ি তাহলে কী করব? তিনি বলেন: তুমি শাসকের কথা শুনবে ও আনুগত্য করবে, যদিও তোমার পৃষ্ঠদেশে আঘাত করা হয় এবং তোমার সম্পদ কেড়ে নেয়া হয় তবুও তুমি কথা শুনবে ও আনুগত্য করবে।"[২২৬]

(১২) আবূ যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেন:

كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ

"যখন তোমার উপর এমন শাসক-প্রশাসকগণ থাকবে যারা সালাতকে তার সময়ের পরে আদায় করবে বা সালাতকে তার সময়ের পরে নিয়ে হত্যা করবে তখন তোমার কী অবস্থা হবে? আমি বললাম, আপনি আমাকে এমতাবস্থায় কী করতে নির্দেশ দেন? তিনি বলেন: তুমি ওয়াক্ত অনুসারে সালাত আদায় করবে। এরপর যদি তাদের সাথে সালাত পাও তাহলে তাদের সাথে তা আদায় করবে; আর তা তোমার জন্য নফল বলে গণ্য হবে।"[২২৭]

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, শাসক-প্রশাসকগণ যদি জাগতিক বা ধর্মীয় অপছন্দনীয় ও অন্যায় কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হন তবে তাদের অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা, আপত্তি ও প্রতিবাদ সহ তাদের আনুগত্য ও সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। এ বিষয়ে আরো অনেক হাদীস হাদীসগ্রন্থগুলি সংকলিত রয়েছে। সহীহ মুসলিমের "কিতাবুল ইমারাত" পাঠ করলে পাঠক এ বিষয়ক আরো অনেক হাদীস জানতে পারবেন। মূলত এ সকল হাদীস এ বিষয়ক কুরআনী নির্দেশনার ব্যাখ্যা। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا

"হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, এবং আনুগত্য করা রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোনো বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও; যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রেখে থাক। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।"[২২৮]

এ আয়াতে আল্লাহ তাঁর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর "উলিল আমর"-এর আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। আরবীতে "উলূ" বা "উলী" শব্দের অর্থ মালিকগণ বা অধিকারিগণ। আর "আমর" অর্থ আদেশ। "উলুল আমর" অর্থ আদেশের মালিকগণ।

"উলূল আমর" বা আদেশের মালিকগণ বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে সে বিষয়ে তিনটি মত রয়েছে: (১) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মালিকগণ, (২) আলিম ও ফকীহগণ ও (৩) সাহাবীগণ। নিঃসন্দেহে আলিমগণ ও সাহাবীগণের অনুসরণ ও আনুগত্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে "আদেশের মালিকানা" মূলত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারীদের; কারণ তারাই মূলত আদেশের মালিক, যাদের আদেশ পালন করতে সাধারণ মানুষ বাধ্য হয় এবং যাদের আদেশ পালন না করলে অশান্তির সৃষ্টি হয়। এজন্য ইমাম তাবারী বলেন:

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: هم الأمراء والولاة؛ لصحة الأخبار عن رسول الله ﷺ بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان [لله] طاعةً، وللمسلمين مصلحة

"সঠিক মত হলো, যে "উলুল আমর" বা আদেশের মালিকগণ বলতে রাষ্ট্রীয় শাসক-প্রশাসকগণকে বুঝানো হয়েছে। কারণ বিভিন্ন সহীহ হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে এবং মুসলিম সমাজের স্বার্থ সংরক্ষণে রাষ্ট্রপ্রধান, ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপ্রাপ্তদের আনুগত্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন।"[২২৯]

অর্থাৎ যারা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধিকারী বা মালিক তাদের নির্দেশ মান্য করা ও আনুগত্য করা মুমিনের দীনী দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের বিভিন্ন দিক উপরের হাদীসগুলিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইমাম তাবারী ও অন্যান্য মুফাস্সির, মুহাদ্দিস ও ফকীহ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ও এ প্রসঙ্গে উপরের হাদীসগুলি ও সমার্থক অন্যান্য হাদীস উল্লেখ করেছেন।

আমাদের সমাজে অনেকে মনে করেন, খিলাফতে রাশেদার মত "ইসলামী রাষ্ট্রের" ক্ষেত্রেই এ আয়াত ও এ সকল হাদীস প্রযোজ্য, আমাদের মত রাষ্ট্রে সেগুলি প্রযোজ্য নয়। ধারণাটি সঠিক নয়; কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ কোনো শর্ত আরোপ করেন নি।

বস্তুত এ হাদীসগুলি খিলাফাতে রাশেদার মত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বলা হয় নি। কারণ তাদের সময়ে শাসকগণ পাপ, অন্যায় বা ইসলাম বিরোধিতায় লিপ্ত হন নি। তাদের যুগে সালাত হত্যা করা হয় নি এবং মানুষের খোলসে শয়তানের অন্তর বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের আবির্ভাব হয় নি। এগুলি সবই পরবর্তী যুগের জন্য বলা হয়েছে। সাহাবীগণ ও পরবর্তী আলিমগণ উমাইয়া, আব্বাসী, ফাতিমী, বাতিনী, শিয়া, রাফিযী, মোগল, তাতার ও অন্যান্য সকল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই এ সকল নির্দেশ প্রযোজ্য বলে গণ্য করেছেন। আর সমকালীন মুসলিম দেশগুলি এ সকল রাষ্ট্রের চেয়ে ব্যতিক্রম কিছুই নয়। এ সকল রাষ্ট্রেও উপরের হাদীসগুলি ও সমার্থক হাদীসগুলির সামগ্রিক শিক্ষার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এ সকল হাদীসের আলোকে আমরা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা রাষ্ট্র-সংস্কারের বিষয়ে কয়েকটি মূলনীতি লাভ করি:

(১) রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রাখা

উপর্যুক্ত সকল হাদীসের নির্দেশনা যে, মুসলিম সমাজে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে এবং মুমিনকে অবশ্যই রাষ্ট্রীয় কাঠামোর

মধ্যে জীবনযাপন করতে হবে। এ সকল হাদীসের আলোকে আলিমগণ বলেছেন যে, মুসলিম সমাজে 'ইমাম নিয়োগ' বা 'খলীফা নিয়োগ' "ফরয কিফায়া"। এখানে ইমাম বা খলীফা বলতে রাষ্ট্রপ্রধান বুঝানো হয়েছে। এ রাষ্ট্রপ্রধানকে ইমাম, খলীফা, রাজা, সম্রাট, আমীরুল মুমিনীন, প্রেসিডেন্ট, রাষ্ট্রপতি ইত্যাদি যে নামেই আখ্যায়িত করা হোক না কেন, রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রাখা মুসলিম সমাজের উপর ফরয কিফায়া এবং রাষ্ট্রপ্রধান বা রাষ্ট্রের আনুগত্য করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয আইন।[২৩০]

(২) বাইয়াত, জামাআত ও তাআত

রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতীক। তার আনুগত্যের প্রতীক "বাইয়াত"। মুমিনকে রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের অঙ্গীকার বহন করতে হবে। সকল পরিস্থিতিতে "জামাআত" বা রাষ্ট্রীয় ঐক্য বজায় রাখতে হবে। রাষ্ট্রের নাগরিকগণ বা সংখ্যগারিষ্ট নাগরিক কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে বা মেনে নিলে নিজের ব্যক্তিগত, দলগত বা গোষ্ঠীগত মতামত বর্জন করে রাষ্ট্র ও সমাজের ঐক্য বজায় রাখতে হবে। বাইয়াত ও জামাআতের পাশাপাশি 'তা'আত' বা আনুগত্য বজায় রাখতে হবে। শাসক-প্রশাসকদের আনুগত্য ইসলাম নির্দেশিত দায়িত্ব। সরকারের জুলুম, অন্যায় বা পাপের কারণে আনুগত্যের এ দায়িত্ব রহিত হয় না। যে নির্দেশ বা আইন পাপ নয় তা মান্য করা মুমিনের দীনী দায়িত্ব।

(৩) পাপে ঐক্য বা আনুগত্য নেই

যে বিষয় কুরআন-হাদীস দ্বারা নিষিদ্ধ নয় এরূপ বিষয়েই ঐক্য ও আনুগত্যের বিধান। রাষ্ট্র যদি কোনো পাপের নির্দেশ দেয় তাহলে সে নির্দেশ মান্য করা বা সে বিষয়ে আনুগত্য করা মুমিনের জন্য নিষিদ্ধ। পাপের নির্দেশ মুমিন পালন করেন না। আবার পাপের নির্দেশের কারণে অন্যান্য সাধারণ বিধান ও আইন অমান্য করেন না।

(৪) ঘৃণা, আপত্তি বনাম স্বীকৃতি

রাষ্ট্র, রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার বা শাসক-প্রশাসকের পাপের ক্ষেত্রে মুমিনের দায়িত্ব ঘৃণা ও আপত্তি। শাসক-প্রশাসকদের পাপ দুপ্রকারের: তাদের জীবনের ব্যক্তিগত পাপ এবং পাপের নির্দেশনা বা পাপনির্ভর আইন, নীতি বা বিধান প্রণয়ন। সকল ক্ষেত্রে মুমিনের ন্যূনতম দায়িত্ব পাপকে ঘৃণা করা। এরপর মুমিন সাধ্যমত আপত্তি ও প্রতিবাদ করবেন। এরূপ পাপ মেনে নেওয়া, স্বীকৃতি দেওয়া, পাপের বিষয়ে তাদের অনুসরণ করা বা এর পক্ষে অবস্থান নেওয়া মুমিনের জন্য নিষিদ্ধ।

পাপের ঘৃণা, আপত্তি বা প্রতিবাদের অর্থ অন্যান্য বিষয়ে রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বজায় রেখে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলার মধ্যে ঘৃণা, আপত্তি ও প্রতিবাদ জানানো। অনেক সময় আবেগী মুমিন অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে যেয়ে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, শৃঙ্খলা ভঙ্গ, আইন অমান্য, আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া বা অনুরূপ অন্যায় ও পাপে লিপ্ত হয়। খারিজীগণ ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের নামে এরূপ অন্যায়ে লিপ্ত হতো। সাহাবীগণ তাদেরকে রাষ্ট্রীয় আনুগত্য ও আইন পালনের কথা বললে আপত্তি করত। এক ঘটনায় কতিপয় খারিজী হুযাইফা (রা)-কে বলে, আমরা কি ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করতে পারব না?! আপনি কি তা করবেন না?! তিনি বলেন:

أَلاَ إِنَّ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَحَسَنٌ وَلَكِنْ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَرْفَعَ السِّلاَحَ عَلَى إِمَامِكَ

"ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ নিঃসন্দেহে ভাল কাজ। তবে তোমার রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বা তার নির্দেশের বাইরে অস্ত্রধারণ, বলপ্রয়োগ বা বিদ্রোহ করা সুন্নাত সম্মত নয়।"[২৩১]

উপরের মূলনীতিগুলির আলোকে রাষ্ট্রীয় সংস্কারের বিষয়টি ভালভাবে উপলব্ধি করতে আমাদেরকে এ বিষয়ে সাহাবী-তাবিয়ী ও পরবর্তী যুগগুলির প্রসিদ্ধ আলিম, ইমাম, পীর-মাশাইখ ও সংস্কারকগণের কর্মধারা পর্যালোচনা করতে হবে। সেজন্য মহান আল্লাহর নিকট তাওফীক প্রাথনা করছি।

৩. ১০. ২. সাহাবী ও পরবর্তীদের কর্মধারা

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, খিলাফতে রাশিদার পর থেকে সকল ইসলামী রাষ্ট্রেই রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামী বিধিবিধানের কমবেশি লঙ্ঘন ঘটেছে। শাসক নির্বাচন ও রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের পরামর্শ গ্রহণ, জনগণের নিকট জবাবদিহিতা, মানবাধিকার, আমানত ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, নিরপেক্ষভাবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও আইন প্রয়োগ ইত্যাদি অগণিত ইসলামী নির্দেশনা কম বা বেশি লঙ্ঘিত হয়েছে এসকল রাষ্ট্রে। রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসকগণ নিজেদেরকেই আইন বা আইনদাতা বলে মনে করেছেন। কুরআনী বিধিবিধান ও আইনকে বেপরোয়াভাবে অবহেলা করেছেন। এমনকি সালাতের সময়ও পদ্ধতিও পরিবর্তন করা হয়েছে।

এ সকল পরিস্থিতিতে সাহাবীগণ কিভাবে সংস্কার, প্রতিবাদ ও দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করেছেন তা আমাদের গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কারণ কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা অনুধাবনে ও পালনে তাঁরা উম্মাতের অনুকরণীয় আদর্শ। মহান আল্লাহ বলেন:

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"মুহাজির ও আনসারদিগের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায়

তারা চিরস্থায়ী হবে। এ মহাসাফল্য।"[২৩২]

এখানে মুমিনগণকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে: (১) প্রথম অগ্রগামী মুহাজিরগণ ও আনসারগণ এবং (২) তাঁদের পরবর্তীগণ। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, প্রথম ভাগের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করেছেন। আর দ্বিতীয় ভাগের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের পূর্বশত প্রথম শ্রেণীর সাহাবীগণকে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করা।

এভাবে আমরা দেখছি যে, অগ্রগামী মুহাজির ও আনসারগণের অনুসরণ সফলতার মাপকাঠি। তাদের অনুসরণের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে ছিলেন তাদের সমসাময়িক অন্যান্য সাহাবী। এরপর তাবিয়ী-তাবি-তাবিয়ীগণ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাতকে তাঁর সাহাবীদের জীবন পদ্ধতি ও মতামতের উপর নির্ভর করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ

"তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। এক্ষেত্রে তোমাদের দায়িত্ব আমার সুন্নত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা। তোমরা দৃঢ়ভাবে তা আঁকড়ে ধরবে, কোনো প্রকারেই তার বাইরে যাবে না। আর তোমরা (আমার ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের বাইরে) নতুন উদ্ভাবিত সকল বিষয় সর্বতোভাবে পরিহার করবে; কারণ সকল নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদ'আত এবং সকল বিদ'আতই বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা।"[২৩৩]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরকে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে মতবিরোধ সম্পর্কে সতর্ক করেন। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন, এক্ষেত্রে কোন্ দল সঠিক বলে গণ্য হবে? তিনি বলেন:

مَا أَنَا عَلَيْهِ (الْيَوْمَ) وَأَصْحَابِي

"আমি এবং আমার সাহাবী-সঙ্গীরা বর্তমানে যে মত ও পথের উপর আছি সেই মত ও পথের উপর যারা থাকবে তারাই সুপথপ্রাপ্ত।"[২৩৪]

সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী- এ তিন প্রজন্মের মানুষদের ধার্মিকতার প্রশংসা করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। ইমরান ইবনু হুসাইয়িন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺবলেছেন:

خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي (الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ) ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ".

"আমার উম্মতের সবচেয়ে ভালো যুগ আমার যুগ, যে যুগের মানুষের মধ্যে আমি প্রেরিত হয়েছি (অর্থাৎ সাহাবীগণ), আর তাদের পরে সবচেয়ে ভালো তাদের পরবর্তী যুগের মানুষ (অর্থাৎ তাবিয়ীগন), আর এর পর তাদের পরবর্তী যুগের মানুষ (অর্থাৎ তাবি তাবিয়ীগণ)"।[২৩৫]

এ অর্থে আবূ হুরাইরা, বুরাইদা আসলামী, নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী থেকে পৃথক পৃথক সহীহ সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো হাদীসে সাহাবীগণের পরে তিন প্রজন্মের কথা বলা হয়েছে।[২৩৬]

এজন্য কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা সঠিক অনুধাবন ও বাস্তবায়নের জন্য আমাদেরকে সাহাবীগণের কর্মধারা এবং তৎপরবর্তী তিন প্রজন্মের কর্মধারা বিবেচনা করতে হবে।

উমাইয়া যুগে সাহাবীগণ রাষ্ট্র ও সরকারের এরূপ বিচ্যুতি প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু কখনোই তারা এ কারণে 'রাষ্ট্র' বা সরকারকে কাফির বা অনৈসলামিক বলে গণ্য করেন নি। বরং তাঁরা সাধ্যমত এদের অন্যায়ের আপত্তি জ্ঞাপন-সহ এদের আনুগত্য বহাল রেখেছেন। এদের পিছনে সালাত আদায় করেছেন এবং এদের নেতৃত্বে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন।

পরবর্তীকালেও কোনো ইমাম, ফকীহ বা আলিম এ কারণে এ সকল রাষ্ট্রকে 'দারুল হরব' বা 'কাফির রাষ্ট্র' বলে মনে করেন নি। তারা সাধ্যমত সংশোধন ও পরিবর্তনের চেষ্টা করেছেন। সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় আনুগত্য ও সংহতি বজায় রেখেছেন।[২৩৭] তাঁরা সর্বদা শান্তিপূর্ণ পন্থায় অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে উৎসাহ দিতেন এবং জিহাদ বা আদেশ-নিষেধের নামে অস্ত্রধারণ, আইন-লঙ্ঘন, রাষ্ট্রদ্রোহিতার উস্কানি ইত্যাদি নিষেধ করতেন। এ বিষয়ে তাঁদের অগণিত নির্দেশনা হাদীসগ্রন্থসমূহে সংকলিত হয়েছে।[২৩৮]

সাহাবী-তাবিয়ীগণের যুগে কখনো কখনো তাঁদের কেউ কেউ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, তবে তা রাষ্ট্রকে কাফির মনে করে বা "ইসলামী রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার জন্য নয় বরং অন্যান্য পারিপার্শিক কারণে তা ঘটেছে।

৩. ১০. ২. ১. যুদ্ধ বনাম সরকার পরিবর্তনের চেষ্টা

কুরআন-হাদীসের উপরে আলোচিত নির্দেশাবলির আলোকে সাহাবী-তবিয়ীগণ ও তৎপরবর্তী যুগের আলিমগণ সরকার পরিবর্তনের নামে বিদ্রোহ, আইন অমান্য, আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া ও রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বর্জন নিষিদ্ধ বলে গণ্য করতেন। সাধারণভাবে এ মূলনীতির বিষয়ে সকলে একমত হলেও, প্রথম যুগের কয়েকটি যুদ্ধ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এগুলি হলো, সাহাবীগণের যুগে আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে তালহা, যুবাইর, আয়েশা ও মুআবিয়া (رضي الله عنهم)-এর যুদ্ধ, ইয়াযিদের বিরুদ্ধে হুসাইন (রা)-এর যুদ্ধ এবং মারওয়ান ও আব্দুল মালিকের বিরুদ্ধে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা)–এর যুদ্ধ। তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণের যুগে আব্দুল মালিকের (খিলাফাত ৬৫-৮৬) বিরুদ্ধে আব্দুর রাহমান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল আস'আসের (৮৫ হি) বিদ্রোহে তাবিয়ী সাঈদ ইবনু জুবাইর (৯৪হি) ও অন্যান্য কতিপয় তাবিয়ীর অংশগ্রহণ, উমাইয়া খলীফাদের বিরুদ্ধে ইমাম হুসাইনের পৌত্র যাইদ ইবনু আলীর (১২২ হি) যুদ্ধ, এবং আব্বাসী খলীফা মানসূরের বিরুদ্ধে আলী (রা)-এর বংশধর, 'নাফস যাকিয়্যাহ' নামে পরিচিত প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ (৯২-১৪৭ হি)-এর বিদ্রোহ।

লক্ষণীয় যে, সাহাবীগণের যুগের যুদ্ধগুলি কোনোটিই "সরকার পরিবর্তনের জন্য" বিদ্রোহ ছিল না এবং তারা "সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বা কর্তৃত্বের স্বীকৃতি দেওয়ার" পরে সরকার পরিবর্তনের জন্য বিদ্রোহ বা যুদ্ধ করেন নি। মূলত এগুলি ছিল সরকারের কর্তৃত্ব স্বীকারের আগে তার কাছে শরীয়ত নির্দেশিত দাবি-দাওয়া পেশ করতে যেয়ে অনিচ্ছাকৃত যুদ্ধ, অথবা দুপক্ষেরই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের দাবির কারণে।

আলী (রা)-এর সাথে তালহা, যুবাইর, আয়েশা ও মুআবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর যুদ্ধ ছিল উসমান (রা)–এ হত্যাকারীদের বিচারের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে। আমরা খারিজী সম্প্রদায়ের আলোচনায় বিষয়টি উল্লেখ করেছি। হাদীস ও ইতিহাসের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, আলীর বিরোধীরা সরকার অপসারণ বা ক্ষমতা দখলের জন্য যুদ্ধ করেন নি। উপরন্তু উভয় পক্ষ যুদ্ধ বর্জনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, এ সকল যুদ্ধের সময়ে বিবাদমান পক্ষগুলি শান্তি আলোচনা করে তা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু অতর্কিতে উভয় শিবিরের উপর হামলা শুরু হয়। উভয় পক্ষই মনে করেন যে, অপরপক্ষ বিশ্বাসঘাতকতা করে আক্রমন করেছে। এতে প্রকৃত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ঐতিহাসিকগণ এ সকল যুদ্ধের মধ্যে ইহূদীদের ষড়যন্ত্র ও দ্বিতীয় প্রজন্মের মুসলিমদের আবেগ ও হটকারিতার কথা উল্লেখ করেছেন। এ সকল কারণে তৎকালীন পরিবেশে তারা যুদ্ধ এড়াতে সক্ষম হন নি।

ইয়াযিদের বিরুদ্ধে হুসাইন (রা) যুদ্ধাভিযান চালান নি। মুআবিয়া (রা) তাঁর মৃত্যুর পূর্বে রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দের পরামর্শক্রমে তাঁর পুত্র ইয়াযিদকে পরবর্তী শাসক হিসেবে মনোনয়ন দেন। ৬০ হিজরী সালে তাঁর মৃত্যুর পরে ইয়াযিদ খিলাফতের দাবি করলে তৎকালীন মুসলিম রাষ্ট্রের অধিকাংশ এলাকার মানুষ তা মেনে নেন। পক্ষান্তরে মদীনার অনেক মানুষ, ইরাকের মানুষ এবং বিশেষত কুফার মানুষেরা তা মানতে অস্বীকার করেন। কুফার মানুষেরা ইমাম হুসাইনকে (রা) খলীফা হিসেবে গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ সময়ে ইমাম হুসাইন (রা) মদীনায় অবস্থান করছিলেন। এরপর তিনি মদীনা থেকে মক্কায় আগমন করেন। কুফার লক্ষাধিক মানুষ তাঁকে খলীফা হিসাবে বাইয়াত করে পত্র প্রেরণ করে। তারা দাবি করে যে, সুন্নাত পুনরুজ্জীবিত করতে ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে অবিলম্বে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করা প্রয়োজন। মদীনা ও মক্কায় অবস্থানরত সাহাবীগণ ও ইমাম হুসাইনের প্রিয়জনেরা তাকে কুফায় যেতে নিষেধ করেন। তাঁরা আশঙ্কা করছিলেন যে, ইয়াযিদের পক্ষ থেকে বাধা আসলে ইরাকবাসীরা হুসাইনের পিছন থেকে সরে যাবে। সবশেষে হুসাইন (রা) কুফা গমনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি কোনো সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করেন নি। তিনি তাঁর পরিবারের ১৯ জন সদস্যসহ প্রায় ৫০ জন সঙ্গী নিয়ে কুফায় রওয়ানা হন। তিনি কুফাবাসীর বাইয়াতের ভিত্তিতে বৈধ শাসক ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে কুফা যাচ্ছিলেন।

ইমাম হুসাইনের আগমনের আগেই ইয়াযিদের বাহিনী কুফায় আগমন করে এবং কুফাবাসী হুসাইনের সমর্থন থেকে পিছিয়ে যায়। কুফার একটি বাহিনী কারবালার প্রান্তরে হুসাইনকে (রা) অবরোধ করে। হুসাইন (রা) তাদেরকে বলেন, আমি তো যুদ্ধ করতে আসি নি। তোমরা আমাকে ডেকেছ বলেই আমি এসেছি। এখন তোমরা কুফাবাসীরাই তোমাদের বাইয়াত ও প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করেছ। তাহলে আমাদেরকে ছেড়ে দাও আমরা মদীনায় ফিরে যাই, অথবা সীমান্তে যেয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি, অথবা সরাসরি ইয়াযিদের কাছে যেয়ে তার সাথে বুঝাপড়া করি। কিন্তু কুফার বাহিনী এতে সম্মত না হয়ে তারা হুসাইনের পরিবার ও সাথীদের উপর হামলা চালায় ও তাঁকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করে।

৬৪ হিজরী সালে ইয়াযিদের মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পরে মক্কায় আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা) নিজেকে খলীফা হিসেবে ঘোষণা দেন। অধিকাংশ মুসলিম তাঁর বাইয়াত গ্রহণ করেন। ৭৩ হিজরী পর্যন্ত প্রায় ১০ বৎসর তিনি এভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এ সময়ে ইয়াযিদের পরে তার পুত্র মুআবিয়া কয়েক দিনের জন্য এবং তারপর মারওয়ান ইবনু হাকাম এক বৎসর সিরিয়ায় শাসক হিসেবে বাইয়াত গ্রহণ করেন। ৬৫ সালে মারওয়ানের মৃত্যুর পরে তার পুত্র আব্দুল মালিক ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এ সময়ে ক্ষমতার উভয় দাবিদারের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। একপর্যায়ে ৭৩ হিজরীতে আব্দুল মালিকের বাহিনী আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরকে পরাজিত ও নিহত করতে সক্ষম হয়।

এভাবে আমরা দেখছি যে, ইমাম হুসাইন (রা) ও আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা)-এর সময়ে মুসলিম সমাজ দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়।

তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণের যুগের যুদ্ধগুলিও কোনো সুপরিকল্পিত বিদ্রোহ বা 'ধর্মদ্রোহিতার প্রতিবাদে দীন প্রতিষ্ঠার' চেষ্টা

ছিল ন। কখনো পরিবেশ পরিস্থিতির চাপে, কখনো শাসকের অত্যাচারে হয়ে বাধ্য হয়ে এবং কখনো রাষ্ট্রক্ষমতায় নিজের অধিকারকে বৈধ মনে করে এ সকল যুদ্ধ হয়েছে। এগুলিতে অতি সামান্য সংখ্যক প্রসিদ্ধ আলিম জড়িত হয়েছেন বা সমর্থন করেছেন। তারা তা করেছেন ব্যক্তিগত সম্পর্ক, আন্তরিকতা বা ব্যক্তিগত ইজতিহাদের কারণে। কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও অধিকাংশ সাহাবী-তাবিয়ীর মত ও কর্মের বিপরীতে এগুলিকে দীনের প্রামাণ্য দলীল হিসেবে গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই।

এখানে কয়েকটি বিষয় আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার:

প্রথমত, মুসলিম উম্মাহর ইমাম ও ফকীহগণ বারংবার উল্লেখ করেছেন যে, কোনো বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাতের সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকলে সে বিষয়ে কোনো আলিম বা বুজুর্গের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত বা ইজতিহাদ আর প্রামাণ্য দলীল হিসেবে গণ্য হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে আলিম-বুজুর্গের কর্ম তাঁদের ব্যক্তিগত ইজতিহাদ হিসেবে গণ্য হয়, ভুল হলে তা অনিচ্ছাকৃত ইজতিহাদী ভুল বলে গণ্য হয় এবং কুরআন বা হাদীসের মূল নির্দেশনার উপর নির্ভর করতে হয়। এ বিষয়ে আমি **"এহইয়াউস সুনান"** গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[২৩৯]

দ্বিতীয়ত, সাহাবী-তাবিয়ীগণের কর্মের ক্ষেত্রে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কোনো মত বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তবে তার বিপরীতে কতিপয় ব্যক্তির মত বা সিদ্ধান্ত প্রামাণ্য দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয় না। সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরোধিতার কারণে তাঁদেরকে দায়ী করা হয় না, কারণ মুজতাহিদের অধিকার আছে নিজের ইজতিহাদের ভিত্তিতে কর্ম করার। কিন্তু পরবর্তীগণের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের মতটিই প্রামাণ্য বলে গণ্য।

তৃতীয়ত, কোনো বিষয়ে যদি বৈধতা ও নিষিদ্ধতা দুটি বিষয়ের সম্ভাবনা থাকে তাহলে নিষিদ্ধতার পাল্লাকে ভারি করা হয়। কারণ ইসলামের মূলনীতি অনুসারে বৈধ বা জায়েয কর্ম পালন করার চেয়ে নিষিদ্ধ বা হারাম কর্ম বর্জন করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

রাষ্ট্রীয় অন্যায়ের প্রতিবাদে আবেগী হয়ে রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বর্জন, আইন অমান্য বা বিদ্রোহ একদিকে যেমন কুরআন-সুন্নাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ, তেমনি তাতে অকারণ রক্তপাত ও উম্মাতের জানমালের ক্ষতি ছাড়া দীনের কোনোরূপ লাভ হয় না। এজন্য তাবিয়ীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর ইমাম ও ফকীহগণ এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বিষয়টিকে ইসলামী আকীদার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ (রাহিমাহুমুল্লাহ) ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদার মূলনীতি ব্যাখ্যা করে ইমাম আবু জাফর তাহাবী (৩২১ হি) বলেন:

نَرَى الصَّلاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وعَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ. وَلا نُنَزِّلُ أَحَدًا مِنْهُمْ جَنَّةً وَلا نَارًا، وَلا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلا بِشِرْكٍ وَلا بِنِفَاقٍ، مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَنَذَرُ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. وَلا نَرَى السَّيْفَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِلا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ. وَلا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَوُلاةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا، وَلا نَدْعُو عَلَيْهِمْ، وَلا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ، وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ فَرِيضَةً، مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ، وَنَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلاحِ وَالْمُعَافَاةِ. ... وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ مَاضِيَانِ مَعَ أُولِي الأَمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، لا يُبْطِلُهُمَا شَيْءٌ وَلا يَنْقُضُهُمَا.

"আমরা কেবলাপন্থী সকল নেককার ও বদকার মুসলিমের পিছনে সালাত আদায় করা এবং তাদের মৃত ব্যক্তির জন্য জানাযার সালাত আদায় করা বৈধ মনে করি। আমরা তাদের কাউকে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলে নিশ্চিত সাক্ষ্য প্রদান করি না। তাদের কারো উপর কুফরী, শিরক বা নিফাকের সাক্ষ্য প্রদান করি না, যতক্ষণ না এরূপ কিছু তাদের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে দেখা দিবে। তাদের আভ্যন্তরীন বিষয়াদি আমরা আল্লাহ তা'আলার উপর ছেড়ে দিই। উম্মতে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর কোনো লোকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ (জিহাদ, হত্যা বা শক্তিপ্রয়োগ) আমরা বৈধ মনে করি না, তবে যদি (রাষ্ট্রীয় বিচার বা জিহাদের মাধ্যমে) কারো বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার অত্যাবশ্যকীয় হয়ে যায় তাহলে ভিন্ন কথা। আমাদের রাষ্ট্রপ্রধানগণ ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপ্রাপ্তগণ অত্যাচার করলেও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বৈধ মনে করি না। আমরা তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া বা অভিশাপ প্রদান করি না এবং তাদের আনুগত্যও বর্জন করি না। আমরা তাদের আনুগত্যকে আল্লাহর আনুগত্যের অংশ হিসেবে ফরয মনে করি যতক্ষণ না তারা কোনো পাপ কর্মের নির্দেশ দেয়। আর তাদের সংশোধন ও সংরক্ষণের জন্য দু'আ করি। ... মুসলিম শাসক- সে নেককার হোক আর পাপী-বদকার হোক- তার অধীনে হজ্জ্ব এবং জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কোনো কিছুই এ দুটিকে বাতিল বা ব্যাহত করবে না।"[২৪০]

৩. ১০. ২. ২. আনুগত্যসহ নসীহত ও দাওয়াত

কুরআন-সুন্নাহর উপর্যুক্ত নির্দেশাবলির আলোকে সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারী মূলধারার আলিমগণ মূলত সরকার পরিবর্তনের চেয়ে সরকার সংশোধনের চেষ্টা করেছেন। সরকারের বা প্রশাসনের অন্যায়, অনাচার, কুরআন-সুন্নাহের বিরোধিতা বা ইসলাম বিরোধী আকীদা-বিশ্বাস ও আইন-কানুনের প্রতিবাদে তাঁরা রাষ্ট্রের আনুগত্য বজায় রেখে সরকারকে নসীহত, ওয়ায ও দাওয়াত দিতেন এবং জনগণকেও সচেতন করতেন। তবে বিদ্রোহ, হটকারিতা, বলপ্রয়োগ ও রক্তপাত কঠোরভাবে নিষেধ করতেন।

আমরা আগেই বলেছি যে, উমাইয়া যুগ থেকেই বিচ্যুতি শুরু হয়। আর কখনো কখনো এ বিচ্যুতি ছিল ভয়াবহ। ইয়াযিদের যুগ বা ৬০ হিজরী থেকে পরবর্তী প্রায় ৫০ বৎসর বেশ কিছু সংখ্যক সাহাবী জীবিত ছিলেন। তাঁরা এ সকল বিচ্যুতি প্রত্যক্ষ করেছেন। সাধ্য ও সুযোগমত প্রতিবাদ করেছেন, নসীহত করেছেন, কিন্তু আবেগতাড়িত হন নি।

সাহাবীগণের কয়েকটি সুপরিচিত ঘটনা উল্লেখ করে আমরা পরবর্তী যুগসমূহের কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করব। তারিক ইবনু শিহাব বলেন:

أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ

"প্রথম যে ব্যক্তি সালাতুল ঈদের খুতবা সালাতের আগে নিয়ে আসে সে মারওয়ান ইবনুল হাকাম। তখন এক ব্যক্তি তার দিকে দাঁড়িয়ে বলে, খুতবার আগে সালাত। মারওয়ান বলেন: তৎকালীন নিয়ম পরিত্যক্ত হয়েছে। তখন আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, এ ব্যক্তি তার দায়িত্ব পালন করেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: 'তোমাদের কেউ যদি কোন অন্যায় দেখতে পায় তবে সে যেন তা তার বাহুবল দিয়ে পরিবর্তন করে। যদি তাতে সক্ষম না হয় তবে সে যেন তার বক্তব্য দিয়ে তা পবিবর্তন করে। এতেও যদি সক্ষম না হয় তাহলে সে যেন তার অন্তর দিয়ে তা পরিবর্তন (কামনা) করে, আর এ হলো ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়।'"[২৪১]

উমাইয়া প্রশাসক ওয়ালীদ ইবনু উকবা মদপান করতেন। তিনি একদিন মাতাল অবস্থায় ফজরের সালাতে ইমামতি করেন। তার পিছনে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) জামাতে শরীক ছিলেন। ওয়ালীদ মাতাল অবস্থায় থাকার কারণে ফজরের সালাত চার রাকআত আদায় করেন এবং সালাম ফিরিয়ে বলেন: কম হলো কি? আরও লাগবে? তখন মুসল্লীগণ বলেন আজ সকালে তো আপনি বেশি বেশিই দিচ্ছেন (আপনি ইতোমধ্যেই দু রাকআত বেশি দিয়েছেন! আর লাগবে না!!)।"[২৪২]

উমাইয়া যুগের এক বিদ্রোহী রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন মুখতার সাকাফী (১-৬৭ হি)। ৬৪ হিজরীতে ইয়াযিদের মৃত্যুর পরে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের পক্ষ থেকে তিনি কুফার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কুফায় প্রবেশের পর তিনি নিজেকে আলী (রা)-এর পুত্র মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যার খলীফা বলে দাবি করেন এবং ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপর হন। হুসাইনের হত্যায় জড়িত সকলকেই তিনি হত্যা করেন। এভাবে তিনি কূফা ও পার্শবর্তী এলাকার শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি দাবি করেন যে, জিবরাঈল (আ) তার কাছে ওহী নিয়ে আগমন করেন। তিনি ধর্মদ্রোহিতা, বিভ্রান্তি ও কুফরী মতামতের অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলেন। ৬৭ হিজরীতে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের বাহিনী তাকে পরাজিত ও হত্যা করে।

সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) এ ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের সাধারণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন।[২৪৩]

ইমাম বুখারী তাঁর আত-তারীখুল কাবীর গ্রন্থে তাবিয়ী আব্দুল কারীম বাক্কা থেকে উদ্ধৃত করেছেন, "আমি দশজন সাহাবীর সঙ্গ পেয়েছি যারা পাপী-জালিম শাসক-প্রশাসকদের পিছনে সালাত আদায় করতেন।"[২৪৪]

সাহাবীগণের পরবর্তী যুগগুলির মধ্যে সরকারের ইসলাম বিরোধিতার সবচেয়ে খারাপ অবস্থাগুলির অন্যতম (১) আব্বাসী খলীফা মামুন, মু'তাসিম ও ওয়াসিকের সময়ে কুরআনের কিছু বিষয় অস্বীকার করার ও কুরআনকে মাখলূক বলার 'কুফরী মতবাদ' প্রতিষ্ঠা এবং (২) মোগল বাদশাহ আকবারের সময়ে "দীন-ই- ইলাহী" প্রতিষ্ঠা। এ দুটি ঘটনার মুকাবিলায় ও ঈমান-আকীদা সংরক্ষণে আলিমগণের পদক্ষেপ আমরা আলোচনা করব।

ক. আব্বাসী শাসকদের কুফরী মতবাদের প্রতিবাদে ইমাম আহমদ

তৃতীয় হিজরী শতকের শুরুতে আব্বাসী খলীফা মামুন (রাজত্ব ১৯৮-২১৮ হি) মুতাযিলী ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করেন এবং একে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন। গ্রীক দর্শনের ভিত্তিকে কুরআনের নির্দেশনা ব্যাখ্যা করে এ মতবাদ তৈরি করা হয়। এ মতবাদে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের সাথে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক বিভিন্ন বিশ্বাস কয়েছে। এ সকল বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে "কুরআন আল্লাহর সৃষ্ট বা মাখলূক"। এছাড়া এ মতবাদে জান্নাতে আল্লাহর দর্শন অস্বীকার করা হয়, যদিও কুরআনে সুস্পষ্টত বলা হয়েছে যে, জান্নাতে মুমিনগণ আল্লাহর দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করবেন।

খলীফা মামুন রাষ্ট্রের সকলকে এ বিশ্বাস গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। ইমাম আহমদ ও আহলুস সুন্নতের আলিমগণ ঘোষণা দেন যে, কুরআন আল্লাহর কালাম এবং তাঁরই সিফাতের অংশ। আল্লাহর কোনো সিফাত বা বিশেষণ সৃষ্ট হতে পারে না। কাজেই কুরআনকে মাখলূক বা সৃষ্টবস্তু বলে বিশ্বাস করা কুফ্রী। অনরূপভাবে জান্নাতে আল্লাহর দর্শন অস্বীকার করলে কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত অস্বীকার করা হয়, এজন্য এরূপ বিশ্বাস কুফ্রী।

এ মত প্রতিষ্ঠায় মামুন ছিলেন অনমনীয়। এ মত গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী আলিমদেরকে গ্রেফতার করে তিনি অবর্ণনীয়

অত্যাচার করতে থাকেন। অত্যাচারের মুখে যারা মুতাযিলী মতবাদ মেনে নিত তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হতো। অন্যদেরকে আটক রেখে অত্যাচার চালানো হতো এবং কাউকে কাউকে নির্মমভাবে হত্যা করা হতো। মামুনের পরে পরবর্তী খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ (২১৮-২২৭ হি) ও ওয়াসিক বিল্লাহ (২২৮-২৩২ হি) এভাবে এমত প্রতিষ্ঠর জন্য এরূপ অত্যাচার অব্যাহত রাখেন। পরবর্তী শাসক মুতাওয়াক্কিল (২৩২-২৪৭ হি) এ অত্যাচারের অবসান ঘটান।

সুদীর্ঘ প্রায় ৩০ বৎসরের এ কুফরী মতাদর্শের শাসন ও অত্যাচারের সময়ে মূলধারার আলিমগণের অন্যতম নেতা ছিলেন ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (২৪১ হি)। তিনি মু'তাযিলী মতবাদের কুফ্রী ও বিভ্রান্তি প্রকাশ করেন, শত অত্যাচারেও এ মতবাদের স্বীকৃতি প্রদান থেকে বিরত থাকেন এবং দীর্ঘ সময় কারাগারের অন্তরালে অবস্থান করেন। কিন্তু তিনি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বজায় রেখেছেন, জুমুআর খুতবায় খলীফা ও প্রশাসনের জন্য দুআ করতে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি কখনোই বিদ্রোহ, আইন অমান্য বা সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের অনুমতি দেন নি।

সরকারের জুলুম ও সরকার পক্ষের আলিমগণের প্রচারণায় সাধারণ মানুষ ও সাধারণ আলিমগণ এ কুফরী মত গ্রহণ করতে থাকেন। পক্ষান্তরে আহলুস সুন্নাত বা মূলধারার আলিমগণ ও তাদের অনুসারী সাধারণ মুসলিমগণ অত্যাচারিত হওয়া ছাড়াও সাধারণের মধ্যে এরূপ কুফরী মতবাদের দ্রুত প্রসারে বিচলিত হয়ে পড়েন। অনেকেই সরকারের নির্দেশ অমান্য করে সমাজে হক্ক কথা দ্রুত প্রচারের বা সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে অস্ত্র ধারণের চিন্তা করেন। ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল তাদেরকে বিশেষভাবে নিষেধ করেন। তিনি বারবারই বলতেন:

هذه فتنة خاصة وإذا وقع السيف وسالت الدماء صارت فتنة عامة، إياكم والدماء ، إياكم والدماء ، إياكم والدماء

"এখন তো ফিতনা ও অত্যাচারের শিকার অল্প কিছু মানুষ। আর যদি অস্ত্রধারণ করা হয় এবং রক্তপাত করা হয় তবে তা সাধারণ ফিতনা-ফাসাদে পরিণত হবে এবং সাধারণ জনগণ কষ্ট ও অত্যাচারের শিকার হবে। খবরদার! তোমরা রক্তপাত থেকে দূরে থাক! খবরদার! তোমরা রক্তপাত থেকে দূরে থাক! খবরদার! তোমরা রক্তপাত থেকে দূরে থাক!!!"[২৪৫]

এখানে লক্ষণীয় যে, ইমাম আহমদ ও অন্যান্য আলিম মামুনের এ মতবাদকে কুফর বলে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু কখনোই মামুনকে বা যারা এ মত গ্রহণ করছিল তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে কাফির বলে গণ্য করেন নি, বরং তাদের আনুগত্য ও তাদের পিছনে সালাত আদায় অব্যাহত রেখেছেন। মুতাযিলী মতের বিভিন্ন আকীদা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের সাথে সাংর্ঘর্ষিক। এ বিশ্বাস পোষণের মাধ্যমে এ সকল আয়াতকে অস্বীকার করা হয়। কিন্তু মুতাযিলীগণ এ সকল আয়াতকে সরাসরি অস্বীকার করত না; বরং বিভিন্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে তার অর্থ পরিবর্তন করে তারা তাদের এমতকে "কুরআন-সম্মত" বলে দাবি করত। তারা বলত না যে, আমরা কুরআন বা হাদীস অস্বীকার করি। বরং তারা বলত যে, কুরআনের এ কথাটি অমুক বা তমুক অর্থে আমরা গ্রহণ করি। আর আমরা আগেই দেখেছি যে, এক্ষেত্রে ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলা হয় না। বরং তাকে 'সন্দেহের সুযোগ' (Benefit of doubt) প্রদান করা হয় এবং মনে করা হয় যে, সে হয়ত সত্যিই না বুঝে এরূপ কুফরী মত গ্রহণ করেছে।

এর অর্থ এ নয় যে, তার মত বা ব্যাখ্যা সঠিক বলে মেনে নেওয়া হলো। বরং তাকে বিভ্রান্তিতে নিপতিত মুসলিম বলে গণ্য করা হলো। আর এজন্যই ইমাম আহমদ ও অন্যান্য আলিম অনমনীয় দৃঢ়তার সাথে সঠিক মতটি বর্ণনা করেছেন এবং কোনো অত্যাচারেই রাষ্ট্রীয় মতবাদকে কুরআন-সুন্নাহ সম্মত বলে স্বীকৃতি দেন নি।

ইমাম আহমদ ও তাঁর সাথীরা এরূপ অনমনীয়তার পাশাপাশি ধৈর্য ধারণ করেছেন এবং দ্রুত অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা করেন নি। বরং অত্যাচার ও কষ্ট নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে সাধারণ জনগণকে রক্তারক্তি ও হানাহানি থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট থেকেছেন। এ সময়ে যারা কুফরী মতের প্রসার রোধে আইন ভঙ্গ করেছিলেন বা দ্রুত ন্যায় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন তারা কেউ সফল হন নি। বরং তাদের কারণে অনেকেই কষ্টে নিপতিত হয়েছেন। কিন্তু ইমাম আহমদ ও তাঁর সাথীদের ধৈর্যসহ সত্যকথন এক সময় ফল প্রসব করে। দীর্ঘ প্রায় ত্রিশ বৎসর পর খলীফা মুতাওয়াক্কিল (২৩২-২৪৭ হি) মূলধারার আলিমদের মত গ্রহণ করেন। মুতাযিলী ও অন্যান্যদেরও তাদের মতবাদ চর্চার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এ বিষয়ক সকল রাষ্ট্রীয় জবরদস্তি থামিয়ে দেওয়া হয়।

বস্তুত ইসলামের ইতিহাসে রাষ্ট্র কখনো ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে নি। সকল ধর্মের অনুসারীরা পরিপূর্ণ স্বাধীনতার সাথে তাদের ধর্মপালন করেছেন এবং নাগরিক অধিকার ভোগ করেছেন। অনুরূপভাবে বিভিন্ন মুসলিম ফিরকা তাদের মতামত অনুসরণ করেছেন। তারা পারস্পরিক দলাদলি করলেও রাষ্ট্রপ্রশাসন সাধারণত এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে নি। ইউরোপের খৃস্টান দেশগুলির মত ধর্মদ্রোহিতা (heresy) নির্মূলের নামে ভিন্নধর্ম বা ভিন্নমতের অনুসারীদের নির্মুল করা হয় নি। মামুন, মুতাসিম ও ওয়াসিকের গ্রীক দর্শন ভিত্তিক এ মুতাযিলী শাসনামল ছিল ব্যতিক্রম।

খ. আকবারের দীনে ইলাহীর প্রতিরোধে ইমাম সিরহিন্দী

মোগল সম্রাট আকবরের (রাজত্ব ১৫৫৬-১৬০৫ খৃ) দীনে ইলাহীর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কুফরী প্রতিষ্ঠার মত এমন ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয়টি দেখা যায় না। সম্রাট আকবরের সময়ে সামগ্রিকভাবে ভারতের মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় অবক্ষয় বিরাজ করছিল। আকবরের "দীন-ই-ইলাহী"-র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সে অবক্ষয় চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে।

Contents

খৃস্টীয় ১২শ-১৩শ শতাব্দী বা হিজরী পঞ্চম-সপ্তম শতাব্দীতে দুশতাব্দীরও অধিককালব্যাপী পশ্চিম থেকে ইউরোপীয় খৃস্টানগণের একের পর এক বর্বর ক্রুসেড আক্রমনে ছিন্নভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের দুর্বল অবস্থার মধ্যেই খৃস্টীয় ১৩শ শতকে বা হিজরী ৭ম শতকে মুসলিম দেশগুলির উপর পূর্ব থেকে তাতার ও মোঙ্গলদের বর্বর হামলা শুরু হয়। একপর্যায়ে ১২৫৮ খৃ/৬৫৬ হিজরী সালে বাগদাদের পতন ঘটে। এভাবে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

এ সময়ে কেন্দ্রীয় শাসন, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। মূলত সুফীয়ায়ে কেরাম, সূফী দরবার ও খানকার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে দীনী শিক্ষার ধারা টিমটিম করে অব্যাহত থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগে তাসাউফ ও তরীকতের নামে অগণিত ভণ্ড দরবার, খানকা ও তরীকার সৃষ্টি হয়। তরীকতের নামে মুসলমানদেরকে ইসলামী শরীয়ত ও ইসলামী আকীদা বিশ্বাস পরিত্যাগ করে বিভিন্ন পাপ, কুফর ও শিরকী বিশ্বাসে নিমজ্জিত করা হয়। এ ছিল ভারতীয় উপমহাদেশ-সহ সমগ্র ইসলামী জগতের অবস্থা।

এ সময়ে ইরানে ও ভারতে অনেকে প্রচার করতে থাকে যে, এক হাজার বৎসরের মাথায় ইসলাম ধর্ম ও মুহাম্মাদী নুবুওয়াতের যুগ শেষ হয়ে যাবে এবং নতুন মিলেনিয়ামে বা সহস্রাব্দে নতুন দীনের আবির্ভাব ঘটবে। এ মতবাদের ভিত্তিতে সে সময়ে নতুন নতুন নুবুওয়াতের দাবিদারের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। ৯১০ হিজরীতে জৌনপুরের সায়্যিদ মুহাম্মাদ নিজেকে প্রতিশ্রুত মাহদী বলে দাবি করে এবং দ্রুত সারা ভারতে তার মত ছড়িয়ে পড়ে। ৯৭৭ হিজরীতে মুল্লা মুহাম্মাদ ও তার যিকরী দলের আবির্ভাব হয় এবং দ্রুত তারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করে। ভারতের সর্বত্র অনেক মুসলিম তার দীন গ্রহণ করে।

এসময়ের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মত ছিল ইরানের নুকতাবী মতবাদ। এ মতবাদের মূল কথা ছিল (ক) হাশর-নশর বলে কিছু নেই; (২) কুফরী-নাস্তিকতা বৈধ বিষয়; (গ) সব কিছ বৈধ; (ঘ) জান্নাত-জাহান্নাম এ দুনিয়ারই উন্নতি অবনতি; (ঙ) বিবর্তনবাদ; (চ) আরবী নুবুওয়াতের যুগ শেষ এখন আজমী নুবুওয়াতের যুগ শুরু হচ্ছে।

সম্রাট আকবর নিজে ধার্মিক মুসলিম ছিলেন। তিনি শাইখ মুবারক নাগুরী নামক একজন কথিত সুফীর ভক্ত ছিলেন। ইসলামী বিশ্বকোষে শাইখ মুবারক নাগুরীকে আকবারের দরবারে সুফীবাদের প্রতিনিধি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৪৬] শাইখ মুবারক নামক এ "সূফী" ছিলেন উপর্যুক্ত নুকতাবী মতবাদের অনুসারী। শাইখ মুবারাকের দু পুত্র, আকবরের নবরত্নসভার অন্যতম সদস্য আবুল ফযল ও ফৈযীও এ মতের অনুসারী ছিলেন।

এ সকল মানুষ নতুন একটি বিশ্বজনীন অনারব ধর্ম প্রবর্তন করতে এবং এ মহান ধর্মের প্রবর্তকের মর্যাদায় আসীন হতে আকবরকে প্ররোচিত করতে সক্ষম হন। তাদের প্ররোচনায় রাজত্ব গ্রহণের (১৫৫৬খৃ/৯৬৩হি) প্রায় ৩০ বৎসর পরে ১৫৮২খৃ/৯৯০ হিজরীতে আকবর দীন-ই-ইলাহী প্রবর্তন করেন। এ ধর্মের মূল দাবি ছিল হিন্দু, মুসলিম, খৃস্টান, পারসিয়ান ইত্যাদি সকল ধর্মের মূল শিক্ষা নিয়ে একটি ধর্ম প্রবর্তন করা। এ ধর্মের উপাস্যের প্রতীক ছিল সূর্য ও আগুন। এ ধর্মের প্রবর্তনের মাধ্যমে সালাত, সিয়াম, যাকাত ও ইসলামের সকল বিধান রহিত ও নিষিদ্ধ করা হয়, উপাস্যের প্রতীক সূর্য ও আগুনের পূজা চালু করা হয়। আর 'আল্লাহর প্রতিনিধি' ও ধর্মের প্রবর্তক বাদশাহকে সাজদা করার নিয়ম চালু করা হয়।

এ নতুন রাষ্ট্র ধর্মের মুল বৈশিষ্টাবলির মধ্যে ছিল:

(১) অগ্নি ও সূর্যের উপাসনা
(২) গঙ্গা নদীর পানিকে পবিত্র জ্ঞানে পান করা।
(৩) ছবি, মুর্তি, প্রতিকৃতি ইত্যাদির বৈধতা ঘোষণা।
(৪) সাজদায়ে তাহিয়্যাহ বা সালাম জ্ঞাপক সাজদাকে বৈধ বলে দাবি করে সম্রাটকে সাজদা করার আইন জারি করা।
(৫) ইসলামের ঈদ পরিত্যাগ করে নতুন নতুন বিভিন্ন পার্বন প্রচলন করা।
(৬) সালাত আদায় নিষিদ্ধ করা। রাজপ্রাসাদের মধ্যে প্রকাশ্যে কেউ সালাত আদায় করতে পারত না।
(৭) যাকাত নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ফরমান জারি করা।
(৮) ইসলামের ঈমান, ইবাদত ও রীতিনীতি নিয়ে উপহাস করা।
(৯) ইসলামী আইন ও বিচারব্যস্থা বাতিল করে বিভিন্ন ধর্মের আইনের সংমিশ্রণে নতুন আইন চালু করা।

এ ধর্ম চালু করার প্রায় ১৫ বৎসর পরে ১৬০৫ খৃস্টাব্দে (১০১৪ হিজরীতে) আকবর মৃত্যুবরণ করেন। তার পর তার পুত্র নুরুদ্দীন জাহাঙ্গীর (রাজত্ব ১৬০৫-১৬২৭ খৃ/ ১০১৪-১০৩৬ হি) রাজ্যভার গ্রহণ করেন। জাহাঙ্গীরও পিতার ধর্মমত অনুসারে রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন।

স্বভাবতই রাষ্ট্রের ধার্মিক মুসলিমগণ এ অবস্থাতে বিক্ষুব্ধ হন। এ সময়ে দীনের ঝাণ্ডা গ্রহণ করেন মুজাদ্দিদে আলফে সানী শাইখ আহমদ ইবনু আব্দুল আহাদ সিরহিন্দী (১৫৬৪-১৬২৪খৃ/৯৭১-১০৩৪ হি)। তাসাউফের সঠিক ব্যাখ্যা, পরিপূর্ণ শরীয়ত অনুসরণের মাধ্যমে পরিপূর্ণ তরীকত অর্জন, বিদআতে হাসানা ও বিদআতে সাইয়েআহ- অর্থাৎ ভাল বিদআত ও খারাপ বিদআতের পার্থক্য অস্বীকার করে ভাল ও খারাপ উভয় প্রকারের বিদআতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং বিশুদ্ধ সুন্নাত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, দীন-ই-ইলাহীর প্রতিবাদ ও ইসলামের পুনর্প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দাওয়াত দিতে শুরু করেন।

ক্রমান্বয়ে সমগ্র ভারতে তার দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে। সেনাবাহিনীর মধ্যেও তার দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারী আলিমগণ তাঁর বিরুদ্ধে ফাতওয়াবাজি শুরু করেন। সম্রাট তাঁকে গোয়ালিয়ার দুর্গে বন্দী করেন। এক পর্যায়ে সেনাপতি ও

অন্যান্য প্রভাবশালী তাকে বলেন যে, তারা সম্রাটকে হত্যা করে তাঁকে (শাইখ আহমদকে) ক্ষমতায় বসাবেন। কিন্তু তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি কারাগারের অভ্যন্তরেও তাঁর শান্তিপূর্ণ দাওয়াত অব্যাহত রাখেন। পরে সম্রাট তাকে মুক্ত করেন এবং তাঁর দাওয়াতে প্রভাবিত হয়ে দীন-ই-ইলাহী পরিত্যাগ করে ইসলামী আকীদা ও শরীয়ত গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন। রাষ্ট্র প্রশাসন ছাড়াও সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে শাইখ আহমদের দাওয়াত ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।[২৪৭]

ইসলামের ইতিহাসে এরূপ আরো অনেক সংস্কার কার্যক্রম আমরা দেখতে পাই। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আমরা কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই:

(১) কুফর, ইলহাদ ও অনাচারের বিরুদ্ধে দাওয়াতে সোচ্চার হওয়া।

(২) ধৈর্য ও বিনম্রতার সাথে দাওয়াতের কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়া।

(৩) ফলাফলের চিন্তা না করে দায়িত্ব পালনের অনুভূতিতে কর্ম করা।

(৪) সকল প্রকার উগ্রতা ও অসহিষ্ণুতা বর্জন করা। বিরোধীদের অসহিষ্ণুতা, অত্যাচার ও উগ্রতা উত্তম আচরণ ও ধৈর্য দিয়ে মুকাবিলা করা।

(৫) রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বজায় রাখা। পাপ নয় এমন রাষ্ট্রীয় নির্দেশ মান্য করা। এমনকি গৃহবন্দী করলে বা কথা বলতে বাধানিষেধ আরোপ করলে তা মেনে নিয়ে প্রদত্ত সীমাবদ্ধতার মধ্যেই দাওয়াত অব্যাহত রাখা।

(৬) শাসকদের পরিবর্তনের চেয়ে সংশোধনকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

(৭) অন্যায়কে অন্যায় বলার পাশাপাশি ভাল ও কল্যাণের কাজে শাসক বা প্রশাসকদের প্রশংসা করা, সহযোগিতা করা এবং তাদের থেকে যতটুকু সম্ভব দীনের স্বার্থ উদ্ধার ও রক্ষা করা।

ইসলামের ইতিহাসের এ সকল রাষ্ট্র-সংস্কার আন্দোলনের একটি লক্ষণীয় বিষয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলির নেতৃবৃন্দ নিজেরা ক্ষমতা গ্রহণ করতে চেষ্টা করেন নি, উপরন্তু ক্ষমতা বা দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব বা সুযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারা ক্ষমতাসীন বা দায়িত্বে রত 'সাধারণ' মুসলিম বা 'ফাসিক' মানুষদের মাধ্যমে যথাসম্ভব সংশোধন ও উন্নয়নের চেষ্টা করেছেন।

কোনো আলিম বা নেককার মানুষের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ ইসলামে নিষিদ্ধ বা আপত্তিকর নয়, বরং জরুরী ও কল্যাণকর হতে পারে। আফ্রিকার- বর্তমান নাইজেরিয়ার- প্রসিদ্ধ আলিম, পীর ও সফল সংস্কারক উসমান দান ফুদিও (Usuman dan Fodio: 1754-1817)-র সংস্কার আন্দোলন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংস্কারকগণের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতির এ দিকটির কারণ ও প্রেক্ষাপট হিসেবে নিম্নের বিষয়গুলি বিবেচ্য:

(১) তাঁরা অনুভব করতেন যে, ক্ষমতার সংশোধনের চেয়ে পরিবর্তন কঠিনতর। কোনো দেশেই ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতা ছাড়তে চান না। আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও বিভিন্নভাবে ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতা আকড়ে ধরতে চান। আর তৎকালীন পরিবেশে হত্যাকাণ্ড বা যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়া ক্ষমতার পরিবর্তন খুবই কঠিন ছিল। ক্ষমতার পরিবর্তন করতে রক্তারক্তির যে সম্ভাবনা সংস্কার ও সংশোধনের ক্ষেত্রে এর সম্ভাবন ততটা নয়। এক্ষেত্রে আলিম বা সংস্কারক নির্যাতিত হলেও সাধারণ অনুসারী ও নাগরিকগণ নির্যাতন ও রক্তপাত থেকে রক্ষা পান। এজন্য তারা ক্ষমতার পরিবর্তন না করে সংস্কার চেষ্টাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ, উদ্দেশ্য তো যতটুকু সম্ভব পাপ অন্যায় দূর করা এবং দীনী দাওয়াতের পরিবেশ তৈরি করা।

(২) তারা ক্ষমতাসীনদেরকে বার্তা দিয়েছেন যে, আমরা আপনাদের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্ধী নই। আমরা আপনাদের কল্যাণকামী মাত্র। আপনাদের ক্ষমতার স্থায়িত্ব, দুনিয়ার সফলতা ও আখিরাতের মুক্তির জন্য আপনাদেরকে অমুক বা তমুক কাজগুলি করতে বা বর্জন করতে হবে। এ "বার্তা"-সহ সংস্কার ও পরিবর্তনের দাওয়াত অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীনদের মনে প্রভাব ফেলে এবং পরিবর্তন সহজ হয়। পক্ষান্তরে কাউকে ক্ষমতার প্রতিদ্বন্ধী মনে করলে ক্ষমতাসীনরা তার ভাল কথাও শুনতে রাজি হন না, বরং ক্ষমতার প্রতিদ্বন্ধী অতি আপনজনকেও আঘাত, হত্যা বা নিয়ন্ত্রণ করতে তৎপর হন।

(৩) ক্ষমতার পরিবর্তনে একজন বা একদল মানুষের পরিবর্তে অন্য মানুষ বা মানুষদের ক্ষমতায় বসাতে হয়। এক্ষেত্রে পরের মানুষগুলি ক্ষমতা গ্রহণের পরে পূর্ববর্তীদের চেয়ে অনেক ভাল বা পরিপূর্ণ ভাল হবেন বলে আশা করা কঠিন। কাজেই ক্ষমতা পরিবর্তন ছাড়াই যদি দাওয়তের উদ্দেশ্য আংশিক বা অনেকাংশে পূরণ হয় তাহলে তা মেনে নেওয়াই উত্তম।

(৪) আখিরাতমুখী আলিমগণ নিজে দায়িত্ব গ্রহণ করতে ভয় পেতেন। দায়িত্ব গ্রহণ করে বৈষম্যহীন ন্যায়বিচার, সকল নাগরিকের অধিকার আদায়, সম্পদের সঠিক ব্যবহার ইত্যাদি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি হয়ে গোনাহের মধ্যে নিপতিত হবেন বলে তারা ভীত হতেন। তারা ভাবতেন যে, মূল উদ্দেশ্য কুফর, ইলহাদ ও অনাচার দূর করা এবং দীন ও দাওয়াতের নিরাপত্তা রক্ষা করা। তা যখন অন্যের মাধ্যমে হয়ে যাচ্ছে তখন নিজের আখিরাতকে ঝুঁকিপূর্ণ করার দরকার কী?

(৫) রাষ্ট্রের সাথে অগণিত মানুষের অধিকার ও স্বার্থ জড়িত। এখানে সাধারণত কেউই সকল নাগরিকের কাছে বা সকল ধার্মিকের কাছে "ভাল" বা "যোগ্য" বলে গণ্য হতে পারেন না। বরং সকলেই বিতর্কিত হন এবং অনেকেই ব্যর্থ বলে গণ্য হন। সাধারণ বা "ফাসিক" ব্যক্তি যদি রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থ হয় তাহলে ব্যর্থতার দায়ভার তার নিজের ঘাড়ে পড়ে। আর যদি আলিম, ইমাম বা সংস্কারক ব্যর্থ হন তাহলে তার দায়ভার দীনের উপরেই পড়ে। এতে দীনী দাওয়াত বিতর্কিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৩. ১১. জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে করণীয়

পূর্বের আলোচনায় আমরা জঙ্গিবাদ, চরমপন্থা, সন্ত্রাস ও উগ্রতার পরিচয় এবং ইসলামের নামে উগ্রতা বা সহিংসতার কারণ ও প্রেক্ষাপট আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, সকল ধর্ম ও আদর্শের অনুসারীরাই বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সন্ত্রাস বা জাঙ্গিবাদে লিপ্ত হয়েছে ও হচ্ছে। সন্ত্রাস অর্থই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে অস্ত্রধারণ ও শক্তি প্রয়োগ এবং বিশেষত অযোদ্ধা ব্যক্তি বা বস্তুকে আঘাত করা বা হত্যা করা। ইসলামে সন্ত্রাসের পথ সামগ্রিকভাবে রুদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামে মানব জীবনকে সর্বোচ্চ সম্মানিত বলে গণ্য করা হয়েছে এবং একমাত্র বিচার ও যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনোভাবে কোনো মানুষকে হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিচার ও যুদ্ধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এভাবে ইসলামে সন্ত্রাসের পথ পরিপূর্ণভাবে রূদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে আমরা সন্ত্রাসের ঘটনা দেখতে পাই না বললেই চলে।

কিন্তু সমকালীন বিশ্বে উপনিবেশোত্তর বিভিন্ন মুসলিম দেশের দমন-পীড়ন নীতি, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও অন্যান্য স্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য বিশ্বশক্তির সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী নীতি, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে মুসলিম নিধন ও মুসলিম সমাজের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, আবার প্রয়োজনে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগ অপব্যবহার করে "মুজাহিদ" তৈরির উদ্দেশ্যে বিশেষ "মাদ্রাসা" তৈরি করে তাদেরকে জঙ্গিতে রূপান্তরিত করা ইত্যাদি বিষয় বিভিন্নভাবে উগ্রতা, জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাসের জন্ম দিয়েছে। এক্ষেত্রে উগ্রতা, সন্ত্রাস বা জাঙ্গিবাদের প্রচার ও প্রসারের জন্য ইসলামের বিভিন্ন শিক্ষাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের জনগণ প্রকৃতিগতভাবে শান্তিপ্রিয়। এদেশে কখনো ধর্মীয় সংঘাত ও রক্তারক্তি দেখা দেয় নি। ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান বা অন্যত্র যেমন বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে এবং একই ধর্মের বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রুপ ও দলের মধ্যে হানাহানি ও রক্তারক্তির ঘটনা ঘটে থাকে বাংলাদেশে তা কখনোই ঘটে না। কিন্তু ইদানিং আমরা আমাদের দেশেও ধর্মীয় উগ্রতার উন্মেষ লক্ষ্য করছি। এ প্রবণতা রোধে আমাদের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩. ১১. ১. সমাজ ও রাষ্ট্রের করণীয়

৩. ১১. ১. ১. কারণ নিয়ন্ত্রণ

আমরা সহজেই বুঝি যে, কোনো কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে হলে তার কারণগুলি নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। জঙ্গিবাদের কয়েকটি মূল কারণ রয়েছে: (১) সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন, আগ্রাসন ও ষড়যন্ত্র, (২) মুসলিম দেশে ইসলাম-দমন, (৩) বেকারত্ব ও হতাশা এবং (৪) ইসলামের শিক্ষার বিকৃতি।

প্রথম বিষয়টি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। যতদিন এরূপ আগ্রাসন, নিপীড়ন ও ষড়যন্ত্র থাকবে ততদিন যে কোনো দেশে কিছু মানুষ অজ্ঞতা ও আবেগের প্রেষণে উগ্রতায় লিপ্ত হয়ে যেতে পারেন। এরূপ সম্ভাবনা একেবারে রহিত করা যায় না। অনুরূপভাবে যে মুসলিম দেশের ভৌগলিক বা অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে সে দেশে আধিপত্য বিস্তার করতে বা সে দেশের সরকারকে ছাড় দিতে বাধ্য করতে কিছু "জঙ্গি" তৈরি করা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির জন্য অত্যন্ত সহজ ও কার্যকরী পন্থা। তবে আমরা বাকি তিনটি কারণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এবং এতে প্রথম কারণটিও নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে।

৩. ১১. ১. ২. বেকারত্ব, হতাশা ও অজ্ঞতা

বেকারত্ব, বঞ্চনা ও হতাশার পাশাপাশি জ্ঞানহীন আবেগ চরমপন্থা ও জঙ্গি কর্মকাণ্ডের জন্ম দেয়। আমাদের সমাজে যারা সর্বহারার রাজত্বের জন্য বা ইসলামী রাজত্বের জন্য সহিংসতায় লিপ্ত তাদের প্রায় সকলের জীবনেই আপনি এ বিষয়টি দেখতে পাবেন। অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বা শিক্ষিত বেকার যুবককে কেউ বুঝিয়েছে, এরূপ সহিংসতার মাধ্যমে অতি তাড়াতাড়িই তোমার ও অন্যদের কষ্ট ও বঞ্চনার সমাপ্তি ঘটবে এবং সর্বহারার রাজত্ব বা ইসলামী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। তুমি ক্ষমতা ও কর্ম অথবা জান্নাত লাভ করবে। বঞ্চিত, বেকার ও হতাশ এ যুবক সহজেই এ কথা বিশ্বাস করে এ সকল কর্মে লিপ্ত হয়। কারণ তার অন্য কোনো কর্ম নেই এবং তার পাওয়ার আশার বিপরীতে হারানোর তেমন কিছুই নেই।

৩. ১১. ১. ৩. জঙ্গি নির্মূল বনাম জঙ্গিবাদ নির্মূল

বেকারত্ব, সামাজিক অবহেলা, ন্যায় বিচারের দুর্লভতা, বঞ্চনা ও অজ্ঞতা দূর না করে শক্তি বা আইন দিয়ে কঠোর হস্তে "জঙ্গি" নির্মূলের চেষ্টা করলে জাতির ক্ষতি হবে। এতে এদেশের অনেক সন্তান "নির্মূল" হলেও "জঙ্গিবাদ" নির্মূল হবে না। যারা চরমপন্থা বা জঙ্গি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত তারা আমাদের সামাজিক বঞ্চনা ও অবিচারের শিকার। তাদেরকে শত্রু বিবেচনা করে নির্মুল করার চেয়ে নাগরিক ও দেশের সন্তান বিবেচনা করে যথাসম্ভব সংশোধন করে সমাজের মূলধারায় সংযুক্ত করাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিশেষত যারা হত্যা বা অনুরূপ অপরাধে জড়িত হয় নি এরূপ যুবকদের সংশোধনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

সরকার ও প্রশাসনের দায়িত্ব পিতৃত্বের বা অভিভাবকের দরদ নিয়ে সকল নাগরিকের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হওয়া। প্রকৃত অপরাধীর শাস্তি প্রদান এবং নিরপরাধকে শাস্তি থেকে রক্ষার পাশাপাশি কম অপরাধীকে সংশোধনের সুযোগ দেওয়া তাদের কর্তব্য। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, ইনসাফ, বৈষম্যহীন ন্যায়বিচার ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট শাসক ও প্রশাসকগণ আল্লাহর সর্বোচ্চ দয়া ও পুরস্কার লাভ করবেন।

৩. ১১. ১. ৪. অপরাধ নিয়ন্ত্রণ বনাম নিরপরাধের শাস্তি

জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে বড় ভয়ঙ্কর দিক হলো নিরপরাধের শাস্তি। জঙ্গিবাদ দমনের নামে শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে নিরপরাধ মাদ্রাসা ছাত্র বা ধার্মিক মানুষদেরকে আটক, জিজ্ঞাসাবাদ, কারাগারের অন্তরীন রাখা, রিমান্ডে নেওয়া ইত্যাদি কর্ম একদিকে

মানবাধিকার ভূলণ্ঠিত করবে, এ সকল নিরপরাধ মানুষ ও তাদের আপনজনদেরকে জঙ্গিবাদের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং সর্বোপরি আমাদেরকে আল্লাহর গযব ও শাস্তির মধ্যে নিপতিত করবে। কারণ নিরপরাধের শাস্তি ও বিচারবহির্ভুত হত্যা, শাস্তি ও কষ্টদান যখন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক রূপ প্ররিগ্রহণ করে তখন আল্লাহর গযব ও জাগতিক শাস্তি সে দেশের ভাল ও মন্দ সকল মানুষকে গ্রাস করে।

৩. ১১. ১. ৫. জঙ্গিবাদ বনাম ইসলামবাদ

আরো বেশি ভয়ঙ্কর বিষয় জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণের নামে ইসলামী দাওয়াতের কণ্ঠরুদ্ধ করা। মাওবাদী সন্ত্রাসীগণ বা আমাদের দেশের চরমপন্থী বলে কথিত "বামপন্থী জঙ্গিগণ" যে মতাদর্শ ও দাবিদাওয়া প্রচার করেন মূলধারার মার্কসবাদী, সাম্যবাদী, সমাজতন্ত্রী বা বামপন্থীগণও একই মতাদর্শ ও দাবিদাওয়া প্রচার করেন। অনুরূপভাবে ইসলামের নামে উগ্রতায় লিপ্ত বা জঙ্গিবাদীরা যে সকল মতাদর্শ ও দাবি দাওয়া পেশ করেন প্রায় একইরূপ মতাদর্শ ও দাবি দাওয়া প্রচার করেন মূলধারার ইসলমী রাজনীতিবিদ, আলিম, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ ও পীর-মাশাইখগণ। পার্থক্য হলো কর্মপদ্ধতিতে। চরমপন্থী ও জঙ্গিরা বলপ্রয়োগ, আইন অমান্য ও খুনখারাপির মাধ্যমে তাদের আদর্শ চাপিয়ে দিতে চান। পক্ষান্তরে মূলধারার মানুষেরা দেশের আইনের আওতায় গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যে নিজেদের দাবি-দাওয়া পেশ করেন। গ্রহণ করা বা না করা জনগণের ইচ্ছাধীন।

সাম্যবাদী জঙ্গি বা সমাজতন্ত্রী সন্ত্রাসীদের কারণে কেউ মূলধারার সাম্যবাদী বা সমাজতন্ত্রীদেরকে দায়ী করেন না বা "চরমপন্থা" দমনের নামে বামপন্থী রাজনীতি ও কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করার দাবি তোলেন না। কেউ বলেন না যে, সাম্যবাদী রাজনীতির কারণেই চরমপন্থী ও সন্ত্রাসী জন্ম নিচ্ছে; কাজেই সাম্যবাদী রাজনীতি বন্ধ করা হোক। কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে অনেক সময় বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যায়। জঙ্গিবাদ দমনের অযুহাতে অনেক সময় ইসলামী রাজনীতি, ইসলামী আইন ও বিচার প্রতিষ্ঠার দাবি বা ইসলামী মূল্যবোধ বিকাশের দাবি বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়।

অনেক সময় "ধর্মনিরপেক্ষতার" নামে বা "জঙ্গি" নির্মূল করার নামে "ইসলামী রাজনীতি" বা ইসলামী মূল্যবোধ প্রসারমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের দাবি করা হয়। অথচ ধর্মনিরপেক্ষতার মূল দাবী হলো সকল ধর্মের মানুষকে তার ধর্ম পালন ও ধর্মের বিষয়ে তার নিজের ব্যাখ্যা ও মতবাদ প্রচারের সুযোগ দেওয়া। গ্রহণ করা বা না করা জনগণের ইচ্ছা। গণতান্ত্রিক অধিকারের আওতায় মতপ্রকাশের অধিকার দিলে উগ্রতার পথ রুদ্ধ হয়। অতীতে কোনোকোনো দেশে সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি নিষেধ করার ফলে সমাজতান্ত্রিক জঙ্গিবাদের উন্মেষ ঘটে। পরবর্তীতে মূলধারায় সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির সুযোগ দেওয়ার ফলে "সর্বহারার রাজত্বের" জন্য বা সাম্যবাদের নামে সন্ত্রাস ক্রমান্বয়ে কমে যায়।

বস্তুত, গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এক দল আরেক দলের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে পারেন। যারা ইসলামী মূল্যবোধ, আখলাক-আচরণ, শিক্ষা ইত্যাদি সবকিছুকেই "আফিম", "প্রতিক্রিয়াশীলতা" বা উন্নয়নের প্রতিবন্ধক বলে বিশ্বাস করেন, অথবা তাদের বাণিজ্যিক, সাম্রাজ্যবাদী বা অনুরূপ স্বার্থের প্রতিবন্ধক বলে মনে করেন তারা জঙ্গিবাদের অযুহাতে ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধ বিস্তারের বা ইসলামী আদর্শ বিস্তারের সকল কর্ম নিষিদ্ধ করার দাবি করতে পারেন। মত প্রকাশের অধিকার তাদের আছে।

অনুরূপভাবে "ইসলামপন্থীরা" চরমপন্থা নির্মূল বা অনুরূপ কোনো অযুহাতে সাম্যবাদী বা সমাজতন্ত্রী আদর্শ প্রচার নিষিদ্ধ করার দাবি করতে পারেন। মত প্রকাশের অধিকার তাদের আছে।

তবে সরকার ও প্রশাসনকে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। তাদের নিজস্ব কোনো মত বা পক্ষ থাকলেও সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার পর তাদের দায়িত্ব হয় সকলের অধিকার রক্ষা করা এবং দেশের স্বার্থ সমুন্নত রাখা। আমাদের বুঝতে হবে যে, ভাল বা মন্দ কোনো কথারই "কণ্ঠ" রুদ্ধ করার প্রবণতা কখনোই ভাল ফল দেয় না। বিশেষত জঙ্গিবাদের নামে ইসলামী রাজনীতি, ইসলামী আদর্শ প্রচার, শিক্ষা বিস্তার ও ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার আইনসম্মত দাওয়াতকে নিষিদ্ধ বা বাধাগ্রস্ত করলে তা নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হরণের অপরাধ ছাড়াও দেশ ও জাতির জন্য ভয়ঙ্কর বিপদ দেকে আনবে। এ জাতীয় যে কোনো কর্ম জঙ্গিদেরকে সাহায্য করবে, তাদের প্রচার জোরদার করবে, তাদের নতুন রিক্রুটমেন্ট দ্রুত বাড়বে এবং দেশ ও জাতিকে এক ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী অশান্তির মধ্যে ফেলে দিবে।

৩. ১১. ১. ৬. ধর্ম-মুক্ত শিক্ষা বনাম ধর্ম-যুক্ত শিক্ষা

আমরা দেখেছি যে, ধর্মীয় আবেগের সাথে সঠিক ধর্মীয় জ্ঞানের অনুপস্থিতিই জঙ্গিবাদের মূল কারণ। এজন্য সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় অধিকতর ইসলামী ও নৈতিক শিক্ষার সংযোজন অতীব প্রয়োজনীয়। জঙ্গিবাদের অযুহাতে মাদ্রাসা শিক্ষা সংকোচন এবং সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে "ধর্মনিরপেক্ষ" বা "অসামপ্রদায়িক" করার নামে ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বিমুক্ত করা আন্তজার্তিক বেনিয়াচক্র ও সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনলেও জাতির জন্য ভয়ঙ্কর দুর্ভাগ্যের দ্বার উন্মোচন করবে।

"মাদ্রাসা-শিক্ষিত" ও ধার্মিক মানুষেরা জঙ্গি না হলেও তারা সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ ও আগ্রাসন বিরোধী এবং অশ্লীলতা, মাদকতা ও অনাচার বিরোধী। জঙ্গিবাদের অযুহাতে এদেশের মানুষদের মধ্য থেকে সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ ও আগ্রাসন বিরোধী মানসিকতা অথবা অশ্লীলতা, মাদকতা ও অনাচার বিরোধী মানসিকতা নির্মূল করা যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে ভিন্ন কথা। আর যদি আমরা জাতির কল্যাণে জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই সঠিক ধর্মীয় শিক্ষার বিকাশ ঘটাতে হবে।

আমরা দেখছি যে, আমাদের দেশে ও বিশ্বের সকল দেশে জঙ্গি কর্মকাণ্ডে জড়িতদের অধিকাংশই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। জঙ্গি বলে কথিত ও প্রচারিত অধিকাংশ দল ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও তাত্ত্বিক গুরুগণও আধুনির শিক্ষিত। কিভাবে এদের দলে নতুন অন্তর্ভুক্তি নিয়ন্ত্রণ করবেন?

আমরা কি শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা দিব যে, ধর্ম ভাল নয়, ধর্ম আফিম, ধর্ম পালন করো না, পরকাল বিশ্বাস করো না,

ধার্মিকদের কাছে যেও না? এরূপ শিক্ষা তো কোনোভাবেই দিতে পারব না। আর দিলেও তাতে কোনো লাভ হবে না। জঙ্গিবাদ কমবে না, বরং জঙ্গিদের প্রচারণার সুযোগ অনেক বাড়বে, ধর্ম বিপন্ন বলে তারা আরো অনেক মানুষকে দলে ভেড়াবে। উপরন্তু এরূপ শিক্ষা দুর্নীতি, সন্ত্রাস, এইডস, এসিড, যৌন হয়রানি, পারিবারিক সহিংসতা ও নৈতিক অবক্ষয়ের মহাদ্বার উন্মোচন করবে।

তাহলে কী আমরা ধর্ম সম্পর্কে কিছুই শিক্ষা দিব না? ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার নামে কি আমরা "ধর্ম-মুক্ত" শিক্ষা দান করব? এতে তো আমাদের সমস্যা বাড়বে। কারণ এরূপ শিক্ষা শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় অনুভূতি নষ্ট করতে পারবে না, কিন্তু ধর্মীয় অজ্ঞতা তাদের ধর্মীয় অনুভূতির অপব্যবহারের সুযোগ বাড়িয়ে দেবে।

বস্তুত ধর্মীয় অনুভুতি নির্মুল করা যায় না। সঠিক জ্ঞানের অভাবে তা বিপথগামী হয়। কখনো কুসংস্কার ও অনাচার এবং কখনো উগ্রতার পথ ধরে। কেউ "পাগল বাবা"-র দরবারে ধর্না দিয়ে, মাজারে-দরগায় পাগল বা মস্তানের পিছনে ছুটে, গাঁজা খেয়ে, জিনের বাদশা বা অনুরূপ প্রতারক-পুরোহিতের কাছে যেয়ে মূল্যবান কর্মঘন্টা ও সম্পদ নষ্ট করে। আর কেউ উগ্রতা ও সহিংসতার পিছে ছুটে নিজের ও অন্যের মহামূল্যবান জীবন ও সম্পদ নষ্ট করে।

আমাদের দেশের ও পাশ্চাত্যের অনেক পণ্ডিত ও রাজনৈতিক নেতা আমাদেরকে নীতি কথা শুনান এবং "দুর্নীতিমুক্তি" দেশ গড়তে নসীহত করেন। কিছুদিন পরে দেখা যায় যে, বড় বড় দুর্নীতি মামলায় তারা জড়িত। এর কারণ ধর্মীয় বিশ্বাস, আখিরাতমুখিতা ও আল্লাহর ভয় ছাড়া শুধুমাত্র নীতিকথা, নীতিশিক্ষা, প্রতিজ্ঞা বা অঙ্গীকার দিয়ে কখনোই দুর্নীতি, নৈতিক অবক্ষয়, সহিংসতা, মাদকতা বা অপরাধ প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

বস্তুত "ধর্ম-মুক্ত" শিক্ষাব্যবস্থা জঙ্গিবাদ না কমিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে জঙ্গিবাদে আক্রান্ত হওয়ার জন্য অধিক ঝুঁকিপূর্ণ (vulnerable) করে তোলে। পাশাপাশি অন্যান্য সকল প্রকারের দুর্নীতি, সহিংসতা ও অপরাধ বৃদ্ধিতে ব্যাপক সহায়তা করে। এজন্য জঙ্গিবাদসহ অন্যান্য সকল সন্ত্রাস, সহিংসতা, দুর্নীতি, মাদকতা, অপরাধ প্রবণতা ও নৈতিক অবক্ষয় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত পর্যাপ্ত ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষার সম্প্রসারণ, আধুনিকায়ন ও ইসলামী ধর্মতত্ত্বে গভীর জ্ঞানী প্রাজ্ঞ গবেষক আলিম তৈরির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যেন তারা কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক মতামত প্রদানের মাধ্যমে যুবসমাজকে উগ্রতা থেকে রক্ষা করতে পারেন।

৩. ১১. ১. ৭. জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের সম্পৃক্তি

যেহেতু এ বিষয়টির সাথে ধর্মীয় অনুভূতি জড়িত সেহেতু এর প্রতিরোধ, প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ বা আলিমদের সম্পৃক্ত করা অতীব জরুরী। উগ্রতার প্রসারে ইসলামী শিক্ষার যে বিষয়গুলিকে বিকৃত করা হয় সেগুলির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার জন্য সমাজের প্রাজ্ঞ আলিমগণকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গণমাধ্যমে সুযোগ দেওয়া অতীব জরুরী। একজন রাজনৈতিক বা সামাজিক নেতা যদি বলেন "ইসলাম শান্তির ধর্ম... ইত্যাদি" তাতে সন্ত্রাসে লিপ্ত যুবক পরিতৃপ্ত বা 'কনভিন্সড' হবে না; তবে যদি একজন প্রাজ্ঞ নেককার আলিম এ বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করেন তাহলে তা হয়ত তাকে পরিতৃপ্ত বা 'কনভিন্সসড' করতে পারবে। এতে যেমন সংশ্লিষ্ট অনেকে সংশোধিত হবে তেমনি নতুন অর্ন্তভুক্তি কমে যাবে।

ইসলামের ধর্মীয় ব্যবস্থার মধ্যে আল্লাহ ব্যক্তি ও সমাজ সংশোধনের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা রেখেছেন। এর অন্যতম হলো মসজিদ ও সালাতুল জুমুআ। জুমুআর খুতবা ও আলোচনা সাধারণভাবে মুমিনের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে। সকল ব্যক্তিগত ও সামাজিক অপরাধ ও অবক্ষয়ের ন্যায় জঙ্গিবাদ বা উগ্রতা রোধেও ইমামগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

এজন্য মসজিদগুলিতে যোগ্য ইমাম নিয়োগ দেওয়া এবং বিদ্যমান ইমামদের ধর্মীয় জ্ঞান ও যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। সরকার যদি নিয়ন্ত্রণের নামে ইমামদের কথা বলা বন্ধ করেন তাহলে তা কোনো ভাল ফল দিবে না; বরং উল্টো ফল দিবে। ইমামগণ যদি সামাজিক অন্যায়, অবক্ষয় ইত্যাদির বিরুদ্ধে কিছু না বলে শুধুই ফযীলত ও গল্পের ওয়ায করেন তাহলে জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে কোনো লাভ হবে না। ইমামগণ যদি সমাজ বা সরকারের অন্যায়ের কোনো প্রতিবাদ না করে শুধু উগ্রতার নিন্দা করেন তাহলেও তা মানুষের মনে রেখাপাত করবে না। কেউ একপেশে কথা পছন্দ করেন না এবং তাতে প্রভাবিত হন না।

ইমামগণ যদি সামাজিক অন্যায়, অবক্ষয়, অশ্লীলতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সুন্নাত-সম্মত পদ্ধতিতে কথা বলেন, এগুলির বিরুদ্ধে আপত্তি ও প্রতিবাদের সুন্নাত-সম্মত পদ্ধতি জানিয়ে দেন, উগ্রতা, বলপ্রয়োগ, আইন অমান্য ও বিদ্রোহের কারণে মুমিন দুনিয়া ও আখিরাতে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং দীনী দাওয়াত কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিভিন্ন আঙ্গিকে তার তথ্যভিত্তিক আলোচনা করেন তাহলে তা খুবই ভাল ফল দিবে।

৩. ১১. ১. ৮. আসমানী কারণ নিয়ন্ত্রণ করুন

অনেক সময় আমরা ভাবি যে, অমুক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা অমুক অন্যায় নির্মূল করব বা উন্নয়ন নিশ্চিত করব। আমরা ভুলে যায় যে, আমাদের পরিকল্পনার বাইরে মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তই আমাদের সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কিছু কিছু পাপ সমাজে অনিয়ন্ত্রিতভাবে ছড়িয়ে পড়লে আল্লাহ সে সমাজে সামাজিক অবক্ষয় ও অশান্তি ছড়িয়ে দেন। আমরা যদি অবক্ষয় ও অশান্তির এ সকল কারণ দূর করতে না পারি তবে শত পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টার পরেও অবক্ষয় ও অশান্তি আমাদের দেশ ও সমাজকে গ্রাস করবেই। এক প্রকারের অশান্তি দূর করলে অন্য প্রকারের অশান্তি আমাদের গ্রাস করবে। আমরা মহান আল্লাহর গযব ও শাস্তি থেকে পালাতে পারব না। বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অশ্লীলতা, দুর্নীতি, ওজন, মাপ বা পরিমাপে কম দেওয়া, ন্যায়বিচারের অনুপস্থিতি ইত্যাদি এ জাতীয় পাপের অন্যতম।

মহান আল্লাহ বলেন:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا قَرْيَةً كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

"আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিত, যেথায় আসত সবদিক থেকে প্রচুর জীবনোপকরণ, অতপর তারা আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল, ফলে তারা যা করত তার কারণে আল্লাহ তাদেরক আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির আচ্ছাদনের।"[২৪৮]

কাজেই আমরা যদি আল্লাহর নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেই থাকি আর পাশাপাশি ক্ষুধা ও ভয়-সন্ত্রাসের বেড়াজাল থেকে বের হতে চেষ্টা করি তবে চেষ্টা অনেক হলেও ফল আশানুরূপ হবে না। ক্ষুধা ও ভয়ের একটি জাল ছিন্ন করলে অন্য জাল আমাদের জড়াবে।

আল্লাহ আরো বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

"যারা পছন্দ করে যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক তাদের জন্য পৃথিবীতে এবং আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"[২৪৯]

কাজেই আমরা অশ্লীলতার প্রচার, প্রসার ও বিপনন অব্যাহত রেখে মহা-পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজ থেকে 'যন্ত্রণা দায়ক শাস্তি ' দূর বা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হব বলে চিন্তা করার কোনো সুযোগ নেই।

এ অর্থের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের আলোকে আমরা বিশ্বাস করি যে, অশ্লীলতা, ভেজাল, মাপ বা পরিমাপে কম প্রদান, প্রতারণা, জুলুম, হত্যাকাণ্ড, ন্যায়বিচারের দুষ্প্রাপ্যতা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ না করলে বিভিন্নভাবে সমাজে আল্লাহর শাস্তি ও গযব আসবেই। এগুলি রোধ করতে এবং সকল নাগরিকের জন্য বৈষম্যহীন ন্যায়বিচার লাভের সুযোগ নিশ্চিত করতে সমাজের সকল নাগরিক ও সরকারকে সচেতন প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এর পাশাপাশি সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও অন্যান্য সকল 'দুনিয়াবী যন্ত্রণা দায়ক শাস্তি' সমাজ থেকে নির্মূল বা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চালাতে হবে। তাহলেই আমরা আশানুরূপ ফল পাব, ইনশা আল্লাহ।

৩. ১১. ২. আলিম ও 'দায়ী'গণের করণীয়

জঙ্গিবাদে যেহেতু ইসলামের নাম ব্যবহার করা হচ্ছে সেহেতু এর নিয়ন্ত্রণে আলিম, ইমাম, আল্লাহর পথে দাওয়াতের লিপ্ত ব্যক্তি বা "দায়ী ইলাল্লাহ" এবং ধার্মিক মুসলিমদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। একথা সত্য যে, সাম্রাজ্যবাদ ও আগ্রাসন বিরোধী স্বাধীকার আন্দোলনকে জঙ্গিবাদ নাম দেওয়া হচ্ছে এবং জঙ্গিবাদের ধুয়া তুলে সারাবিশ্বে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষাকে নিন্দিত করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি নিজেদের প্রয়োজনে 'জঙ্গি' তৈরি করেছে এবং তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষাকে দায়ী করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। পাশাপাশি একথাও সত্য যে আমাদের দেশে ও বিভিন্ন দেশে কিছু মানুষ ইসলাম প্রতিষ্ঠা, ইসলামী রাষ্ট্র বা বিচার প্রতিষ্ঠা, অন্যায় প্রতিরোধ, অন্যায়কারীর শাস্তি ইত্যাদি ইসলাম-নির্দেশিত কর্মের নামে ইসলাম-নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হচ্ছেন। এদের বিভ্রান্তি দূর করার মূল দায়িত্ব আলিম ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের।

জঙ্গিবাদের জন্য পাশ্চাত্যকে, সাম্রাজ্যবাদী প্রচারণাকে বা ইসলামের শত্রুদেরকে দায়ী করে বক্তব্য দিলেই সব দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। পাশাপাশি বিভ্রান্তির তাত্ত্বিক পর্যালোচনা প্রয়োজন। ইসলামের নামে উগ্রতা বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত সকলেই অমুসলিমদের এজেন্ট বা ক্রীড়নক বলে মনে করার কারণ নেই। এদের মধ্যে কেউ এমন থাকলেও অন্য অনেক মানুষ রয়েছেন যারা দীনী আবেগ নিয়ে সাওয়াবের ও নাজাতের উদ্দেশ্যে উগ্রতা, সহিংসতা ও খুনখারাপিতে লিপ্ত হচ্ছেন। এদেরকে সঠিক জ্ঞান প্রদান ও বিভ্রান্তি অপনোদনের দায়িত্ব আলিম সমাজের। ইসলামী শিক্ষার বিকৃতি রোধ করার পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাত অনুসারে ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়ের নিষেধ ও দীনী দাওয়াতকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সঠিক পথের নির্দেশনা দেওয়া আলিমগণের দায়িত্ব।

৩. ১১. ২. ১. আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

আফগানিস্তান, সোমালিয়া বা ইরাকের মত ভৌগলিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে বাংলাদেশের। কাজেই সাম্রাজ্যবাদী, সম্প্রসারণবাদী ও আন্তর্জাতিক বেনিয়া-চক্র যে কোনো মূল্যে এদেশের উপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে চেষ্টা করবেন। কখনো তারা জঙ্গি তৈরি করবেন এবং কখনো জঙ্গিবাদের অযুহাতে ধার্মিক মানুষদের হয়রানি, অত্যাচার, ইসলাম প্রচারকদের কণ্ঠরোধ, ইসলামী শিক্ষা সংকোচন ইত্যাদির মাধ্যমে জঙ্গিবাদকে উস্কে দিয়ে দেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট করে সরকার ও প্রশাসনকে তাদের সহায়তা গ্রহণে বাধ্য করবেন।

এ ক্ষেত্রে আমাদের মত ক্ষুদ্র মানুষদের আল্লাহর কাছে ক্রন্দন করা ছাড়া তেমন কিছুই করার নেই। এ "ক্রন্দন"-কে অবহেলা করবেন না। আমাদের সকলেরই দায়িত্ব নিজের ব্যক্তিগত কষ্টে-বিপদে যেভাবে হৃদয়ের পরিপূর্ণ আবেগ দিয়ে আল্লাহর কাছে কাঁদি,

তেমনি পরিপূর্ণ আবেগ ও বেদনা নিয়ে দল-মত নির্বিশেষে উম্মাতের জন্য আল্লাহর কাছে স-ক্রন্দন দুআ করা। ঈমানের ন্যূনতম দাবী এ ক্রন্দন ও দুআ।

এখন প্রয়োজন এমন কিছু আল্লাহ-ওয়ালা আলিম ও 'দায়ী'র যারা একদিকে সরকার, প্রশাসন ও দায়িত্বশীলদেরকে পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও ভালবাসার সাথে গঠনমূলক পরামর্শ দিবেন এবং তাদের জন্য দুআ করবেন। অপরদিকে দীনের দাওয়াতে আগ্রহী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ধার্মিক মানুষদেরকে হটকারিতা, উগ্রতা ও হতাশা পরিত্যাগ করে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ অনুসারে ধৈর্য, প্রজ্ঞা, 'সহিংসতার পরিবর্তে অহিংসতা' ও 'খারাপের মুকাবিলায় ভাল আচরণ' দ্বারা দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখার অনুপ্রেরণা দিবেন। তাঁরা হটকারিতার মাধ্যমে দাওয়াতকে সহিংসতায় লিপ্ত করার তাত্ত্বিক বিভ্রান্তিগুলি মুমিনদের জন্য প্রকাশ করবেন। তাঁদের ধার্মিকতা, ইখলাস, ইলম ও আমল মুমিনদেরকে তাদের পরামর্শ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে।

এরূপ আল্লাহ-ওয়ালা আলিম ও দায়ীদের অভাব আমরা অনুভব করি। অন্তত সমাজের মূলধারার আলিম-উলামা, চিন্তাবিদ ও পীর-মাশাইখ কিছুটা ঐক্যবদ্ধ হলে তাঁরা সমবেতভাবে এরূপ দায়িত্ব পালনে অধিকতর সক্ষম হতেন। তাঁরা যদি সুন্নাতের আলোকে কিছু মতভেদ মেনে নিয়ে "জামা'আত" বা ঐক্য ও পারস্পরিক ভালবাসা প্রতিষ্ঠা করতেন এবং উম্মাতে মুহাম্মাদীর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা নিয়ে সকলে মিলে জঙ্গিবাদের মত বিষয়ে মতবিনিময় করতে পারতেন তাহলে দীনের নামে সকল বিভ্রান্তি ও উগ্রতা সহজেই দূরীভূত করা সম্ভব হতো।

কিন্তু বাহ্যত তা সম্ভব নয়। যদিও কুরআন-হাদীসে বারংবার ঐক্য ও ভালবাসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তবুও এ নির্দেশ প্রতিষ্ঠার সুযোগ বর্তমানে আমাদের আছে বলে মনে হচ্ছে না। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!

৩. ১১. ২. ২. উগ্রতার প্রসারে দায়ীগণের বিচ্ছিন্নতার ভূমিকা

আলিম-উলামা, পীর-মাশাইখ ও "দায়ী"-গণের পারস্পরিক শত্রুতা, বিচ্ছিন্নতা, দলাদলি ও গালাগালিতে দীনের শত্রুদের ছাড়া আর কারো কল্যাণ হচ্ছে বলে আমরা দেখছি না। এরূপ বিভক্তির কারণে একদিকে যেমন ইসলামের দাওয়াত ব্যাহত হচ্ছে এবং দীনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার হচ্ছে, অপরদিকে সমাজের অনেক আবেগী যুবক মূলধারার আলিম-উলামা ও পীর-মাশাইখদের বিষয়ে হতাশা ও কুধারণা পোষণ করে উগ্রতার আহ্বানকারীদের ক্ষপ্পরে পড়ে যাচ্ছে।

৩. ১১. ২. ৩. বিভক্তির পরিণতি

পতন ও অবক্ষয়ের যুগগুলিতে বিভক্তি ও দলাদলির এ অবস্থা থেকেছে। ক্রুসেড ও তাতার যুদ্ধের সময় শিয়া-সুন্নী, হানাফী-শাফিয়ী, শাফিয়ী-হাম্বলী এরূপ হানাহানি চলেছে। বিবাদমান বিভিন্ন দল ক্রুসেডার বা তাতারদের বুঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, আমরা আপনাদের পক্ষের শক্তি, আমাদের প্রতিপক্ষরাই আপনাদের শত্রু, কাজেই তাদের ঘায়েল করুন। কিন্তু ক্রুসেডার বা তাতারগণ যখন হত্যাকাণ্ড চালিয়েছেন তখন পক্ষ-বিপক্ষ বিচার করেন নি, সকল পক্ষের সকল মুসলিম নারী-পুরুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছেন। বর্তমানে বোসনিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, সোমালিয়া ও অন্যান্য দেশে আমরা একই অবস্থা দেখতে পাই। আলিমগণ একে অপরকে খারাপ বলেছেন। আর দখলদার বাহিনী তাদের বোমাবর্ষণ ও গণহত্যাযজ্ঞে সকলকে নির্বিচারে হত্যা করেছেন, কে কোন্ মতের তা যাচাই করছেন না।

৩. ১১. ২. ৪. বিভক্তির আগুনে ঘৃতাহুতি না দেওয়া

এ বিভক্তি ও দলাদলি দুঃখজনক হলেও এজন্য হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। এর মধ্য দিয়েই দীনী দাওয়াত এগিয়ে চলেছে ও চলবে। আমাদেরকেও দাওয়াত এগিয়ে নিতে হবে। আমরা হয়ত উম্মাতের এ বিভক্তি দূর করতে পারব না, তবে আমাদের দ্বারা যেন কোনো অবস্থাতেই উম্মাতের বিভক্তি ও বেদনা বৃদ্ধি না পায়। আমরা অনেক সময় ঐক্যের কথা বলি, তবে আমাদের বিভিন্ন মতবাদ আমাদের অজ্ঞাতসারেই অনৈক্য ও উগ্রতা উস্কে দেয়। এর অন্যতম বিষয় হলো 'নিজেদের কর্ম বা কর্মপদ্ধতিকে' একমাত্র "সঠিক" বা একমাত্র "পরিপূর্ণ" বলে দাবি করা।

অতীতে ও বর্তমানে আমাদের দেশে ও সকল মুসলিম দেশে ইসলামী দাওয়াতের দায়িত্ব বিভিন্নভাবে পালিত হয়েছে ও হচ্ছে। তন্মধ্যে চারটি ধারা উল্লেখযোগ্য: (১) শিক্ষা বিস্তার, (২) গণ-দাওয়াত, (৩) দরবার-খানকা ও (৪) রাজনীতি। এ চারটি ধারার মাধ্যমে সকলেই একটি ইবাদতই পালন করছেন, যার নাম "আল্লাহর পথে দাওয়াত"। প্রত্যেকে নিজের পদ্ধতিকে উত্তম প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন দলীল প্রমাণ পেশ করতে যেয়ে এমন ধারণা দিচ্ছেন যে, তার পদ্ধতির বাইরের পদ্ধতিগুলিতে যারা এ ইবাদত পালন করছেন তাদের ইবাদত হচ্ছে না বা কম মানের হচ্ছে। এভাবে মানের কারণে নয়, শুধু পদ্ধতির কারণে অন্যের কর্মকে অবমূল্যায়ন করার ফলে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ অপসারিত হচ্ছে, দলাদলি ও গালাগালি বৃদ্ধি পাচ্ছে, পারস্পরিক সহনশীলতা কমছে, উগ্রতা বাড়ছে এবং উগ্রতার পটভূমি প্রসারিত হচ্ছে। সর্বোপরি এভাবে বিচ্ছিন্নতা স্থায়ী হচ্ছে এবং উগ্রতা ও অন্যান্য অবক্ষয় রোধে ঐক্যবদ্ধ ইজতিহাদের সম্ভাবনা রহিত হচ্ছে।

৩. ১১. ২. ৫. সঠিক দাওয়াত ও বিকৃতি রোধ

আমাদের দায়িত্ব, সকল প্রতিকূলতার মধ্যে দীনী দাওয়াতকে অব্যাহত রাখা এবং পাশাপাশি দীনের যে সকল শিক্ষা বিকৃত করে একজন মুমিনকে উগ্রতায় লিপ্ত করা সম্ভব সেগুলির সঠিক চিত্র মুসলিম উম্মাহর কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করা। আমরা এ গ্রন্থে আমাদের সীমিত যোগ্যতা ও সীমিত জ্ঞানের আলোকে এ বিষয়ক কিছু তথ্য উল্লেখ করেছি। আশা করছি, যোগ্য ও প্রাজ্ঞ আলিমগণ এগুলির ভুলভ্রান্তি সংশোধন করে এ বিষয়ে আরো উন্নত গবেষণা উম্মাতের জন্য পেশ করবেন।

৩. ১১. ২. ৬. তাকফীর, ঘৃণা ও অসহিষ্ণুতা বর্জন

Contents

সকল প্রতিকূলতার মধ্যেও সুন্নাতে নববী ও সুন্নাতে সাহাবার আলোকে আল্লাহর পথে দাওয়াতের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। দাওয়াতের ক্ষেত্রে যে সকল সাধারণ ভুলত্রুটি উগ্রতা ও অসহিষ্ণুতা ছড়াতে পারে তা সচেতনতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এগুলির অন্যতম হলো দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রতিকূলতার কারণে বিরোধীদেরকে কাফির, ইসলামের শত্রু বা অনুরূপ বিশেষণে আখ্যায়িত করার প্রবণতা।

বস্তুত সমাজকে, সমাজের নেতৃবৃন্দকে বা আলিমগণকে ঘৃণা না করে কেউ সন্ত্রাসী, চরমপন্থী বা জঙ্গি কর্মে লিপ্ত হতে পারে না। আর আলিম-উলামা, পীর-মাশাইখ ও দীনের দাওয়াতে কর্মরত অনেকেই জেনে অথবা না জেনে এরূপ ঘৃণা ছড়াচ্ছেন। "তাকফীর" বা কাফির কথন আমাদের সমাজে বিভিন্নভাবে বিদ্যমান। আমাদের অনেকে খারিজী, মুতাযিলী ও অন্যান্য বিভ্রান্ত ফিরকার ন্যায় দ্ব্যর্থবোধক বক্তব্য, মতামত, মতভেদীয় বিষয় বা মুসতাহাব-মাকরূহ বিষয়াদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা ব্যাখ্যা দিয়ে কুফরী বলে প্রমাণের চেষ্টা করছেন। দলগত, পদ্ধতিগত বা মাসআলাগত মতভেদে বা কর্মপদ্ধতির ভিন্নতার কারণে একে অপরকে "ইসলামের শত্রু", "শত্রুদের দালাল", "ইহূদী-খৃস্টানদের এজেন্ট", "নবী-ওলীগণের দুশমন", ইত্যাদি বলে পারস্পারিক ঘৃণা উস্কে দিচ্ছেন। এ সবই "তাকফীর" বা কাফির কথনের বিভিন্ন রূপ। এসবই ধর্মীয় উগ্রতা উস্কে দিচ্ছে।

দলগত, পদ্ধতিগত বা মাসআলাগত মতভেদের কারণে "ইসলামের শত্রু", 'শত্রুদের দালাল' বা অনুরূপ কোনো বিশেষণে আখ্যায়িত করা বর্জন করতে হবে। কোনো আলিম বা ইসলামী ব্যক্তিত্ব আপনার মতের বিরোধিতা করলে, আপনার সাথে শত্রুতা করলে বা আপনার বিরুদ্ধে ফাতওয়া দিলে আপনি তাকে ইসলামের শত্রু বলে গণ্য করবেন না। বরং বিষয়টিকে তার ইজতিহাদ ও ভুল বলে গণ্য করে হৃদয়ে তার ভালবাসা, কর্মে তার সাথে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ ও তার জন্য দুআ অব্যাহত রাখুন। আল্লাহ বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"হে মুমিনগণ, কোনো সম্প্রদায় যেন অপর সম্প্রদায়কে উপহাস-বিদ্রূপ না করে; হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। কোনো নারী যেন অন্য নারীকে বিদ্রূপ-উপহাস না করে; হতে পারে সে বিদ্রূপকারিনী অপেক্ষা উত্তম। আর তোমরা একে অপরকে নিন্দা করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপাধি দিয়ে ডেকো না। ঈমানের পর পাপী নাম পাওয়া খুবই খারাপ বিষয়। আর যারা তাওবা করে না তারাই যালিম।"[২৫০]

এ নির্দেশনা কার জন্য? আল্লাহর এ নির্দেশ কি পারস্পরিক (reciprocal)? অর্থাৎ যে আমাকে ভাল বলবে আমি তাকে ভাল বলব? নাকি এ নির্দেশ পালন আমার-আপনার সার্বক্ষণিক দায়িত্ব? অন্যরা আপনাকে উপহাস-বিদ্রূপ করে, নিন্দা করে বা মন্দ উপাধি দেয় বলে আপনিও তাদেরকে অনুরূপ করবেন? এরূপ কোনো অনুমতি কি আল্লাহ দিয়েছেন? কেউ পালন করুক আর না করুক, আমি সর্বাবস্থায় আল্লাহর এ সকল নির্দেশ পালন করব-এরূপ সিদ্ধান্ত কি আমরা নিতে পারি না?

অনেক মুসলিম অজ্ঞতা বা জাগতিক স্বার্থের কারণে দীনী দাওয়াতের বিরোধিতা করেন। তারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে বিশ্বাস করেন, ইসলামের কিছু বিধান পালন করেন, কিন্তু আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের মতামতকে ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি বলে মনে করেন। যেমন, অনেকে সালাতুল ঈদ, সালাতুল জানাযা, শবে-বরাতের সালাত ইত্যাদি আদায় করেন, কুরবানী, আকীকা, কুলখানী ইত্যাদি পালন করেন, কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের বিষয়ে বা পর্দাপালন, সুদ-বর্জন, নৃত্যগীতি-বর্জন ইত্যাদি বিষয়ে কড়াকাড়িকে ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি বলে মনে করেন। তাদের এ অজ্ঞতার জন্য তাদের নিজেদের অবহেলার পাশাপাশি যুগযুগ ধরে সমাজের সাধারণ আলিমগণের দীন প্রচারের ক্ষেত্রে অবহেলা ও দুর্বলতাও দায়ী।

এদের বিরোধিতার কারণে আল্লাহর পথে আহ্বানকারীরা এদেরকে বিভিন্ন ভাবে "তাক্ফীর" করেন। তাদেরকে 'কাফির', 'কাফির পর্যায়ের' বা 'ইসলামের শত্রু' আখ্যায়িত করে কঠিনভাবে তাদের বিরুদ্ধে আক্রোশমূলক কথা বলেন। নামায-রোযা পালন করলেও তাদের কোনো লাভ হবে না বলে দাবি করেন। কালিমা পড়ে এবং নামায-রোযা পালন করেও তারা কাফির বা কাফির পর্যায়ের থাকবে বলে ঘোষনা করেন!! এরূপ আচরণ ও কথাবার্তা বিভিন্নভাবে সহিংসতা ছড়ায়। এগুলিকে হালকা করে দেখার কোনো উপায় নেই। কারণ এরূপ একটি উগ্রতা পরবর্তী অনেক উগ্রতার পথ খুলে দেয়।

আল্লাহর নির্দেশানুসারে খারাপের মুকাবিলায় উত্তম দিয়ে, সুন্দর উপদেশ, প্রজ্ঞা এবং উত্তম বিতর্কের মাধ্যমে তাদের বিভ্রান্তি চিহ্নিত করুন, এরূপ বিভ্রন্তি যে কুফরীতে নিপতিত করতে পারে তা বুঝান এবং তাদেরকে দীনের সঠিক জ্ঞান প্রদানের চেষ্টা করুন। কিন্তু কখনোই "ইসলামের শত্রু" ইত্যাদি বলে "তাকফীরের" মত কঠিন পাপের মধ্যে নিপতিত হবেন না।

এদের অনেকেই "দায়ী" বা প্রচারকের "গরম" ও আক্রমনাত্মক কথা ও আচরণের কারণেই দাওয়াতের বিরোধিতা করেন। আর "দায়ী" নিজেকে ইসলামের প্রতিভূ বিবেচনা করে তার বা তার মতের সাথে শত্রুতার কারণে মুসলিমকে ইসলামের শত্রু বানিয়ে দেন। এভাবে উগ্রতার দরজা খুলে যায়।

আল্লাহ 'হক্ক' কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন কিন্ত 'গরম' কথা বলতে নির্দেশ দেননি। হক্ক কথাকে নরম করে বলতে নির্দেশ

দিয়েছেন। বিশ্বের অন্যতম তাগূত খোদাদ্রোহী জালিম ফিরাউনের কাছে মূসা ও হারূন (আ) কে প্রেরণ করে তিনি নরম কথার নির্দেশ দিয়ে বলেন:

اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولا لَهُ قَوْلا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

"তোমর উভয়ে ফিরাউনের নিকট গমন কর, সে অবাধ্যতা ও সীমালংঘন করেছে। তোমরা তার সাথে নরম কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে বা ভয় করবে।"[২৫১]

এ যদি হয় কাফিরকে আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণের প্রতি নির্দেশ, তাহলে যারা কালিমা পড়েছেন, মুসলিম বলে নিজেকে মনে করছেন তাদেরকে আদেশ নিষেধ করার ক্ষেত্রে আমাদের আরো কত বিনম্র ও বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া উচিত তা একটু চিন্তা করুন। আল্লাহ আরো বলেন:

وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

"তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিবে না; কারণ ফলে তারা সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দিবে।"[২৫২]

এ যদি হয় কাফিরদের পূজনীয়দের ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ, তাহলে মুসলিমকে আদেশ-নিষেধ করতে যেয়ে তাকে, তার ভ্রান্ত বা জাগতিক মতের নেতা বা সাথীদেরকে গালি দেওয়া কিভাবে বৈধ হবে? আল্লাহ বলেন:

وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

"এবং তোমরা উত্তম আচরণে ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থের অনুসারীদের সাথে বিতর্ক করো না; তাদের মধ্যে যারা জুলুম করেছে তাদের সাথে ছাড়া।"[২৫৩]

ইহূদী-খৃস্টানগণ "কিতাব" মানার দাবি করেছে, কিন্তু কখনোই মানে নি, বরং উল্টো চলেছে এবং কিতাব বিকৃত করেছে বলে আল্লাহই জানিয়েছেন, তারপরও তাদের সাথে এরূপ উত্তম আচরণের নির্দেশ দিলেন আল্লাহ। তাহলে যে ব্যক্তি কুরআন মানার দাবি করছেন, কিন্তু মানছেন না বলে আপনি দাবি করছেন, তার সাথে আপনার আচরণ কিরূপ হওয়া দরকার?

দীন প্রতিষ্ঠার কর্মে নিয়োজিত সকলকেই বুঝতে হবে যে, আমরা "আল্লাহর পথে দাওয়াত" নামক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত পালন করছি। এ ইবাদত যদি কুরআন-সুন্নাহর শেখানো পদ্ধতিতে সুন্নাত-সম্মত পন্থায় পালন করতে পারি, তবে আমরা অভাবনীয় সাওয়াব অর্জন করতে পারব। বিশেষত কুফর, ইলহাদ, ব্যক্তিমতপূজা, স্বার্থপরতা ও অবক্ষয়ের যুগে দাওয়াত ও আদেশ-নিষেধের দায়িত্ব পালন খুবই বড় কাজ। এ পরিস্থিতিতে সুন্নাতপদ্ধতিতে দাওয়াতের দায়িত্ব পালনকারী একজন মুমিন ৫০ জন সাহাবী বা সিদ্দীকের সাওয়াব লাভ করবেন বলে সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৫৪]

কিন্তু আমরা যদি এ ইবাদত কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত পদ্ধতির ব্যতিক্রমভাবে পালন করি বা আমাদের প্রবৃত্তি ও প্রতিশোধস্পৃহার তাড়নায় উগ্রতায় লিপ্ত হই তাহলে আমরা কঠিন পাপে নিপতিত হওয়ার পাশাপাশি ইসলাম ও দীনী দাওয়াতকে কলঙ্কিত করব এবং প্রকৃত অর্থে আমরাই আল্লাহর কাছে "ইসলামের শত্রু" বলে গণ্য হব। নাউযু বিল্লাহ মিন যালিকা!

মুমিনের আচরণ ও প্রকৃতি বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

الْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَيُؤْلَفُ وَلاَ خَيْرَ فِيمَنْ لاَ يَأْلَفُ وَلاَ يُؤْلَفُ

"মুমিন ঐ ব্যক্তি যে নিজে অন্যদেরকে ভালবাসে এবং অন্যেরাও তাকে ভালবাসে। যে ব্যক্তি নিজে অন্যদের ভালবাসে না এবং অন্যরাও তাকে ভালবাসে না তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।"[২৫৫]

মুমিনের এ প্রকৃতি কাদের জন্য? যারা তার দলের, মতের বা তাকে ভক্তি করে তাদের জন্য? না জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য?

দেশের প্রায় ৯০% মুসলিম দীন সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা রাখেন না। তারা ইসলাম বলতে যা বুঝেন তা তারা পালন ও প্রতিষ্ঠা করেন। তাদেরকে ইসলামের সঠিক জ্ঞান দান করা আলিম ও দায়ীগণের দায়িত্ব। কষ্ট করে দীনের দাওয়াত না দিয়ে আপনি রাতারাতি ইসলাম কায়েম করতে চান? পাপের কারণে আপনি পাপীদেরকে মেরে কমিয়ে ফেলতে চান? অথচ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কাফিরদেরকে বাঁচাতে উদগ্রীব ছিলেন, হয়ত তাদের পরবর্তী প্রজন্মদের মধ্য থেকে কেউ মুসলিম হবে। মক্কাবাসীদের অত্যাচারে জর্জরিত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তায়েফে যেয়ে পেলেন নির্মমতম অত্যাচার। সে সময়ে জিবরাঈল (আ) পাহাড়ের ফিরিশতাকে নিয়ে তাঁর নিকট আগমন করে বলেন, আপনার অনুমতি হলে পাহাড় উঠিয়ে এ সকল জনপদ ধ্বংস করে দেওয়া হবে। কঠিনতম কষ্টের সে মুহূর্তেও তিনি বলেন,

بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

"না। বরং আমি আশা করি যে, আল্লাহ হয়ত এদের ঔরস থেকে এমন মানুষের জন্ম দেবেন যারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কিছু শরিক করবে না।"[২৫৬]

যে কাফিরগণ তাঁর দেহকে রক্তরঞ্জিত করছে তাদেরই জন্য তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন, যেন তাঁকে আঘাতের কারণে আল্লাহ তাদের ধ্বংস না করেন। তিনি তাঁর কপালের রক্ত মুছছেন এবং বলছেন,

رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ

"হে আমার প্রতিপালক, আমার জাতিকে আপনি ক্ষমা করে দিন, কারণ তারা জানে না।"[২৫৭]

৩. ১১. ২. ৭. দুনিয়ামুখিতা বা ফলাফল-মুখিতা

অন্য যে বিষয়টি উগ্রতার পথ উন্মুক্ত করে তা হলো দাওয়াতের দুনিয়ামুখিতা ও দুনিয়ার ফলাফল বিচার। রাতারাতি, অল্প কিছু দিনে বা বৎসরে বা পরিকল্পিত সময়ের মধ্যে সব কিছু ভাল করে ফেলার বা কোনো জাগতিক "ফল" অর্জন করার চিন্তা যেমন অবাস্তব ও আল্লাহর সুন্নাতের বিরোধী, তেমনি কিছুই হবে না বলে হতাশ হয়ে পড়া অথবা বলে কিছু লাভ হবে না মনে করে দাওয়াতের দায়িত্বে অবহেলা করাও ধ্বংসাত্মক ও আল্লাহর আদেশের বিরোধী। ইসলামের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি আল্লাহ দিয়েছেন এবং তিনিই একে এগিয়ে নিবেন। মুমিনের দায়িত্ব সুন্নাতের আলোকে নিজের কর্ম আঞ্জাম দেওয়া।

৩. ১১. ২. ৮. ইসলামের বিপন্নতায় হতাশা

হতাশা মানুষকে মরিয়া (desperate) করে তোলে। এতে মানুষ উগ্রতায় নিপতিত হয়। মুমিন সমকালীন পরিস্থিতি দেখে ইসলামের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হয়ে এরূপ মরিয়া হয়ে উঠতে পারেন।

ইসলাম বিপন্ন বলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। পোপের নির্দেশে ও অনুপ্রেরণায় ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ, ধর্ম প্রতিষ্ঠা ও বিনা-হিসাবে জান্নাত গমনের উন্মাদনা নিয়ে সমগ্র ইউরোপ একত্রিত হয়ে ১০৯৫ খৃ/৪৮৮ হি থেকে প্রায় ২ শত বৎসর বর্বর ক্রুসেড যুদ্ধ করেছে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলির বিরুদ্ধে। পঙ্গপালের মত মিলিয়ন মিলিয়ন ধর্মযোদ্ধা ক্রুশ উচিয়ে মুসলিম দেশগুলিতে ঝাপিয়ে পড়েছে, নারী, পুরুষ ও শিশু-সহ লক্ষলক্ষ মানুষ হত্যা করেছে এবং একের পর এক মুসলিম দেশ দখল করে নিয়েছে। ক্রুসেডারগণ দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, কয়েক বছরের মধ্যেই তারা মক্কা ও মদীনা দখল করে ইসলামকে চিরতরে নির্মুল করবেন। সমাজ সচেতন মুসলিম ও 'দায়ী'গণ অনেকেই ভেবেছেন, ইসলাম বুঝি বিপন্ন।

কিন্তু ইসলাম বিপন্ন হয় নি। পাপ, অনাচার, জুলুম, দলাদলি ও হানাহানিতে লিপ্ত মুসলিমগণ শাস্তি পেলেও ইসলাম বিজয়ী হয়েছে। মুসলিমদের ঐক্য ও প্রস্তুতি ছিল না। তার পরও মুসলিমগণ আগ্রাসী ক্রুসেডারদের সকল মুসলিম ভূমি থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছেন। উপরন্তু ক্রুসেড যুদ্ধের পরে এরই ধারাবাহিকতায় ক্রমান্বয়ে মুসলিমগণ পূর্ব ইউরোপের প্রায় অর্ধাংশ অধিকার করতে সক্ষম হন। ক্রুসেডারগণ চেয়েছিলেন ইসলামকে মধ্যপ্রাচ্য থেকে মুছে দিতে। কিন্তু এ যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলাম ইউরোপে স্থায়ীভাবে তার আসন গেড়েছে।

ক্রুসেড যুদ্ধের পরেই পূর্ব থেকে তাতার আক্রমন শুরু হয়েছে। অকল্পনীয় বর্বর সে আক্রমনের সামনে একের পর এক মুসলিম দেশের পতন হয়েছে। লক্ষলক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। ধ্বংস হয়েছে সম্পদ ও মানব ঐতিহ্য। মুসলিমগণ ভেবেছেন, ইসলাম বুঝি শেষ। কিন্তু পাপ, অনাচার ও বিচ্ছিন্নতায় আকণ্ঠ লিপ্ত মুসলিম সমাজের মানুষেরা শাস্তি পেলেও ইসলাম শেষ হয় নি। যে সময়ে তাতারদের হাতে ইরান, ইরাক, সিরিয়া অন্যান্য দেশের মুসলিমগণ নিহত হচ্ছেন, সে সময়ে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন্স, ব্রুনাই, থাইল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশের অগণিত মানুষ ক্রমান্বয়ে ইসলামের ছায়াতলে আগমন করছেন। সর্বোপরি যে বর্বর তাতার জাতি অমানবিক আক্রোশে মুসলিম দেশগুলি ধ্বংস করেছে, মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে তারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং সারা বিশ্বে ইসলামী বিজয়ের ঝাণ্ডাকে এগিয়ে নিতে থাকে। মানব ইতিহাসের এ এক অলৌকিক বিষয়। একটি বিজয়ী জাতি মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে একটি বিজিত জাতির ধর্ম গ্রহণ করে সে ধর্মের বিজয় তরান্বিত করতে লাগল!

অনুরূপভাবে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে মুসলিম দেশগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন করে এবং প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ককে পরাজিত করে ক্রুসেডারগণ ভেবেছিলেন যে, ইসলামের রাজনৈতিক পরিচিতি মুছে ফেলা সম্ভব হয়েছে এবং অচিরেই মিশনারি কর্ম ও ধর্মান্তরের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মও বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু তাদের সে চিন্তা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে স্বাধীন মুসলিম দেশগুলিতে পুনরায় ইসলামী জাগরণ ও ইসলমী জীবনব্যবস্থার দিকে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জোরদার হতে থাকে। এ দাবী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের হৃদয় স্পর্শ করে। তখনই এ দাওয়াতকে "উগ্রতা"-র পথে পরিচালিত করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। মিসরের ইখওয়ানুল মুসলিমীন ও অন্যান্য ইসলামী দাওয়াতী কর্মকাণ্ডকে জামাল আব্দুন নাসির ক্ষমতায় আরোহণের জন্য ব্যবহার করেন। এরপর অতর্কিত নির্যাতন-নিপীড়নের মাধ্যমে এ সকল দাওয়াতী কর্মকাণ্ডকে উগ্রতার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। এতে জনপ্রিয় দাওয়াত জনবিচ্ছিন্ন উগ্রতায় পর্যবসিত হতে থাকে। যখন দাওয়াতের নেতৃবৃন্দ একে মধ্যপন্থায় আনতে চেষ্টা করেন, তখন আবার "জামাআতুল মুসলিমীন" ধরনের উগ্র দল সৃষ্টি করে আলিম, আল্লাহর পথে দাওয়াতদানকারী ও ধার্মিক

মানুষদেরকে এবং ইসলামী জাগরণকে জনগণের কাছে ঘৃণ্য ও জনবিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা চলে।

১৯৮৮-১৯৯২ সালে আলজেরিয়ায় ইসলামী দাওয়াত জনপ্রিয়তা লাভ করে। জাতীয় নির্বাচনে ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করে। সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচনের ফলাফল বাতিল করে ইসলামপন্থীদেরকে উগ্রতার পথে ঠেলে দেওয়া হয়। আবেগতাড়িত হয়ে তারা অস্ত্র ও সহিংসতার পথে পা বাড়ায়। আর এর ফলে জনপ্রিয় একটি আন্দোলন জনবিচ্ছিন্ন ও জনধিকৃত সন্ত্রাসে রূপান্তরিত হয়।

এভাবে সর্বদা জনপ্রিয় দীনী দাওয়াতকে উগ্রতার মাধ্যমে জনবিচ্ছিন্নন ও জনধিকৃত বানিয়ে ফেলা হয়েছে। প্রয়োজেন উগ্রতার প্রচারকদের রোপন করা হয়েছে। এ বিষয়ে আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের সতর্ক হতে হবে।

জামাআতুল মুসলিমীনের কর্মকাণ্ড থেকে মিসর ও ইস্রায়েল সরকার সকল সুবিধা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু দীনী দাওয়াত নির্বিচার নিপীড়ন ও নির্যাতন ছাড়া কিছুই পায়নি। ৯/১১ বা ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে হামলা থেকে আমেরিকার নব্য-রক্ষণশীলগণ ও যায়নবাদী ইহূদীগণ সকল প্রকার সুবিধা লাভ করেছেন, কিন্তু মুসলিম উম্মাহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনুরূপ "জামাআতুল মুসলিমীন" বা "৯/১১" তৈরির চেষ্টা বারংবারই করা হবে। এর ক্ষপ্পরে যেন আবেগী যুবকগণ না পড়েন তা নিশ্চিত করতে দীন প্রতিষ্ঠা বা দীনী দাওয়াতের সুন্নাত-সম্মত পদ্ধতি এবং বিভ্রান্তির উৎসগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

কোনো অবস্থাতেই হতাশ হওয়া বা দ্রুত ফল লাভের চেষ্টা করা মুমিনের কর্ম নয়। মুমিনের দায়িত্ব কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ অনুসারে নিজের দায়িত্ব পালন করা। কোনো মুসলিম রাষ্ট্র জিহাদের শর্ত পূরণ করে জিহাদের আহ্বান করলে সম্ভব হলে সে জিহাদে শরীক হওয়া। আর সর্বাবস্থায় কুরআন ও সুন্নাতের নির্দেশানুসারে সাহাবীগণ ও পরবর্তীগণের কর্মধারার আলোকে ধৈর্য, প্রজ্ঞা, ও বিনম্রতার সাথে দীনের দাওয়াত এগিয়ে নেওয়া।

ইসলামের ইতিহাস থেকে আমরা দেখি যে, সুন্নাতের আলোকে সাহাবীগণের পন্থাই ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও সংস্কারের সঠিক পন্থা। অন্যায় পরিবর্তনের আবেগ, দ্রুত ফল লাভের উদ্দীপনা বা অন্যায়ের প্রতি অপ্রতিরোধ্য ঘৃণা ইত্যাদির কারণে আবেগী হয়ে যারা সন্ত্রাস, সহিংসতা বা যুদ্ধের পথ বেছে নিয়েছেন তারা ইসলামের কোনো কল্যাণ করতে পারেন নি। খারিজীগণ, বাতিনীগণ ও অন্যান্য সন্ত্রাসী গোষ্ঠী তাদের অনুসারীদের অনেক গরম ও আবেগী কথা বলেছেন এবং অনেক 'পরিবর্তনের' স্বপ্ন দেখিয়েছেন। কিন্তু তারা স্বল্প সময়ের কিছু ফিতনা ছাড়া কিছুই করতে পারেন নি। পক্ষান্তরে মধ্যপন্থা অনুসারী আলিমগণ বিদ্রোহ, উগ্রতা, শক্তিপ্রয়োগ, জোরপূর্বক সরকার পরিবর্তন ইত্যাদি পরিহার করে শান্তি-পূর্ণভাবে জনগণ ও সরকারকে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের মাধ্যমে যুগে যুগে মুসলিম সমাজের অবক্ষয় রোধ করেছেন।

শেষকথা

"ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ"-এর ইতিহাস, প্রেক্ষাপট, কারণ, উত্তরণ ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীগণের কর্মধারার আলোকে কিছু কথা লিখলাম। এর মধ্যে যদি কোনো কল্যাণকর কিছু থাকে তবে তা আমার করুণাময় প্রতিপালক আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর একান্ত দয়া। আর এর মধ্যে ভুলভ্রান্তি যা আছে তা সবই আমার নিজের দুর্বলতা ও শয়তানের প্রবঞ্চনার কারণে। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয়তম হাবীব ও খলীল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ), তাঁর পরিজন, সহচর ও অনুসারীগণের উপর। আর প্রথমে ও শেষে, সর্বদা ও সর্বত্র সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর নিমিত্ত।

গ্রন্থপঞ্জী

এ গ্রন্থে যে সকল গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে বা তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে সেসকল গ্রন্থের একটি মোটামুটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো। গ্রন্থগুলি গ্রন্থকারের মৃত্যুতারিখের ভিত্তিতে ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে সাজানো হয়েছে।

১. আবু হানীফা নুমান ইবনু সাবিত (১৫০হি.), আল-ফিকহুল আকবার, মুল্লা কারীর শারহ সহ, (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪)
২. শাফিয়ী, মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস (২০৪হি) আল-উম্ম (বৈরুত, দারুল মারিফাহ, ১৩৯৩ হি)
৩. আব্দুর রায্যাক সানআনী (২১১ হি), তাফসীরুল কুরআন (আল-মাকতাবুতশ শামিলা, ৩.৫ (www.sonnhonline.com)
৪. ইবনু আবী শাইবা, আবূ বাকর (২৩৫হি), আল-মুসান্নাফ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫)
৫. আহমদ ইবনু হাম্বাল (২৪১হি), আল-মুসনাদ (কাইরো, কুরতুবাহ, ও মা'আরিফ, ১৯৫৮)
৬. দারিমী, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমান (২৫৫ হি.), আস-সুনান (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ৩.৫: http://www.islamic-council.com)
৭. বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (২৫৬হি), আস-সহীহ (বৈরুত, দারু কাসীর, ইয়ামাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৭)
৮. বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর (বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর)
৯. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২৬১হি), আস-সহীহ (কাইরো, এহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যা)
১০. আবূ দাউদ, সুলাইমান ইবনু আশ'আস (২৭৫হি), আস-সুনান (বৈরুত, দারুল ফিকর)
১১. ইবনু মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ (২৭৫ হি.), আস-সুনান (বৈরুত, দারুল ফিকর)
১২. তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা (২৭৯ হি), আস-সুনান (বৈরুত, দারু এহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী)
১৩. মুবার্‌রিদ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ (২৮৫হি), আল-কামিল (বৈরুত, মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৩)
১৪. নাসাঈ, আহমদ ইবনু শু'আইব (৩০৪হি), আস-সুনানুল কুবরা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯১)
১৫. তাবারী, আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর (৩১০ হি), তাফসীর: জামিউল বায়ান (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৪০৫ হি)
১৬. আবূ আওয়ানা, ইয়াকূব ইবনু ইসহাক (৩১৬), আল-মুসনাদ (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮)
১৭. আবু জা'ফর তাহাবী, আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৩২১হি.), আল-আকীদা আত-তাহাবীয়্যাহ, ইবনে আবীল ইজ্জ হানাফীর শারহ সহ, (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৯ম. ১৯৮৮)
১৮. আবূ জাফর তাহাবী, মাতনুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, (কাইরো, মাকতাবাতু ইবনি তাইমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮)
১৯. ইবনু হিব্বান, মুহাম্মাদ আল-বুসতি (৩৫৪হি), আস-সহীহ (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৩)
২০. আল-আজুর্‌রী, মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন (৩৬০হি), আশ-শারী'আহ (রিয়াদ, মাকতাবাতু দারিস সালাম, ১ম মুদ্রণ ১৯৯২)
২১. হাকিম নাইসাপূরী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪০৫হি), আল-মুসতাদরাক (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০)
২২. বাগদাদী, আব্দুল কাহির ইবনু তাহির (৪২৯ হি), আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক (বৈরুত, দারুল মারিফাহ)
২৩. দানী, আবূ আমর উসমান ইবনু সাঈদ (৪৪৪ হি), আস-সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান (রিয়াদ, দারুল আসিমা, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৬ হি)
২৪. ইবনু হাযম, আলী ইবনু আহমদ (৪৫৬হি), আল-মুহাল্লা (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ)
২৫. ৪৫৮ বাইহাকী, আহমাদ ইবনুল হুসাইন (৪৫৮ হি), আস-সুনানুল কুবরা (মাক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতু দারিল বায, ১৯৯৪)
২৬. ৪৫৮ বাইহাকী, আহমাদ ইবনুল হুসাইন (৪৫৮ হি), শু'আবুল ঈমান, (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০)
২৭. সারাখসী, আবু বাকর, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ (৪৯০ হি.), আল-মাবসূত (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৯৮৯)
২৮. রাগিব ইসপাহানী (৫০৭হি), আল-মুফরাদাত ফী গারিবিল কুরআন (বৈরুত. দারুল মারিফাহ, তা. বি.)
২৯. কাসানী, আলাউদ্দীন (৫৮৭হি) বাদাইউস সানাইয় (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
৩০. ইবনুল জাওযী, আবুল ফারাজ আব্দুর রাহমান ইবনু আলী (৫৯৭ হি), তালবীসু ইবলিস (বৈরুত, দারুল ফিক্‌র, ১৯৯৪)
৩১. ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা ৩.৫: www.altafsir.com)
৩২. ইবনুল আসীর, মুহাম্মাদ ইবনুল মুবারাক (৬০৬ হি), আন-নিহাইয়াহ ফী গারিবিল হাদীস (বৈরত, দারুল ফিকর)
৩৩. আল-আমিদী, আলী ইবনু মুহাম্মাদ (৬৩১ হি), আল-ইহকাম (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১ম মুদ্রণ, ১৪০৪)
৩৪. আল-মাকদিসী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহিদ (৬৪৩ হি), আল-আহাদীসুল মুখতারাহ (মক্কা মুকাররমা, মাকতাবাতুন নাহদাহ আল-হাদীসাহ, ১ম, ১৪১০ হি)
৩৫. মুনযিরী, আব্দুল আযীম ইবনু আব্দুল কাবী (৬৫৬ হি), আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (বৈরুত, দারুল কুতুবলি ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭হি)
৩৬. ইয্য (আব্দুল আযীয) ইবনু আব্দুস সালাম (৬৬০হি), তাফসীরুল ইয্য (বৈরুত, দারু ইবন হায্ম, ১ম প্রকাশ ১৯৯৬)
৩৭. রাযী, মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর (৬৬৬ হি), মুখতারুস সিহাহ (বৈরুত, মাকতাবাতু লুবনান, ১৯৯৫)
৩৮. কুরতুবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ (৬৭১ হি), আল-জামি লি আহকামিল কুরআন (কাইরো, দারুশ শা'ব, ২য় প্র.)
৩৯. নববী, ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ (৬৭৬ হি.), শারহু সহীহ মুসলিম, (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৮১খ্রি.)
৪০. ইবনু তাইমিয়া, আহমদ ইবনু আব্দুল হালীম (৭২৮ হি) মাজমূউল ফাতাওয়া (রিয়াদ, দারুল ওয়াফা, ৩য় মুদ্রণ, ২০০৫)
৪১. আবূ হাইয়ান মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ (৭৪৫ হি), আল-বাহরুল মুহীত (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ৩.৫: http://www.altafsir.com)
৪২. যাহাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ (৭৪৮ হি.) সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৯ম মুদ্রণ, ১৪১৩ হি)
৪৩. ইবনু কাসীর ইসমাঈল ইবনু উমার (৭৭৪ হি), আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৬)
৪৪. ইবনু কাসীর, আন-নিহায়াতু ফিল ফিতানি ওয়াল মালাহিম (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ৩.৫: http://www.alwarraq.com)
৪৫. ইবনু কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (মদীনা, দারু তাইবা, ২য় প্র. ১৯৯৯)
৪৬. শাতিবী, ইবরাহীম ইবনু মূসা (৭৯০ হি), আল-ই'তিসাম (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৯৮৫)
৪৭. ইবনু আবিল ইজ্জ হানাফী (৭৯২হি), শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ (বৈরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ৯ম প্র., ১৯৮৮)
৪৮. ইবনু রাজাব, আব্দুর রাহমান ইবনু আহমাদ (৭৯৫ হি.), জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম (বৈরুত, দারুল মারিফাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮হি)

৪৯. হাইসামী, নূরুদ্দীন আলী ইবনু আবী বাকর (৮০৭হি.) মাজমাউয যাওয়াইদ (বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮২)
৫০. ফিরোযআবাদী, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াকূব (৮১৭হি) তানবীরুল মিকবাস (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা ৩.৫: http://www.altafsir.com)
৫১. বূসীরী, আহমদ ইবনু আবী বাকর (৮৪০ হি), মিসবাহুয যুজাজাহ (বৈরুত, দারুল ম'রিফাহ, ২য় প্রকাশ, ১৪০৩ হি)
৫২. ইবনু হাজার আসকালানী, আহমদ ইবনু আলী (৮৫২ হি) ফাতহুল বারী শারহু সাহীহিল বুখারী (বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর)
৫৩. সানআনী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (৮৫২ হি), সুবুলুস সালাম (বৈরুত, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৩৭৯ হি)
৫৪. আব্দুর রাহমান ইবনু আবী বাক্র সালিহী (৮৫৬হি), আল-কানযুল আকবার (মাক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতু নিযার বায, ১ম মুদ্রণ, ১৯৯৭)
৫৫. সুয়ূতী, জালালুদ্দীন (৯১১) যাইলুল মাউযূআত (ভারত, আল-মাতবাউল আলাবী, ১৩০৩ হি)
৫৬. মোল্লা আলী কারী (১০১৪হি), আল মাসনূ' (হালব, সিরিয়া, মাকতাব আল-মাতবু'আত আল-ইসলামিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৯)
৫৭. মুনাবী, আব্দুর রাউফ (১০৩১ হি), ফাইদুল কাদীর (কাইরো, আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়া আল-কুবরা, ১ম মুদ্রণ, ১৩৫৬ হি)
৫৮. যারকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী (১১২২হি), শারহুল মুয়াত্তা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪১১)
৫৯. ইবনু আজীবাহ, আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (১২২৪), আল-বাহরুল মাদীদ (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ৩.৫: http://www.altafsir.com)
৬০. শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আলী (১২৫৫ হি.) নাইলুল আউতার, (বৈরুত, দারুল জীল, ১৯৭৩)
৬১. ইবনু আবেদীন, মুহাম্মাদ আমীন (১২৫৬ হি), রাদ্দিল মুহতার (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৭৯)
৬২. রাহমাতুল্লাহ ইবনু খলীলুর রহমান কীরানবী (১৩০৮ হি), ইযহারুল হক্ক, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর অনূদিত (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭)
৬৩. আযীমআবাদী, মুহাম্মাদ শামসুল হক্ক (১৩১০হি), আওনুল মা'বুদ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় মুদ্রণ, ১৪১৫হি)
৬৪. মুবারকপুরী, মুহাম্মাদ আব্দুর রাহমান (১৩৫৩হি), তুহফাতুল আহওয়াযী (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
৬৫. আব্দুর রাহমান ইবনু মুহাম্মাদ আল-হাম্বালী (১৩৯২ হি); হাশিয়তুর রাওদিল মুরবি' শরাহু যাদিল মুসতানকী (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ৩.৫: http://www.ahlalhdeeth.com)
৬৬. আবুল হাসান আলী নদবী (১৪২০ হি), রিজালুল ফিকরি ওয়াদ দাওয়াত (সিরিয়া, দার ইবন কাসীর, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯)
৬৭. আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন (১৪২০), সহীহুল জামিয়িস সাগীর (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৮)
৬৮. আলবানী, সহীহুত তারগীব (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ৩য মুদ্রণ, ১৯৮৮)
৬৯. আলবানী, যয়ীফু সুনানি ইবনি মাজাহ (সৌদি আরব, রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
৭০. আলবানী, সহীহু সুনানি ইবনি মাজাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
৭১. আলবানী, সিলসিলাতুল- যায়ীফাহ (রিয়াদ, মা'আরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২)
৭২. আলবানী, সিলসিলাতুল- সাহীহাহ (রিয়াদ, মা'আরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২)
৭৩. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম, ১৯৭৯)
৭৪. আলবানী, সহীহু সুনানিত তিরমিযী (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ৩.৫)
৭৫. মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৭)
৭৬. উসাইমীন, মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ, আল-কাওলুল মুফীদ (রিয়াদ, দারু ইবনুল জাওযী, ২য় প্রকাশ, ১৪২৪ হি)
৭৭. মুহাম্মাদ সুরূর বিন নাইফ, আল-হুকমু বিগাইরি মা আনযালাল্লাহু ও আহলুল গুলূ, (ব্রিটেন, বার্মিংহাম, দারুল আরকাম, ২য় প্রকাশ)
৭৮. গোলাম আহমদ মোর্তাজা; চেপে রাখা ইতিহাস (বর্ধমান, ভারত, ৮ম, ২০০০)
৭৯. গোলাম আহমদ মোর্তাজা; ইতিহাসের ইতিহাস (বর্ধমান, বিশ্ব-বঙ্গীয় প্রকাশন, ১৯৭৮)
৮০. আজহারুল ইসলাম, এ.কে.এম, নিন্দিত বিশ্ব নন্দিত গন্তব্য (চট্টগ্রাম, আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন,২০০৭)
৮১. সালিহ আল-শাইখ, শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিতিয়্যাহ (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ৩.৫)
৮২. ড. আহমদ মুহাম্মাদ জলী, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক (রিয়াদ, কিং ফায়সাল ফাউন্ডেশন ফর রিসার্চ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, ২য় মুদ্রণ ১৯৮৮)
৮৩. ড. ইবরাহীম জুমআ, আল-আতলাস আত-তারীখী লিদ-দাওলা আস-সাউদিয়্যাহ (রিয়াদ, দারাতুল মালিক আব্দুল আযীয, ১৯৭৯)
৮৪. ইসমাঈল আহমদ ইয়াগী, তারীখুল আলাম আল-ইসলামী (রিয়াদ, মিরীখ, ১৯৯৩)
৮৫. ড. নাসির আল-আকল, আল-খাওয়ারিজ (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ২য় প্রকাশ, ১৪১৭)
৮৬. শ্রী শৈলেন্দ বিশ্বাস, সংসদ বাংলা-ইংরেজি অভিধান (কলকাতা, শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৯)
৮৭. সালিম বাহনসাবী, আল-হুকমু ওয়া কাদিয়্যাতু তাকফীরিল মুসলিম (কুয়েত, দারুল বুহূসিল ইলমিয়্যাহ, ৩য় মুদ্রণ, ১৯৮৫)
৮৮. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার দুমাইজী, আল-ইমামাতুল উযমা (রিয়াদ, দারু তাইবা, ২য় মুদ্রণ, ১৪০৯ হি)
৮৯. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ ২০০৭)
৯০. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, এহইয়াউস সুনান (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ৫ম সংস্করণ ২০০৭)
৯১. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, বুহূসুন ফী উলূমিল হাদীস (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ ২০০৭)
৯২. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ৩য় প্রকাশ ২০০৮)
৯৩. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, আল্লাহর পথে দাওয়াত (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২য় সংস্করণ ২০০৯)
৯৪. সম্পাদনা পরিষদ, আল-মাওসূআ আল-ফিকহিয়্যাহ: আল-ফিকহ বিশ্বকোষ (কুয়েত আওকাফ ও ইসলামিক এফেয়্যার্স মন্ত্রণালয় ও দারুস সালাসিল, ২য় মুদ্রণ, ১৪২৭হি)
৯৫. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)
96. The Holy Bible, Authorized Version/King James Version, reprinted and published by Bible Society of South Africa, 1988.
97. quoted from Dr. Abdul Hamid Qadri, Dimensions of Christianity, (Islamabad, Pakistan, Da'wah Academy, International Islamic University, 1st edition, 1989)
98. Carl Gottaleb Pfander, Balance of Truth (The Mizanul Haqq), part-1 (The Good Way, Rikon,

Switzerland)
99. Encyclopaedia Britannica, CD Version, 2005
100. The Independent, Dhaka 14/1/2006. 18/02/2006, 8/9/2006, 20/02/2009
101. A. S. Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary (Oxford University Press, 5th edition, 1995)
102. Ahmed Deedat, The Choice (Jeddah, Abul Qasim Publications, 1st, 1994)
103. Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation.